আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই
জীবনী গ্রন্থাবলী

হযরত আবু বকর (রাঃ)	মাও এ. কে. এম. ফজলুর রহমান আনওয়ারী রচিত
" ওমর (রাঃ)	ঐ
" ওসমান (রাঃ)	ঐ
" আলী (রাঃ)	ঐ
" আদম ও হাওয়া	ঐ
" ইমাম আবু হানিফা	ঐ
" জয়নাল আবেদীন	ঐ
" শাহ্ জালাল (রহঃ) —	মাওঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ
" শাহ্ পরান —	আবদুর রহমান
" মুনসুর হেল্লাজ	ঐ
" নিজাম উদ্দিন আউলিয়া	ঐ
" ওয়েছ করণী	ঐ
" খাজা খিজির —	মাওঃ রুহুল আমিন
" মুসা ও ফেরাউন —	মাওঃ আজিজুল হক আনসারী
" ইব্রাহিম আদহাম —	হেলেনা সুলতানা
" খালেদ বিন ওয়ালিদ —	মোঃ আজিজুল হক আনছারী
" ঈসা (আঃ)	ঐ
" ইয়াকুব (আঃ)	ঐ
" বাইজিদ বোস্তামি (রহঃ)	মৌলভী নুর মোহাম্মদ
" জাকারিয়া (আঃ) —	শাহ মোঃ মনিরুজ্জামান
" ছালেহ (আঃ)	ঐ
" লুত পয়গাম্বর (আঃ)	ঐ
ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)	মরহুম হাফেজ মোঃ আবদুল জলিল
মুজাদ্দিদে আলফে ছানী —	মোঃ মনিরুজ্জামান
" দাউদ (আঃ) —	মাওঃ খন্দকার মোঃ বশীরউদ্দিন
" ইসমাইল (আঃ)	ঐ

বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী
৮ নং প্যারীদাস রোড, ঢাকা

দি তাজ পাবলিশিং হাউস
৭/বি, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

মরণের আগে ও পরে

মাওঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

ইমাম গাজ্জালীর

মরণের আগে ও পরে

মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ

দি তাজ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশনায় ঃ
আলহাজ্ব মোঃ গিয়াসউদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
৬, প্যারীদাস রোড
ঢাকা—১১০০

পহেলা প্রকাশ ঃ
আগস্ট ঃ ১৯৬০ ইং
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত
পঞ্চম প্রকাশ ঃ ১৯৯৫ ইং

(সর্বস্বত্ব লেখকের)

হাদিয়া—সাদা ঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র।
নিউজ ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ
আদর্শ ছাপা খানা
৫৬/এ, প্যারিদাস রোড
ঢাকা —১১০০

সহযোগিতায় ঃ
অবদান অক্ষরণ

নিবন্ধ সংখ্যা ২০৭০-কপি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট অফিস

স্বত্বাধিকার নিবন্ধভুক্তির প্রমাণপত্র

এতদ্বারা প্রমাণপত্র প্রদান করা হইতেছে যে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ প্রণীত এবং ১৯৬০-ইং তারিখে বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত মরনের আগে ও পরে নামক অনুবাদ গ্রন্থের স্বত্বাধিকার সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী বহিতে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহর নামে ও ২০৭০-কপি: ক্রমিক সংখ্যায় নিবন্ধভুক্ত করা হইয়াছে।

আমার সহি ও সীলমোহরে অদ্য ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের ৩য় তারিখে প্রদত্ত হইল।

রেজিষ্ট্রার

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী
পিতা মরহুম মৌলভী আবদুচ্ছত্তার
এবং
স্নেহময়ী জননী
মরহুমা হালিমা খাতুনের
পবিত্র আত্মার উদেশ্যে

স্মরণীয়

যাঁর উদ্দীপনা ও দোয়া-ইজাজতে অত্র পুস্তকখানা লিখা-
সেই মহাপ্রাণ, আমার বুগর্জ শ্বশুর পীর-মুর্শিদ
শর্ষিণার হযরত মেজো পীর ও মুজাদ্দিদ

হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ছিদ্দিক
ছাহেব কেবলা বাংলা ১৩৯৫ সনের ১৪ই মাঘ বেলা
১০-৩০ মিনিটে পটুয়াখালীর গলাচিপায় মহা প্রভু
আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন-ইন্তেকাল করেন।
সকল পাঠক-পাঠিকা সমীপে আমার
আবেদনঃ অত্র পুস্তকখানা পাঠ কালে
জান্নাতবাসী পীর ছাহেবের রূহের
মাগফিরাত কল্পে দোওয়া করিবেন।

— **শাহ ওয়ালীউল্লাহ**
১৪ই মাঘ, ১৩৯৬ বাংলা

আমাদের কথা

উনিশ শ' ষাট সালের কথা। আজ হতে দীর্ঘ বত্রিশ বছর আগে 'মরণের আগে ও পরে' আত্মপ্রকাশ করে পাঠকমণ্ডলীর হাতে পৌছে। পাকগণ খুশী, আমরাও ধন্য। হলে হবে কি! এ দীর্ঘদিন পুস্তকখানা প্রকাশের দায়িত্ব ছিল ঢাকার 'বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন'-এর হাতে। অনিচ্ছায় হয়ে থাকলেও অঙ্গ-সজ্জা এবং ছাপা ইত্যাদির গাফলতির কারণে পুস্তকখানা পাঠকদের আনন্দ দিতে সমর্থ হয় নাই সেরূপ-সমর্থ হয় নাই তাঁদের চাহিদা পূরণ করতে। এ নিয়ে মৌখিক ও পত্র দ্বারা অনেকে অনুযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু করার কিছু ছিল না আমাদের।

এবারের প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছি আমরা নিজেরাই। সে হিসেবে তাড়াহুড়া করে পাঠকমণ্ডলীর চাহিদা অনুযায়ী কতকগুলো বিষয় সংযোজন করেছি-পরিমার্জনা করেছি অনেক ক্ষেত্রে। পুস্তকখানার কলেবর এতে যদিও বৃদ্ধি পেয়েছে, তবু নেই নাই কার্পণ্যতার প্রশ্রয়। এর পরও পাঠকমণ্ডলীর সৃষ্ট নতুন চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে সর্বাগ্রে।

'মরণের আগে ও পরে' প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে এর চাহিদার ব্যাপকতা দেখে ব্যবসায়িক কিসিমের কতক প্রকাশক ভায়েরা এর অনুকরণ অনুসরণ, এমনকি হুবহু নাম হাকিয়েও কিছু সংখ্যক বই প্রকাশ করেছেন। 'নকল আসলের সমমানে দাঁড়াতে অক্ষম' এ চির সত্যটুকুর প্রতি অবহেলা করতে তাঁরা কসুর করেন নাই।

সম্প্রতি কোন একটি অজ্ঞাতনামা তথাকথিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মরণের আগে ও পরে' হুবহু নাম দিয়ে একখানা পুস্তক প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন নাই। অর্থ লোভ তাঁদের অন্ধ করেছে এমনিতর। একজন প্রকাশক পূর্ব-প্রকাশিত একখানা পুস্তকের হুবহু নাম দিয়ে

পুস্তক প্রকাশ করা প্রকাশনা আইনে কতটা অমার্জনীয় ও দণ্ডনীয় অপরাধ, তার প্রতি আদৌ খেয়াল করেন নাই তারা। আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা ব্যতীত এ জঘন্য আচরণকে আর কি বলা যেতে পারে?

আমরা কিন্তু কাউকে কিছু বলি নাই এখনো। কারণ, আমাদের বিশ্বাস 'নকল আর আসল' পাঠকমণ্ডলীই নিজ গুণে চিনে নিবেন। আর যারা চিনতে পারবেন না-তাঁদের অনুরোধ করবো, তাঁরা যেন আসল ও নকল বাছাই করে নেন-এ দায়িত্ব তাঁদের হাতে তুলে দিলাম। আমাদের কাজ সাবধান করা।

ঢাকার 'আব্বাছিয়া লাইব্রেরী, আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান-এই প্রতিষ্ঠান হতে নতুন আঙ্গিকের পুস্তকখানা প্রথম প্রকাশ করা গেল। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ও ব্যবস্থাপক জনাব মোস্তফা ছাহেবের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই আমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে অনেকখানি। এ কারণে তাকে মোবারকবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

কিন্তু এবারের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত চতুর্দশ প্রকাশনার এককভাবে দায়িত্ব দেয়া গেল ঢাকার 'দি তাজ কোম্পানী লিঃ' কে। এ সাহসিকতার ধন্যবাদ পাওয়ার উপযোগী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আলহাজ্জ মৌলভী গিয়াস উদ্দীন ভূঁইয়া ছাহেব এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ।

অতঃপর পাঠকমণ্ডলীর যে কোন পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

ইতি

শর্ষিণা দরবার শরীফ,
পোঃ দারুচ্ছুন্নাত, পিরোজপুর (বরিশাল)
জানুয়ারী ১৯৯১ ইং।

আরজ গুজার
শাহ ওয়ালীউল্লাহ

পীরে কামেল হাদিয়ে জামান শর্ষিণা শরীফের
আ'লা হজরত পীর ছাহেব কেবলার

দোয়া ও ইজাজত

আল-হামদুলিল্লাহ! আমার জামাতা মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ কৃত 'মরণের আগে ও পরে' যুগ-মানসের চাহিদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া খুশী হইলাম। পুস্তকে যা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, তা শুধু সাধারণ পাঠকই নহে, যারা ওয়াজ-নছীহত করিয়া মানুষকে জান কবজ, কবর আজাব, কেয়ামত, বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে বুঝাইয়া থাকেন, সে সকল ওয়ায়েজীনবৃন্দও ইহাতে যথেষ্ট উপাদান পাইতে পারেন।

ওয়াজ-নছীহত শ্রবণ এবং বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিয়া দীনের বিষয় অবগত হইলেই রূহানী তরাক্কী হাছিল হয় না—হাছিল হয় সে অনুযায়ী আমল করিলে ও অন্যান্যদের আমল করাইতে চেষ্টা করিলে। তাই সকল দীনদার ভাই মুসলমান, আমার মুহিব্বীন ও মুরীদগণ অত্র পুস্তক খানা পাঠ করিয়া নিজেদের আত্ম-শুদ্ধি করিবেন। আমি সকলের জন্য দোয়া করি। আমীন!!

স্বাক্ষর—
শাহ মোহাম্মদ ছিদ্দিক
(পীর ছাহেব, শর্ষিণা শরীফ)

সূচী নির্দেশিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ	
গ্রন্থ-রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট	৫
আমাদের কথা	৭
শর্ষিণা পীর ছাহেবের দোয়া-ইজাজত	৯
হামদ-না'ত	
প্রথম অধ্যায়	
সৃষ্টির রহস্যাবলী	১৫-৬৫
এক।। রাসূলুল্লাহর সৃষ্টি রহস্য	১৫
রাসূলুল্লাহর বেলাদত	১৮
দুই।। হজরত আদম নবীর সৃষ্টি রহস্য	২১
আদম সৃষ্টির গোড়ার কথা	২৫
তিন।। শয়তানের সৃষ্টি রহস্য	৩১
চার।। মানব সৃষ্টির রহস্য	৩৫
পাঁচ।। ফেরেশতাগণের সৃষ্টি রহস্য	৫৬
ছয়।। মৃত্যুর সৃষ্টি রহস্য	৫৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
জান কবজের কথা	৬৬-১০৩
জান কবজের প্রণালী	৬৬
নবী-রাসূলগণের জান কবজ	৭২
মোমেনদের জান কবজ	৭৫
মৃত্যুকালে শয়তানের চক্রান্ত	৮০
মৃত্যুর পরে গাইবী আওয়াজ	৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুর আগে জমীন ও কবরের আওয়াজ	৮৯
মৃতদেহের আজাব ও যন্ত্রণা	৯২
মৃতের প্রতি বিলাপ করিয়া কাঁদা	১০০
মুছীবতে ধৈর্যধারণ	১০২
তৃতীয় অধ্যায়	
মৃত্যু ও কবর আজাব	১০৪-১২৬
মৃত্যুকালীন অবস্থা	১০৪
মুনকার-নকীরের আগে একজন ফেরেশতার কবরে প্রবেশ	১১৪
মুনকার-নকীরের কথা	১১৫
কিরামান-কাতিবীনের কথা	১১৯
রূহের নিজ বাড়ী ও কবরে প্রত্যাবর্তন	১২২
আত্মা বা রূহের অবস্থান	১২৪
চতুর্থ অধ্যায়	
হাশর ময়দান ও হিসাব-নিকাশ	১২৭-১৯৪
কেয়ামত ও আখেরাত	১২৭
আলামতে কোবরার বিবরণ	১৩১
ইস্রাফীলের সিঙ্গার ফুৎকার	১৪১
নাফখা বা সিংগায় ফুৎকার	১৪৩
বোরাকের সৃষ্টি কৌশল	১৪৮
কেয়ামতের ময়দানে বারটি ঝাণ্ডা	১৫৩
হাশর ময়দানে বার সারি	১৫৭
পুনরুত্থান ঃ কবর হইতে উঠা	১৬৪
হাশর ময়দান	১৬৯
হাশর প্রান্তরে মানুষ তিনদলে বিভক্ত	১৬৯
সাত শ্রেণী আরশের ছায়ায়	১৭১
বিচার আদেশ	১৭৩
শেষ বিচার	১৭৫

পোলসেরাত ১৮৮
দোজখবাসী মুসলমানের শাফায়াত ১৯০
সর্বশেষ দলের শাফায়াত ১৯১
মৃত্যুর হত্যা ১৯২

পঞ্চম অধ্যায়

বেহেশত ও দোজখ ১৯৫-২৫৫
এক ঃ দোজখের বিবরণ ১৯৫
দোজখের স্তর ও সংখ্যা ১৯৬
দোজখীদের পরিসংখ্যাণ ২০৫
বিভিন্ন পাপে ভিন্ন ভিন্ন আজাব ২০৭
দোজখীদের খাদ্য ও পানীয় ২১০
আজাবের বিভিন্ন দিক ২১৫
শয়তানের উপদেশ ২১৯
গোমরাকারীদের প্রতি দোজখীদের অনীহা ২২০
মালেক ফেরেশতার প্রতি নিবেদন ২২১
দোজখীদের খোদার দরগাহে শেষ নিবেদন ২২৩
দুই ঃ বেহেশতের পরিচয় ২২৪
বেহেশতীদের পরিসংখ্যাণ ২৩০
বেহেশতে প্রবেশের আগে ২৩১
বেহেশতের সৃষ্টি কৌশল ও নেয়ামত ২৩৮
বেহেশতের হুর-গেলমান ২৪৪
দীদারে ইলাহী ঃ আল্লাহর সন্দর্শন ২৪৬
বেহেশত হাছিলের মূল উপাদান ২৫২

পরিশিষ্টাংশ

গোনাহের কার্যাবলী ২৫৯-২৭২
যে সব কারণে দোজখী হওয়ার সম্ভাবনা ২৫৯
প্রসঙ্গ কথা ২৭০

بسم الله الرحمن الرحيم

মরণের আগে ও পরে

হামদ-না'ত

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি আসমান-জমীন, মানব-দানব, চন্দ্র-সূর্য, জ্বিন-ফেরেশতা, বৃক্ষ-লতা এক কথায় আঠার হাজার মাখলুকাত মাত্র 'কুন' (হও) শব্দ দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মানব জাতিই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি।'

তিনি আমাদের দীন-দুনিয়ার শান্তির জন্য পবিত্র ইসলাম ধর্ম মনোনীত করিয়াছেন এবং প্রেরণ করিয়াছেন শেষনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে ইসলাম ধর্মের শান্তির বাণী বাহকরূপে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের মৃত্যুর পরে তাঁর অসীম কৃপায় কবর, হাশর ও পুলসেরাতের ভয়াবহ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন এবং মহাহাশর প্রান্তরে প্রচণ্ড সূর্যের উত্তপ্ত স্থির কিরণ কালে আমাদেরকে তাঁর পবিত্র আরশে আজীমের ছায়াতলে স্থান দিবেন, আর যে মা'বুদ আমাদিগকে হাশর প্রান্তরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিজ তত্ত্বাবধানে পানাহার করাইবেন এবং আমাদের কতক ধর্মভীরুদের বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। অতএব, আমরা একান্ত সেই মহা করুণাময় ও দয়াশীল আল্লাহ পাকের হামদ বা প্রশংসা করিতেছি।

ইসলাম ধর্মের বাহক হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। তিনি আমাদিগকে ইসলাম ধর্মের আদেশ-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত করাইয়া আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দিয়াছেন। তিনি জন্মগ্রহণ না করিলে ইহজগতে কিছুই সৃষ্টি হইত না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

হে মোহাম্মদ (ছঃ)! যদি তোমাকে সৃষ্টি না করিতাম, তবে আকাশ ও পৃথিবীতে কিছুই সৃষ্টি করিতাম না। – হাদীছে কুদসী।

এ ধরায় না হইলে আপনার সৃজন,

করিতাম না পয়দা আকাশ-ভুবন।

আর তিনিই রোজ হাশরে পাপী-তাপী সকল উম্মতকে ইলাহীর আদালতে সুপারিশ করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।

অতএব, যে নবী আমাদের প্রতি এত দয়াবান হইবেন, আমরা তাঁরই না'ত বা প্রশংসা করিতেছি।

প্রথম অধ্যায়
সৃষ্টির রহস্যাবলী
এক ঃ রাসূলুল্লাহর সৃষ্টি রহস্য

হাদীছের মর্মে জানা যায়—আল্লাহ পাক আসমানে 'শাজারাতুল ইয়াক্বীন' নামে চতুষ্কাণ্ড বিশিষ্ট একটি সুন্দর বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ পাকের স্বীয় পবিত্র নূর হইতে রাসূলুল্লাহর (ছঃ) নূর সৃষ্টি করতঃ উহা বহু সংখ্যক শ্বেত মুক্তার দ্বারা অতি সাবধানতার সহিত বেষ্টন করিয়া ময়ূর পাখীর ন্যায় আকৃতি দানপূর্বক বহু শত বৎসর সেই বৃক্ষের উপর উপবিষ্ট রাখেন।

পাখীটি উক্ত বৃক্ষে অবস্থান করিয়া সত্তর হাজার বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর গুণ-কীর্তন, তাসবীহ-তাহলীল, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকেন। তৎপর আল্লাহ পাক অতি মনোরম একটি আয়না তৈরী করিয়া স্বীয় নূর-নির্মিত ময়ূর পাখীটির সম্মুকে ধরেন। পাখীটি আয়নার মধ্যে নিজ সৌন্দর্য রূপ ও শরীরের সুঠাম গঠন আকৃতি দেখিয়া আল্লাহ পাকের সম্মুখে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঁচটি সেজদাহ করেন। পরিণামে সে সেজদাহর কারণেই হজরতের উপর চিরদিনের জন্য পাঁচটি সেজদাহ ফরজ হইয়া যায়। একই কারণে আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহকে (ছঃ) ইহজগতে মানবজাতির জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করিবার পরে তাঁর উম্মতের উপর পাঞ্জেগানা (পাঁচ ওয়াক্তিয়া) নামাজ ফরজ করিয়া দেন।

ইহার কিছুকাল পরে উক্ত নূরে মোহাম্মদীর প্রতি আল্লাহ পাক মহব্বতের দৃষ্টি দান করিলেন। ইহাতে পাখীরূপ 'নূরে মোহাম্মদী' লজ্জায় জড়সড় হইল এবং তাঁর সর্বশরীর ঘর্মে প্লাবিত হইয়া গেল। আল্লাহ পাকের এই মহব্বতের দৃষ্টির ফলে নূরে মোহাম্মদী হইতে যে ঘর্ম নির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতেই আল্লাহ পাক আঠার হাজার মাখলুকাত পয়দা করিয়াছেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহর এক নাম 'উম্মী' হইয়াছে। আরবী ভাষায় 'উম্মুন' শব্দের অর্থ— মূল। যেহেতু সৃষ্ট-জীব রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) নূর হইতে সৃষ্টি, সুতরাং তিনিই সকল সৃষ্টির মূল।

আল্লাহের নূরেতে পয়দা নূর মোস্তফার,
মোস্তফার নূরে পয়দা তামাম সংসার।

অতঃপর পাখীরূপ নূরে মোহাম্মদী বহু শত বৎসর উক্ত বৃক্ষে থাকিয়া আল্লাহ পাকের গুণ-কীর্তন, তাসবীহ-তাহলীল ও ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকেন। ইহার পরে আল্লাহ পাক উক্ত নূরে মোহাম্মদী হইতে সকল আম্বিয়া ও রাসূলগণের আত্মাসমূহ পয়দা করেন এবং সেই সকল আত্মাকে কালেমা ত্বাইয়্যেব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ঃ 'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (ছাঃ) তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ-নবী পড়িবার হুকুম দেন।

আল্লাহ পাকের নির্দেশে সকল নবীর আত্মা উক্ত কালেমা পাঠ করত ঃ মোহাম্মদ মোস্তফাকে (ছাঃ) নবী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই কারণেই তাঁকে সাইয়্যেদুল মোরসালীন বা সকল নবী ও রাসূলগণের নেতা ও সরদার বলা হয়।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু 'খাতেমুল আম্বিয়া' বা সর্বশেষ নবীই নহেন এবং তিনি 'ফাতেহুল আম্বিয়া' বা সর্বপ্রথম নবী নামেও আখ্যাপ্রাপ্ত। কারণ আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম নূর নবীর নূরকেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই নূর হইতেই সকল কিছুর সৃষ্টি। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের উক্তি ঃ

'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূরকেই পয়দা করিয়াছেন।'

একই কারণে তাঁকে প্রথম সৃষ্টিও বলা হয়।

ইহার কিছুকাল পরে আবার আল্লাহ পাক অত্যাশ্চর্য সুন্দর একটি কিন্দীল (ঝাড়বাতি) নির্মাণ করতঃ উহার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আকৃতি পয়দা করিয়া অতি সাবধানতার সাথে সংরক্ষণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) উক্ত সংরক্ষিত আত্মার চতুষ্পার্শ্বে সকল মানবাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু শত বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তাছবীহ-তাহলীল, ইবাদত-বন্দেগী করিতেছিল। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা সকল আত্মাকে নির্দেশ করিলেন-'হে রূহ সকল! তোমরা সকলে আমার প্রিয় বান্দা মোহাম্মদের (ছঃ) নূরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ।' সকল মানবাত্মা নূরে মোহাম্মদীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। ফলে-

এই আত্মাসমূহের যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) মস্তক দেখিয়াছে, তাহারা দুনিয়ায় খলিফা ও বাদশাহ হইয়াছে।

আর যাহারা কপাল দেখিতে পাইয়াছে, তাহারা নিঃস্বার্থ জননেতা হইতে পারিয়াছে, যাহারা হজরতের (ছঃ) চক্ষের ভ্রূ দেখিতে পারিয়াছে, তাহারা হইয়াছে নাক্কাশ (শিল্পী)।

আর যাহারা কর্ণদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিয়াছে, তাহারা হইয়াছে ভাগ্যবান ও ধন-দৌলতের অধিকারী, যাহারা চক্ষুদ্বয় দেখিতে পাইয়াছে তাহারা হইয়াছে কোরআনের হাফেজ।

আর যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) গালদ্বয় দেখিতে পাইয়াছে, তাহারা দুনিয়ায় জ্ঞানী ও দানশীল হইয়াছে। যাহাদের দৃষ্টি রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) নাকের উপর পড়িয়াছে, তাহারা হেকিম ও সুগন্ধি বিক্রেতা হইয়াছে।

আর যাহারা ওষ্ঠ ও দন্ত মাড়ি দেখিতে পাইয়াছে, তাহারা দুনিয়ায় শান্ত-শিষ্ট ও দানশীল হইয়াছে; যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) মুখ দেখিতে পাইয়াছে, তাহারা অত্যন্ত রোজাব্রতকারী হইতে পারিয়াছে।

আর যাহারা জিহ্বার প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, তাহারা হইতে পারিয়াছে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহগণের দূত। অনুরূপ যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) গলদেশ দেখিয়াছে, তাহারা বিখ্যাত ওয়াজ-নসীহতকারী ও মোয়াজ্জিন হইয়াছে।

আর যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) দাড়ি মোবারক দেখিয়াছে, তাহারা দুনিয়ার নামজাদা যোদ্ধা হইয়াছে, যাহারা গর্দান দেখিতে সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা ব্যবসায়ী ও সওদাগর হইয়াছে।

আর যাহারা উভয় বাহু দেখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা দুনিয়ায় তরবারি ও তীর বর্ষণে পারদর্শী হইয়াছে। যাহারা শুধু দক্ষিণ বাহু দেখিয়াছে, তাহারা হাজ্জাম (নাপিত) হইয়াছে এবং যাহারা কেবল মাত্র বাহু দেখিয়াছে, তাহারা দুনিয়ার বাদশাহদের জল্লাদ (ঘাতক) হইয়াছে।

অনুরূপ, যাহারা দক্ষিণ হাতের তালু দেখিয়াছে, তাহারা মহাজন হইয়াছে এবং যাহারা বাম হাতের তালু দেখিয়াছে, তাহারা দুনিয়ার জিনিস ওজন করিবার কার্যে পটু হইয়াছে।

আর যাহারা উভয় হাতের তালু দেখিতে পাইয়াছে, তাহারা দানশীল এবং মাল-দৌলত উপার্জনকারী হইয়াছে। যাহারা উভয় হস্তের পৃষ্ঠ দেখিয়াছে, তাহারা হইয়াছে অত্যন্ত কৃপণ। আর যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) দক্ষিণ হস্তের অংগুলী দেখিয়াছে, তাহারা লেখক এবং যাহারা বাম অংগুলী দেখিয়াছে তাহারা হইয়াছে দরজী।

যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) বক্ষ মোবারক দেখিতে পারিয়াছে, তাহারা প্রকৃত আলেম ও শরীয়াতের মুজতাহেদ হইতে পারিয়াছে। যাহারা রাস-

লুল্লাহর সৃষ্টি রহস্যুলুল্লাহর (ছাঃ) পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টিপাত করিতে পারিয়াছে, তাহারা অত্যন্ত কোমল প্রাণ ও ধর্মানুযায়ী হইতে পারিয়াছে।

অনুরূপ যাহারা তাহার পার্শ্বদেশ দেখিয়াছে, তাহারা হইয়াছে, গাজী বা ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী। যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) পেট দেখিয়াছে তাহারা কমলোভী এবং পরহেজগার বা সংযমী হইয়াছে।

আর যাহারা রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) মোবারক হাঁটু দেখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা দুনিয়ায় কোমলতার মাধ্যম বিনীতভাবে রুকু-সেজদা করিতে শিখিয়াছে। যাহারা পদদ্বয় দর্শন করিতে পারিয়াছে, তাহারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া শিকার কার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছে। অনুরূপ যাহারা পদদ্বয়ের নিম্নদেশ দেখিয়াছে, তাহারা অত্যন্ত ভ্রমণকারী হইয়াছে।

আর যাহাদের আত্মা ভাগ্যের বিপর্যয় হেতু রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) পবিত্র নূরানী শরীরের কোন অংশই দেখিতে সুযোগ পায় নাই, তাহারা হইয়াছে। ইয়াহুদি, খৃষ্টান, কাফের ও আল্লাহ-আল্লার রাসূলের দুশমন দলের অন্তর্গত।

মোটকথা, মানবজাতির ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি, বেহেশত-দোজখ সকলই একমাত্র রাসূলুল্লাহর· (ছাঃ) অছিলায় সংঘটিত হইয়াছে এবং হইবে। এই জন্যই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ (হাদীস কুদসী)

এ ধরায় না হইলে আপনার সৃজন,
করিতাম না পয়দা আকাশ ভূবন।

--০--

রাসূলুল্লাহর বেলাদত

দুনিয়া যখন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন উহা 'মাবুদে লা শরীকের' নিকট নিজ বিপদ মুক্তির জন্য আকুল আবেদন জানায়। যেহেতু আল্লাহ অদ্বিতীয় লা-শরীক, তাই দুনিয়ার এই অন্ধকার এক আল্লাহর একই হুকুমে এবং একই সময়ে আলোকিত হইয়া থাকে।

অন্ধকার দুনিয়া দুনিয়াবাসীর অন্যতম বিপদ। এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র একটি উপায় ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহা হইল অদ্বিতীয় মা'বুদ-আল্লাই তা'আলার ইঙ্গিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সূর্যের কিরণ দান। যদিও চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র-পুঞ্জ

পৃথিবীতে আলোদান করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাহাদের স্বীয় আলো নহে, বরং সমস্ত আলোর উৎস একমাত্র সূর্য।

অনুরূপ, দুনিয়াবাসী যখন আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তা হইতে পথভ্রষ্ট হইয়া অন্ধকারে পতিত হয় তখন তাহাদের হেদায়েত বা পথ প্রদর্শন কল্পে মা'বুদে লা-শরীক একই হেদায়েতের সূর্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট লোকদিগকে হেদায়েত করিয়া থাকেন।

হযরত ঈসার (আঃ) যুগের কিছুকাল পরে যখন দুনিয়াবাসী বিশেষ করিয়া আরবজাতি, আল্লাহর নির্দেশিত পথ হইতে বহু দূরে পতিত হইয়া উদভ্রান্তের ন্যায় চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতেছিল, এমন সময় আল্লাহ্ পাক সমস্ত দুনিয়াবাসীর হেদায়েতকল্পে এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব গোষ্ঠিকে আলোর সন্ধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফাকে (ছাঃ) তৃণ-লতাহীন মরুভূমির একপার্শ্বে আরব দেশে প্রেরণ করেন। কাজেই শেষ যুগের অন্ধকারের একমাত্র আলো হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ)। এই জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহকে (ছাঃ) 'সেরাজ' সূর্য নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আল্লাহ্ বলেন-

ঃ হে মুহাম্মদ! আপনাকে দুনিয়াবাসীর সম্মুখে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষীরূপে, মানুষের ভালো-মন্দের সুসংবাদ বাহকরূপে, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতকারীরূপে এবং দুনিয়ার ফেসক ও কুফরীর অন্ধকারের প্রজ্জ্বল সূর্যালোকরূপে প্রেরণ করিয়াছি!'

অতএব, নিখিল বিশ্বের অন্ধকারকে আলোকিত করিবার জন্য একমাত্র রাসূলুল্লাহই (ছাঃ) আফতাবে হেদায়েত বা পথ প্রদর্শক-প্রদীপ। তাঁহার নির্দেশিত পথ হারাইলে মানব জাতির কোন ক্রমেই পরিত্রাণ হইতে পারে না। তিনি রাহমাতুল্লিল 'আলামীন-নিখিল বিশ্বের শান্তি, তিনিই মানব-জাতির ভাল-মন্দের আশার আলো-ভরসার স্থল।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাহমাতুল্লিল 'আলামীন বা বিশ্ব শান্তিরূপে জগতে কদম রাখিয়াছেন; কাজেই তাঁহার 'খোদার পথে আহ্বান, ব্যাপকভাবে বিশ্বের প্রত্যেক কোণায় কোণায় অবশ্যই পৌছিবে। তিনি কেবল নির্দিষ্ট কোন কওমের হেদায়েতকল্পে প্রেরিত হন নাই, বরং বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির নাজাত বা মুক্তির উপলক্ষ করিয়াই তিনি প্রেরিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহজগতে প্রেরিত হইয়া বলেন নাই, আমি শুধু বণী ইসরাঈলগণকে ফিরআউনের অত্যাচার ও দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি; বরং তিনি বলিয়াছেন– আমার প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, নিখিল বিশ্বে মানব জাতিকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য মা'বুদ বা দেবদেবীর পূজা ও দাসত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া।

অনুরূপ, তিনি শুধু ইসরাঈল বংশের পরিত্যক্ত আদর্শ ও গৌরব পুনঃ অর্জনের নিমিত্ত আসেন নাই, বরং তিনি সমস্ত পৃথিবীর এবং সকল গোত্রের পরিত্যক্ত আদর্শ ও গৌরব পুনঃ অর্জন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়া পুনঃ ইসলামের ও আল্লাহর একত্ববাদের ডঙ্কা বাজাইবার মানসেই প্রেরিত হইয়াছেন।

বিশ্বের বুকে আল্লাহর পথে দাওয়াতের ডঙ্কা যতজনেই বাজাইয়া থাকুক না কেন, দুনিয়া যদি তাহাদিগকে ভুলিয়া যায় তবে সমস্ত জগতের সেরূপ কোন ক্ষতি সাধিত হইবে না। শুধু কতিপয় বিশেষ কওমের ও দেশের ক্ষতি হইতে পারে। কেননা, তাঁহারা মাত্র নির্দিষ্ট কওম ও গোত্রের হেদায়েত কল্পে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুনিয়া যদি রবিউল আউয়াল মাসের অপূর্ব দানকে ভুলিয়া যায়, তবে গোটা পৃথিবীর মানব জাতি পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে–যাহাদের কল্যাণ ও মুক্তির উপায় থাকিবে না। কেননা, রবিউল আউয়ালের অপূর্ব দান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু কোন দেশ বা কওম বিশেষের নহে বরং সমগ্র বিশ্বের রহমত বা শান্তিরূপে প্রেরিত।

মোদের নবী, বিশ্বনবী নাই তুলনা তাঁর,
মোদের নবী শিক্ষা গুরু নিখিল দুনিয়ার।
মোদের নবীর শিক্ষা মাঝে শান্তি জাহানের,
তাঁর বাতান পন্থা মাঝে মুক্তি মানবের।

আরব তথা সারা বিশ্বের সম্মানিত কোরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ পরিবারের সর্দার আবদুল মোত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর ঔরষে মতান্তরে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে রাহমাতুল্লিল 'আলামীন হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি মক্কা হইতে মদীনা হিজরত করেন। এবং সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্মের আহ্বান পৌছাইয়া ১০ম হিজরী ৬৩ বৎসর বয়সে ইহ-লোক ত্যাগ করেন।

--০--

দুই ঃ হযরত আদম নবীর সৃষ্টি রহস্য

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ফরমাইয়াছেন–'আল্লাহ্ তা'আলা হজরত আদমকে (আঃ) দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের মাটি দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। মস্তক কা'বা শরীফের পবিত্র মাটি দ্বারা, বক্ষ দোহনা নামক স্থানের মাটি দ্বারা, পেট ও পিঠ ভারত উপ-মহাদেশের মাটি দ্বারা, হস্তদ্বয় ইউরোপের মাটি দ্বারা ও পদদ্বয় পাশ্চাত্যের মাটি দ্বারা পয়দা করিয়াছেন।'

অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আদমের (আঃ) মস্তক বাইতুল মোকাদ্দাসের পবিত্র মাটি দ্বারা; মুখমণ্ডল বেহেশতের পবিত্র মাটি দ্বারা, দন্ত মোবারক ভারত উপ-মহাদেশের মাটি দ্বারাও হস্তদ্বয় কা'বা শরীফের পবিত্র মাটি দ্বারা এবং হাড়সমূহ পাহাড়ের কঠিন শিলাযুক্ত মাটি দ্বারা পয়দা করিয়াছেন।

অত্র হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ ইরাক নামক স্থানের মাটি দ্বারা; আত্মা ফিরদাউস নামক সর্বোচ্চ বেহেশতের মাটি দ্বারা; জিহবা তায়েফ নামক স্থানের মাটি দ্বারা; চক্ষুদ্বয় হাউজে কাওছারের পবিত্র মাটি দ্বারা, মুখ বেহেশতের মাটি দ্বারা ও শরীরের জনেন্দ্রীয় কাবুল নামক স্থানের মাটি দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন।

আল্লাহতা'আলা বাইতুল মোকাদ্দাসের পবিত্র মাটি দ্বারা হজরত আদমের (আঃ) মস্তক তৈয়ার করিয়াছেন, তাই বাইতুল মোকাদ্দাস হইতে অধিকাংশ নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহারা দুনিয়ার মানুষকে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়া উন্নতির পথে আগাইয়া দিয়াছেন। তাই বাইতুল মোকাদ্দাস আজিও দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের তীর্থ স্থান রূপে পরিগণিত হইয়া চলিয়াছে। বলা বাহুল্য– শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান একমাত্র মস্তিষ্ক হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অনুরূপ, হজরত আদমের (আঃ) মুখ আল্লাহ্ বেহেশতের পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। তাই আদম সন্তানের মুখ মানব দেহের অন্যতম সৌন্দর্যের স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কারণ আল্লাহর যাবতীয় সৌন্দর্যময় স্থানের মধ্যে বেহেশতই শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য-নিকেতন।

আবার হযরত আদমের (আঃ) চক্ষুদ্বয় হাউজে কাওসারের পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। তাই আদম সন্তানের চক্ষুদ্বয় শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে অন্যতম শান্তিদায়ক ও কোমল স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

কারণ, হাউজে কাওসার নামক স্থান অতীব শান্তিময় স্থান। আদম সন্তান কিয়ামতের দিবস পানির পিপাসায় যখন অস্থির হইয়া এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করিতে থাকিবে, তখন আল্লাহর কৃপায় কেহ উক্ত হাউজ হইতে একবার পানি পান করিতে পারিলে সারা জীবন সে আর পানির তৃষ্ণা অনুভব করিবে না- প্রয়োজন হইবে না পানি পান করার।

আবার হযরত আদমের (আঃ) দন্তগুলি ভারত উপ-মহাদেশের সবুজ-শ্যামল সুশোভিত মাটি দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে। তাই আদম সন্তানের দাঁতগুলি অনিন্দ-সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছে। কারণ, ভারত উপ-মহাদেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্যের দেশ।

আবার আদমের (আঃ) হস্তদ্বয় পবিত্র কা'বা শরীফের মাটি দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে। তাই প্রকৃতপক্ষে আদম সন্তানের হস্তদ্বয় সর্বদা দানশীলতার কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ কা'বা গৃহের জিয়ারতে যুগে যুগে অসংখ্য লোক গমন করিতেছে, কিন্তু কা'বা গৃহের জিয়ারত হইতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই। কা'বা গৃহের দ্বার যেইরূপ সকলের জন্য মুক্ত, তদ্রূপ উহার মাটি দ্বারা তৈরি হস্তও সকলের জন্য মুক্ত থাকিবে। অর্থাৎ সেই হস্ত মুক্তভাবে দান করিতে অভ্যস্ত থাকিবে।

আবার আল্লাহতা'আলা আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ ইরাক নামক স্থানের কঠিন মাটির দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। তাই আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কঠিন ও মজবুত। কারণ, ইরাকের মাটি অন্যান্য দেশের মাটির তুলনায় কঠিন এবং ইরাকবাসীগণ অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় কঠিন প্রকৃতির লোক।

আবার হযরত আদমের (আঃ) শরীরের বিশিষ্ট অঙ্গ (জনেন্দ্রীয়) বাবুল নামক স্থানের মাটি দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে বলিয়া আদম সন্তানের ঐই অঙ্গ যৌন তৃষ্ণাযুক্ত ও প্রেম উত্তেজনার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

আবার হযরত আদমের (আঃ) হাড়সমূহ কঠিন শিলাযুক্ত পাহাড়ের মাটি দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে, তাই আদম সন্তানের হাড় শরীরের সকল অংশ হইতে কঠিনতম হইয়া থাকে।

আবার হযরত আদমের (আঃ) অন্তঃকরণ ফেরদাউস নামক সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বেহেশতের পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে বলিয়া আদম সন্তানের অন্তঃকরণে আল্লাহকে বিশ্বাস করিবার এবং তাঁহাকে চিনিবার শক্তি দান করা হইয়াছে। কেননা, কোন আদম সন্তান ফেরদাউস কেন,

কোন বেহেশতেই প্রবেশ করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না সে সরল অন্তঃকরণে আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁহার আদেশ ও নিষেধ পালন করিবে-ইবাদত-বন্দেগীতে কাল যাপন করিবে।

আবার আল্লাহতা'আলা হজরত আদমের (আঃ) জিহ্বা তায়েফ নামক স্থানের মাটি দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। কাজেই সেই স্থান কলেমায়ে শাহাদৎ— أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর স্থানে পরিগণিত হইয়াছে।

আদম-সৃষ্টি কৌশল ঃ আল্লাহতা'লা হযরত আদমকে (আঃ) পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথা-চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। আদম-ধড়ে রূহের প্রভাব বিস্তারের আগে ইহা ছিল নির্জীব মৃত্তিকা নির্মিত। আল্লাহপাক যখন এই মৃত্তিকা নির্মিত আদম মূর্তির মধ্যে রূহ বা তাহার আত্মাকে প্রবেশের জন্য আদেশ করিয়া বলিলেন-

'হে আদম রূহ! তুমি এই আদম মূর্তির মুখ কিংবা মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবেশ কর।' আদম-আত্মা আদমের মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি দেখিয়া দুই শত বৎসর পর্যন্ত উহার চতুর্দিক ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে রূহ আদম মূর্তির চক্ষুদ্বয়ের উপর পড়িল। রূহ চক্ষুদ্বয়ের উপর বসিবামাত্র আদমের চক্ষে দৃষ্টিশক্তি আসিল এবং আপন দেহ মৃত্তিকা নির্মিত দেখিল।

অতঃপর আদমের (আঃ) রূহ আবার কর্ণের উপর পড়িল। রূহ কর্ণের উপর পড়িবামাত্র হযরত আদম (আঃ) ফেরেশতাগণের তছবীহ ও জিকের শুনিতে পাইলেন। ইহার পরে আদমের রূহ তাঁহার নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করিলে তিনি হাঁচি দিলেন।

আদম (আঃ) হাঁচি দেওয়ার প্রাক্কালেই আল্লাহ পাক তাঁহাকে হাঁচি অন্তর যে দোয়া 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়িতে হয়, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই তিনি হাঁচি দেওয়া মাত্র-'আলহামদুলিল্লাহ' পড়িলেন। আদম যখন হাঁচি দিয়া এই দোয়া পড়িলেন, তখনই আল্লাহ হাঁচির জবাবী দোয়া 'ইয়ারহামুকা রাববুকা ইয়া আদম'-হে আদম! তোমার প্রভু তোমাকে দয়া করিয়াছেন, পড়িলেন।

অতঃপর আদম-রূহ যখন তাঁহার বক্ষে প্রবেশ করিল, তখনই হঠাৎ আদম (আঃ) উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। এই জন্যই আল্লাহপাক আদম সন্তানকে বলেন ঃ

'মানব জাতি অত্যন্ত ধৈর্যহীন ও চঞ্চল মতি।'

তৎপর আদম-আত্মা তাঁহার পেটে প্রবেশ করিল। আত্মা পেটে প্রবেশ করা মাত্র আদমের (আঃ) ক্ষুধার অনুভূতি আসিল। অবশেষে আদম-আত্মা তাঁহার সারা শরীরে ছড়াইয়া পড়িল এবং মাটির মূর্তিটি রক্ত-মাংসের শরীরে পরিণত হইয়া একটা অত্যাশ্চর্য সম্পূর্ণ মানব আকার ধারণ করিল।

আদি পিতা দুনিয়ার মানব প্রথম,
মাটির তৈয়ারী নূর হযরত আদম।
শরীর মাটির বটে রূহ নূর তার,
এই জমিনের বুকে খলীফা খোদার।

অতঃপর আল্লাহতা'আলা হযরত আদমের (আঃ) আপাদমস্তক অপূর্ব সৌন্দর্যময় সাদা ধপধপে নখ জাতীয় পোশাক দ্বারা অলংকৃত করিলেন। ইহার সৌন্দর্য দৈনন্দিন বাড়িয়া চলিল। এমন কি, তাঁহার সম্পূর্ণ দেহটা একখণ্ড শ্বেত পাথরের মূর্তির ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যখন তিনি বিতাড়িত শয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া আল্লাহর আদেশ অবহেলা করিলেন, তখনই আল্লাহ্ তাঁহার সৌন্দর্যময় উক্ত পোশাক অপসারণ করিয়া তাঁহাকে দুনিয়ায় স্থানান্তরিত করিলেন। আজিও সেই সৌন্দর্যময় পোশাকের সামান্য নমুনা আদম সন্তানের হাত পায়ের অংগুলীতে 'নখ' রূপে শোভা পাইতেছে।

আল্লাহপাক হযরত আদমের (আঃ) দেহ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তৈয়ার করতঃ জীবন দান করিলেন এবং তাঁহার ললাট বা কপালে 'নূরে মোহাম্মদী' স্থাপন করিলেন। ইহাতে তাঁহার ললাটখানি পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হইতেও অধিক আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল-বিকশিত হইল আলোকমালা।

পয়দা করে আদমের পেশানীতে তাঁর,
দান করিলেন নূর মুবারক নবী মোস্তফার।
আহা কিযে নূরের খুবী কিযে তাহার শান,
হাসল যেন ললাটখানি পূর্ণিমার চান।

অপতঃপর আল্লাহতা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিলেন ঃ হে ফেরেশতাগণ! তোমরা আদমকে বেহেশতের সবচেয়ে সুন্দর একখানা আসনে উপবেশন করাইয়া দুই শত বৎসর কাল উহাকে সপ্ত-আসমান, বেহেশত-দোজখ, আরশ-কুরশী ইত্যাদির আশ্চর্যজনক দৃশ্যাবলীর

অপরূপ কীর্তি এবং আমার একাত্ববাদের কীর্তি ও নিশান পরিদর্শন করাও।'

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া আদমের নিকট 'মায়মুনা' নামক একটি বেহেশতী ঘোড়া হাজির করিল। উহার তামাম শরীর ছিল খালেছ বিশুদ্ধ মেশকের সুগন্ধিযুক্ত এবং আরো ছিল উহার দেহ অপরূপ সৌন্দর্যময় মুক্তার দুইখানা ডানা। আদম (আঃ) আল্লাহর হুকুমে উক্ত ঘোড়ার উপর সওয়ার হইলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ঘোড়ার লাগাম ধরিল এবং হযরত মিকাঈল ও ইস্রাফীল সোয়ারীর ডাইনে ও বামে দাঁড়াইয়া আদমকে (আঃ) আসমান, বেহেশত-দোজখ, আরশ-কুরসী ইত্যাদির সৌন্দর্য দেখাইতে রওয়ানা হইল। আদম (আঃ) যাইবার কালে পথিমধ্যে, ফেরেশতাগণকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলিতে বলিতে গমন করিতেছিলেন। ফেরেশতাগণও সালামের জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম'-বলিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া আল্লাহ বলিলেন ঃ

'হে আদম! অদ্য হইতে কেয়ামত পর্যন্ত তোমার ঈমানদার সন্তানগণের মধ্যে এইরূপ সালামের নিয়ম প্রবর্তন করা হইল-ঈমানদার সন্তানগণ একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ কালে ঐরূপ যেন সালাম করে।'

--০--

আদম সৃষ্টির গোড়ার কথা

মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহতা'লা তাঁহার বান্দারূপে জ্বিন জাতিকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারাও আমাদের মতই দুনিয়ায় বাস করিত। আমরা মাটি দ্বারা সৃষ্ট, জ্বিন জাতি মাটি দ্বারা সৃষ্টি নহে-তাহারা সৃষ্ট অগ্নি দ্বারা। আল্লাহ্ বলেন-

'আর আমি পয়দা করিয়াছি জ্বিন সম্প্রায়কে উত্তপ্ত অগ্নি হইতে।'

আমাদের যেমন আহার-বিহার, নিদ্রা-শয়ন, জন্ম-মৃত্যু, ভোগ-বিলাস, সুখ-দুঃখ ও স্ত্রী-পুত্র আছে, জিন জাতিরও অনুরূপ আছে। জিন এবং মানব জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে মানব জাতি সকল সৃষ্ট জীবের দৃষ্টির গোচরে, কিন্তু জিন জাতি এই প্রকার নহে। আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না কিন্তু তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পায়।

কেয়ামতের দিবস আমাদের ন্যায় জিন জাতিরও পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ হইবে এবং তাঁহার ফল ভোগ করিতে হইবে। তাহাদের জন্য বেহেশত-দোজখ নির্ধারিত আছে। আমরা যেরূপ আল্লাহর নির্দেশিত ইবাদত-বন্দেগী করিয়া থাকি, তাহাদেরও সেইরূপ করিতে হয়।

যেখানে আনুগত্য ও ইবাদতের কথা, সেখানেই আজাব ও ছাওয়াবের সাওয়াল। কারণ, আনুগত্যের বিপরীত অনানুগত্যতা প্রদর্শিত হইলেই সেখানে রোষ ও অসন্তোষের দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। ফল দাঁড়ায় তাহাকে শাস্তি দেওয়া। অপরদিকে যেমন হুকুম তেমন কর্মসম্পাদন, তাহার উত্তম প্রতিফল তথা বেহেশতে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বপালক এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কোরআনের ভাষায় এই কথাই উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন-

ফর্মান, জিন ও মানব এই দুনিয়ার পরে,
পয়দা করিয়াছি শুধু মম ইবাদত তরে।

বর্ণিত আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মানব জাতির ন্যায় জিন জাতিকেও আল্লাহর নির্দেশিত সকল ইবাদত-বন্দেগী করিতে হয়-ইবাদাত-বন্দেগীর নির্দেশ তাহাদের উপরও রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহাদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশিত কার্য পালনকারী অপেক্ষা নির্দেশ খেলাপকারীর সংখ্যা অধিকতর। সৎকার্য অপেক্ষা অসৎকার্যে তাহারা অধিক অনুরাগী।

কথিত আছে, আল্লাহ্ পাক জিন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিয়া দুনিয়ায় বসবাসের নির্দেশ দিলেন। আর বলিলেন-'তোমরা আমার ইবাদত-বন্দেগী করিবে'। এ নির্দেশ মত তাহারা কিছুদিন কালযাপন করিতে থাকিল। যেহেতু জিন জাতি অসৎ কাজেই অনুরাগী বেশী; তাই তাহারা আর বেশী দিন আল্লাহ পাকের সে নির্দেশ পালন করিতে পারিল না। ক্রমে তাহারা আল্লাহর হুকুমে খেলাপ করিতে আরম্ভ করিল এবং নিজেদের মধ্যে নিদারুণভাবে আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে, তাহারা পরস্পর কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়া মরিতে লাগিল। এক কথায়, তাহারা খোদাকে ভুলিয়া গেলো। রাব্বুল 'আলামীন খোদা তাহাদের এই আত্মকলহ এবং পরস্পর গর্হিত কার্য দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। বিশেষ করিয়া, তাহারা সকলে আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়ায় আল্লাহ পাক তাহাদের উপর চরম অসন্তুষ্ট হইলেন। আল্লাহর ইচ্ছা হইল এই পাপাচারী জিন জাতিকে

ধ্বংস করিয়া দিতে। তিনি খোদায়ী সিপাহী ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন খোদাদ্রোহী পথভ্রষ্ট জিন জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিবার জন্য।

ফেরেশতাদের বললেন খোদা জমিন মাঝে যাও,
অবাধ্য সব জিনের কওম খতম করে দাও।

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এই নির্দেশ পাইয়া সকল জিন জাতিকে সমূলে উৎখাত করিয়া দিল। দুনিয়াকে পাপাচারী পথভ্রষ্ট জিন সম্প্রদায় হইতে মুক্ত করিল।

খোদায়ী সিপাহী ফেরেশতাগণ জিন সম্প্রদায়কে সমূলে উৎখাত ও ধ্বংস করিবার সময় একটি ছোট জিন-শিশু ইবলীসকে পাইয়া তাহারা তাহাকে খুন করিল না। নিষ্পাপ শিশু দেখিয়া উহার প্রতি তাহাদের দয়া হইল। ফেরেশতাগণ সকল জিন জাতিকে ধ্বংস করিয়া ইবলীসকে লইয়া তাহারা খোদার দরবারে হাজির হইল। খোদা গায়েবের মালিক-সকল বস্তুর ভেদ তিনি ভালরূপে জ্ঞাত। খোদা পাক ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন-

'তবে একে তোমাদের মধ্যেই রাখিয়া শিক্ষা দাও।'

দেখিতে দেখিতে ইবলীস শিক্ষায় পক্ক পণ্ডিত হইয়া উঠিল। এমনকি, ফেরেশতাদের চাইতেও সে বড় জ্ঞানী হইয়া দাঁড়াইল, সে খ্যাত হইয়া গেল ঃ معلم الملئكة 'মোয়াল্লেমুল মালায়েকাহ'-ফেরেশতাদের গুরুরূপে।

এই সময় হইতে ফেরেশতাগণ তাহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। ইবলীস এত সম্মানের অধিকারী কেন হইয়াছিল, তাহা সর্বজ্ঞানী আল্লাহই ভাল জানেন।

যাহা হউক, জিন জাতি ধ্বংস করিবার পর আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা হইল মানব জাতি সৃষ্টি করিতে। মানব জাতির সৃষ্টির পিছনে কি রহস্য নিহিত তাহাও একমাত্র করুণাময় খোদাই ভাল জানেন। তিনি এক শুভ মুহূর্তে ফেরেশতাগণকে ডাকিয়া মানব সৃষ্টির মহৎ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ

'অবশ্যই আমি দুনিয়ায় বানাইব একজন প্রতিনিধি।

আল্লাহর এই ইচ্ছা বা অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি কাহারও নাই। বিশেষ করিয়া মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য একমাত্র তিনিই ভাল জানেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি সর্বজ্ঞানী, তাঁহার পরামর্শের প্রয়োজনই-বা কোথায়? আল্লাহর জ্ঞানের নিকট ফেরেশতাদের জ্ঞান সামান্য, তবুও তাহাদের ঐ সামান্য জ্ঞানে জিন জাতির আগমন ও খোদাদ্রোহীতা অবাধ্যতার দুঃখজনক কথা মনে পড়ায় তাহারা খোদার দরবারে আরজ করিয়া বলিল–

'হে খোদা! আপনি কি সৃষ্টি করিতে চাহেন পৃথিবীতে যাহারা করিবে তথায় ফাসাদ পরস্পর করিবে রক্তারক্তি? আমরাই তো আপনার গুণকীর্তন আর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।'

ফেরেশেতাগণ মানব সৃষ্টির গূঢ় রহস্য ও তথ্য বুঝিতে পারিল না। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কোথায়, তাহাও তাহারা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিল না এই মহৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কোথায়? কেনই বা তাহাদের কাছে পরামর্শ তলব করা হইল। এতদসত্ত্বেও তাহারা এইরূপ মন্তব্য করিলই-বা কেন? কোথায় তাহার রহস্য!

তাইতো আল্লাহ্ পাক তাহাদের বুঝাইয়া বলিলেন ঃ

'মানব সৃষ্টির গূঢ় রহস্য ও তথ্যাবলী আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা অবগত নহ।'

মোটকথা, মানবের আদি-পিতাকে আল্লাহ্ পাক মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। কিরূপে এবং কেমন করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে আদম সৃষ্টির রহস্যে বলা হইয়াছে। যাহ হউক, আল্লাহ্ মানবের আদি-পিতাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন 'আদম'। অতঃপর তিনি হযরত আদমকে (আঃ) বেহেশতের যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করিলেন। তারপর ফেরেশতাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য আল্লাহ্ পাক আদমকে তাহাদের সম্মুখে হাজির করিয়া সেই সব বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরীক্ষা হইবে আদম ও ফেরেশতা-এই দুই কওমের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ফেরেশতাগণ সেই সব বস্তুর কোনটারই নামকরণ ও গুণাগুণ বর্ণনা করিতে পারিল না, তাই তাহারা ওজরখাহী হইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিল ঃ

'হে খোদা! আপনি পরম পবিত্র, আপনি সর্বজ্ঞানী, আমাদের কোন জ্ঞান নাই; আপনি আমাদের যতটুকু শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই আমাদের জ্ঞানের শেষ সম্বল। আপনি সর্বজ্ঞানী এবং আপনার জ্ঞান অসীম।'

ইহার পরে আল্লাহ্ আদম নবীকে সেই বস্তুর নাম ও গুণাবলীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন ঃ

'হে আদম! তুমি উহাদেরকে এইসব বস্তুর নাম ও গুণাবলীর বিষয় বলিয়া দাও।' আল্লাহর এই নির্দেশ শোনামাত্র হযরত আদম (আঃ) তাহাদেরকে সেই সব বস্তুর নাম ও গুণাবলী ঝটপট বলিয়া দিলেন। ফেরেশতাগণ লজ্জিত হইল, তাহাদের মস্তক হইয়া আসিল অবনত। তাহারা বুঝিল, সত্যই আদম আমাদের চেয়ে বিজ্ঞতর। প্রমান হইয়া গেল, আদম নবী ও ফেরেশতা এই দুই জাতের মধ্যে আদম শ্রেষ্ঠ। আরও প্রমাণিত হইল যে, আদম জিন জাতি হইতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ, ফেরেশতাগণ সৃষ্ট খোদার নূরে আর জিন জাতি (ইবলীস) সৃষ্ট অগ্নি হইতে। কাজেই ফেরেশতাগণ জিন জাতি হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, আদম তো ফেরেশতা কম হইতে শ্রেষ্ঠতর হওয়ারই কথা।

এখানে আদম সৃষ্টির গূঢ় রহস্য লক্ষ্য করিলেই আমরা সহজে বুঝিতে পারি, আদম সৃষ্টির রহস্য কোথায়, কেনই বা আদমকে সৃষ্টি করা হইল? আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, আদম সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি জাতি সৃষ্টি করা। যাঁহাকে খোদা তাঁহার নিজ প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করিবেন। আর এইরূপ সৃষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ্র এই প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি কিরূপে অন্যের হাতে অর্পণ করিতে পারেন? সেই গুরুত্বের মর্যাদা-ই-বা কে দিতে জানিত? মনে হয়, এই জন্যই আল্লাহ্ ইবলীসসহ সকল ফেরেশতাদের হযরত আদম নবীর সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করিতে বলিয়াছিলেন।

আল্লাহ্ তায়ালার গূঢ় রহস্য এই মহান নির্দেশ বাণী পাওয়া মাত্র সকল ফেরেশতাগণ আদমকে সম্মানের জন্য সেজদা করিল। কিন্তু আত্মগর্বিত ইবলীস অহংকারে ডুবিয়া তাঁহাকে সেজদা করিল না বরং বলিল ঃ 'কেন আদমকে সেজদা করিব? আমি তো আদম হইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে আগুন হইতে আর আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে নিকৃষ্ট মৃত্তিকা দ্বারা, আমিই তো উত্তম।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

'অইয কুলনা লিল মালায়িকাতিসজুদু লি-আদামা ফাসাজাদু ইল্লা ইবলীসা, আবা অস্তাকবারা অ-কানা মিনাল কাফিরীন।

আর আদমকে যখন সেজদা করিতে আদেশ দিলাম সকল ফেরেশতাদের- সকলে সেজদা কর আদমকে। তখন সকলেই সেজদায় পতিত হইল ইবলীস ব্যতীত। সে নির্দেষ পালন করিল না, অহংকারে গর্বিত হইল। ফলে সে কাফের দলভুক্ত হইল-হইয়া গেল অভিশপ্ত।'

আজাজিল না মানিয়া আল্লার ফরমান,
হয়ে গেল বিতাড়িত ইবলীস শয়তান।

একদা ছিল ইবলীস ফেরেশতাদের মধ্যে মহাজ্ঞানী পণ্ডিত- 'মুয়াল্লিমুল মালায়েকা' বা ফেরেশতাদের শিক্ষাগুরু। আর আজ সে অভিশপ্ত শয়তান। আত্মগৌরব ও অহংকার জাতিকে এমনতর সর্বনিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত করে- জাতিকে টানিয়া আনে নিকৃষ্টস্তরে।

সে যাহা হউক- আল্লাহ্ আদমকে বেহেশতে থাকিতে স্থান দিলেন এবং বলিয়া দিলেন ঃ 'হে আদম! এই বেহেশত তোমার পানাহার এবং বসবাসের স্থান। এখানে যাহা ইচ্ছা খাওয়া-দাওয়া ও আচরণ-বিচরণ করিতে পার।' অতঃপর একটি বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন ঃ সাবধান! ভুলেও ঐ বৃক্ষের ধারে যাইবে না; তবে কিন্তু তুমিও সীমা অতিক্রমকারীদের মধ্যে শামিল হইয়া পড়িবে।' হযরত আদম আল্লাহ্ পাকের এইরূপ কড়া তাকীদা নির্দেশ পাইয়া সেই বৃক্ষের দিকে ভুলেও যাইতে চাহিতেন না; ফল খাওয়া তো দূরের কথা।

এইরূপ চলিল অনেক দিন। আদম একা বেহেশতের বাগানে। তাঁহার কোন সাথী নাই, সঙ্গী নাই। এইরূপ জীবন আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই তিনি তাঁহার সঙ্গে বেহেশতে থাকার একজন সাথীর প্রার্থনা করিলেন আল্লাহ্‌র নিকটে। আল্লাহ্ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। আল্লাহ্ তাঁহার করুণা বলে হযরত আদমের বাম পাঁজরের কোন একটি হাড্ডি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া দিলেন তাঁহার সাথীরূপে বিবি হাওয়াকে। আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তিনি বিবি হাওয়াকে স্ত্রী-রূপে বরণ করিয়া লইলেন। এইবার মিয়া-বিবি দুই সাথী মিলিয়া মহাসুখে বেহেশত বাগানে বসবাস করিতে লাগিলেন।

বাম পাঁজরের হাড্ডি হইতে বাবা আদমের,
পয়দা হল আদি মাতা সকল মানবের।

সূরত-জামাল, রূপ-চেহারা দিব্য চমৎকার,
'হাওয়া' বলে নাম রাখিলেন আল্লা তালা তার।
মিলে দুজন আদম-হাওয়া নাইযে মিলের তুল,
স্বর্গ ধামে রইল হাসি-খুশীতে মশগুল।

-০-

তিন ঃ শয়তানের সৃষ্টি রহস্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শয়তানের সৃষ্টি কোথায়? তবু পাঠকের মন তৃপ্তির জন্য শয়তানের সৃষ্টি রহস্যের বিষয় বিস্তারিত আরও কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

ফেরেশতাগণ হইলেন আল্লাহ্‌র স্বীয় নূরে সৃষ্টি। তাঁহাদের আহার-বিহার, রোগ-শোক, কাম-ক্রোধ বলিতে কিছুই নাই। তাঁহারা নিষ্পাপ।

সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল। তাঁহাদের পাখা আছে। সেই পাখা দ্বারা তাঁহারা দুনিয়ার সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। মন্দ বা পাপের কাজ কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানেন না। ভাল কাজ ছাড়া মন্দ কাজ তাঁহারা করেনই না। ফেরেশতাগণ মানব চক্ষে অদৃশ্য।

জিন জাতি অগ্নি হইতে সৃষ্টি। মানব সৃষ্টি মাটি হইতে। মানব জাতি আর জিন জাতির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মানুষ যেমন পানাহার করে, বিবাহ-শাদী করে, তাহাদের জন্ম-মৃত্যু আছে, অনুরূপ জিন জাতিরও আছে। তবে জিন জাতি মানব চক্ষে অদৃশ্য আর মানব জাতি দৃশ্য। এতদ্ব্যতীত, মানব জাতি খোদার ইবাদত-বন্দেগীতে অধিক অনুরক্ত। কিন্তু জিন জাতি সেইরূপ নহে, বরং তাহারা পুণ্যের কাজ হইতে পাপের কাজের দিকে অনুরক্ত অত্যধিক। মানব জাতি আশরাফুল মাখলুকাত 'সৃষ্টির সেরা', কিন্তু জিন জাতি তাহা নহে। ইবলীস শয়তানও এই জিন জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ইবলীস শয়তানও পাপ কার্যে অনুরাগী সর্বাধিক। ভাল কাজ সে জানে না বলিলেই চলে।

এই ইবলীস শয়তান ছিল এক সময়ে ফেরেশতাদের প্রধান, তাঁহাদের ওস্তাদ। আদমকে (আঃ) সম্মানের সেজদা করার নির্দেশ অমান্য করায় সে

হইয়া গেল বিতাড়িত শয়তান। ফেরেশতাদের সঙ্গ হইতে তাহাকে করিয়া দেওয়া হইল বহিষ্কার। বেহেশতে তাহার আর স্থান রহিল না, সে পদে পদে লাঞ্ছিত, বিতাড়িত। আত্মগরিমা বা অহংকার শয়তানকে লাঞ্ছনার এমনিতর নিম্নস্তরে পৌছাইয়া দিল! শয়তানের দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। কিন্তু শয়তানের করার তখন কিছু রহিল না।

অহংকার ও আত্মগরিমা এতই ভয়ংকর চরিত্র যে, যাহার মধ্যে এই ধ্বংসাত্মক কুৎসিত স্বভাব থাকিবে, তাহার দিন-দুনিয়ার উন্নতি বলিতে কিছুই হাছিল হইবে না। অহংকার একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় কাজ ও খোদাদ্রোহী স্বভাব, অপর দিকে অহংকারী মানুষ মানব সমাজেও ধিকৃত। পরিণাম হয় তাহার অশুভ-দোজখ তাহার অবধারিত।

যাহা হউক, শয়তান আর কোন উপায় না দেখিয়া সে শত্রু হইয়া পড়িল হযরত আদম নবীর। যে আদমের (আঃ) উপলক্ষ করিয়া সে আজ শয়তান-বেহেশতে তাহার নাই স্থান; তাঁহার বিরুদ্ধে যাওয়া বা শত্রু হওয়া স্বাভাবিক। শয়তান ভাবিল-'যে আদমের (আঃ) জন্য আমি শয়তান হইলাম, বেহেশত হইতে আমাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল, সেই আদম কি প্রকারে বেহেশতে বসবাস করে তাহা দেখিয়া লইতে হইবে- আমিও থাকিব না, আর তাহাকেও থাকিতে দেওয়া হইবে না।

শয়তান উপায় খুঁজিতে লাগিল কি অপরাধে আদমকে বেহেশতের বাগান হইতে বাহিরে আনা যায়। শুধু তাহাই নহে, যুগ যুগ ধরিয়া আদম সন্তানকে কিরূপে বিপথগামী এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত করিয়া তাহার মত অন্যায়কারী রূপে সাজানো যায়; সেই দুশ্চিন্তাও সে করিতে লাগিল। এইজন্য বেশ সময়ের দরকার। এত স্বল্প সময়ে এত বড় কাজ সম্পাদন করা যে চারটিখানি কথা নয়- নয় ছেলে খেলা। তাই খোদার দরবারে সে তাহার কেয়ামত পর্যন্ত জীবন ভিক্ষা চাহিয়া বলিল ঃ

'হে খোদা! অবকাশ দিন আমায় কেয়ামত পর্যন্ত।' উত্তরে আল্লাহ্‌ বলিলেন ঃ 'আচ্ছা, তোমাকে অবশ্য অবকাশ দেওয়া গেল।'

একেতো শয়তানের মনে আদম নবীর উপর ক্রোধ, তার উপর আরও অবকাশ পাইল সে কেয়ামত পর্যন্ত আয়ুর। কাজেই এতবড় দীর্ঘ সময়ের

সুযোগ সে হেলায় হারাইতে রাজী নহে- ব্যবহার করিবে সে এই অমূল্য সুযোগ যথাযথ; একথা আল্লাহ্‌কে জানাইয়া শয়তান পুনঃ বলিল ঃ

'হে খোদা! অনন্তর আমি আক্রমণ চালাইব আদমের উপর, তাহার সন্তান গোষ্ঠির উপর, তাহাদের সম্মুখ ও পিছনের দিক দিয়া। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের ডান বাম দিয়াও আমার এই আক্রমণ অভিযান অনবরত চলিতে থাকিবে। একদিন দেখিতে পাইবেন, অধিকাংশ আদমজাত আপনার অকৃতজ্ঞ।' আদম সন্তানের উপর শয়তানের এইরূপ অভিযান চালাইবার কথাই বটে। কারণ, যাহার জন্য সে আজ অভিশপ্ত, এমনকি বেহেশত হইতে সে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, কেন সে আদম ও আদম সন্তানের প্রত্যেক পদে পদে লাগিয়া থাকিবে না?

হাদীস শরীফে আছে, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরা প্রত্যেক স্থানে তাহার অভিযান চালাইতে সক্ষম। এমন কি মানুষের অন্তরেও তাহার স্থান। এইসব শয়তানী অভিযানের ফল আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আমরা যে অন্যায় কাজ করিয়া থাকি, তাহার প্রেরণা আমাদের অন্তরে কে যোগায়? কে ইহার ওস্তাদ? সমস্তই সেই গুরু ইবলীস-শয়তানের প্রেরণা ও উপদেশ ক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা অবুঝ শিশুটির মত নীরবে তাহা সম্পাদন করিয়া যাই। ঘুণাক্ষরেও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, ইহা আমাদের চির দুশমন শয়তানের ক্রিয়া-কাণ্ড।

খোদা আদম সন্তানকে শয়তানের অভিযান হইতে সাবধান থাকিবার জন্য নির্দেশ করিলেন। ইহাতে যে অবহেলা করিবে তাহার এবং শয়তানেরই-বা পরপারে কি দশা হইবে, তাহা উচ্চারণ করিয়া আল্লাহ্‌ পাক শয়তানকে শুনাইয়া দিলেন—

'মনে রাখ শয়তান। নিশ্চয় আমি দোজখ পরিপূর্ণ করিব তোমার এবং তোমার অনুগামীদের দ্বারা।'

'শয়তান সে শয়তান।' আল্লাহ্‌র এই হুশিয়ার বাণী সে শুনিবে কেন? আরও পাইয়াছে সে চিরদিনের জীবন- মরিবে না সে কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘদিন।

শয়তানের প্রথম অভিযান চলিল, কিরূপে আদমকে বাহির করা যায় বেহেশতের বাগান হইতে। মনে পড়িল তাহার সেই কথা– আল্লাহ্র সেই নিষেধ বাণী–. 'হে আদম! বেহেশতে বসবাস কর, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, যাহা ইচ্ছা তাহাই খাও। কিন্তু ঐ বৃক্ষের ধারে–কাছেও যাইও না।' শয়তান উপায় খুঁজিতে লাগিল, কিরূপে আদমকে সে বৃক্ষের ফল খাওয়ানো যায় এবং অপরাধীরূপে বেহেশত হইতে বাহিরে আনা যায়। অনেক চেষ্টা–চরিত্রের পরে একদা সে আদম নবী ও তাহার সঙ্গিনী বিবি হাওয়াকে সেই বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া ফেলিল। শয়তানের তো আর খুশীর সীমা নাই। তাহার প্রবঞ্চনা আদম নবি ও হাওয়ার উপর জয়লাভ করিল। দুর্বৃত্ত শয়তান আদম–হাওয়াকে বিপদে ফেলিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

আদম ও হাওয়া অপরাধীরূপে খোদার দরবারে হাজির হইলেন। আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে এবং তাঁহার সন্তান–সন্ততিকে আরও পরীক্ষা করিবেন। তাই তিনি তাঁহাদেরকে পরীক্ষার জন্য দুনিয়ায় প্রেরণের ইচ্ছা করিলেন। আদমকে আল্লাহ্ পাক এত তাড়াতাড়ি ক্ষমা করিবেনই বা কেন? প্রথম পরীক্ষায়ই যখন তাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তখন এত তাড়াতাড়ি ছাড়িবেন বা কি করিয়া। তাই আল্লাহ্ পাক আদমকে বলিলেন ঃ

'সপরিবারে নীচে চলিয়া যাও, দুনিয়ায় গিয়া এখন বসবাস কর। মনে রাখিবে, তোমরা পরস্পর একে অন্যের শত্রু থাকিবে। কাজেই হুশিয়ার হইয়া সেখানে বসবাস করিবে। ভূ–পৃষ্ঠেই তোমাদের স্থান–পরীক্ষা কেন্দ্র। সেইখানে থাকিয়া এক নির্দিষ্ট সময় লাভবান হইতে থাক।'

না বুঝিয়া আদম হাওয়া ইবলিসী শয়তানী,
ধোকায় পড়ে সে ফল খেয়ে করল নাফরমানী।
বেজায় হলেন আল্লা তালা হুকুম দিলেন তাই,
যাও জমীনে তোমাদিগের স্বর্গে নাই ঠাঁই।

খোদা আরও বলিয়া দিলেন ঃ 'দুনিয়ায়ই তোমাদের জীবন–যাপন করিতে হইবে। আর সর্বশেষে কেয়ামতের পূর্বে আবার সেখান হইতেই পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া হাশরের ময়দানে হাজির হইতে হইবে।'

যাহা হউক, আদম নবী বেহেশত হইতে দুনিয়ায় চলিয়া আসিলেন। দুনিয়ায় আসিয়া নেহায়েত লজ্জা–শরমে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে শয়তান তো তাঁহার পিছনে লাগিয়াই আছে, কোন সময় আদমকে বিপথগামী করা যায়। কিন্তু তাহা আর কি হয়! চক্রান্ত ও চালবাজী আর কতবার চলিতে পারে! তবে এই কাজ করিয়াই শয়তানের খেদ মিটিল না, যুগে যুগে আদম সন্তানকেও বিপথগামী করিবার উদ্দেশ্যে আদা–পানি খাইয়া সে লাগিয়া আছে এবং থাকিবে।

খোদাগো, মোদের এই বিনীত প্রার্থনা,
অভিশপ্ত শয়তান হইতে চাই পানা।

–০–

মানব সৃষ্টি রহস্য

এবারে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হইল–মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে। মানুষকে আল্লাহ্ সবচাইতে সুন্দর কায়া বিশিষ্ট পয়দা করিয়াছেন। এ মানুষ কোথা থেকে, কিভাবে আসিল, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সূরা মুমিনের ১২শ আয়াতে বলেন–

ঃ মাটির পিণ্ড হইলে আমি মানব সৃষ্টি করিয়াছি।

আল্লাহ্ মানবকে সৃষ্টি করিয়া যখন পৃথিবীতে প্রেরণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যবস্থা এভাবে করেন যেন এক এক হইতে ক্রমান্বয়ে বংশধারা পয়দা হয়। তাই পুরুষ আর নারী এ দু শ্রেণীতে মানুষ সৃষ্টি করা হইল। আর তাদের মধ্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়া দিলেন পারস্পরিক ভালবাসা ও আকর্ষণ। সে আকর্ষণ একে অন্যের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন যে, তারা পরস্পরে গভীর আকর্ষণে মত্ত হইল। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিলেন পারস্পরিক কামনা, যাতে দাম্পত্য জীবন পরস্পর একত্রে বসবাস করিতে পারে।

নর–দেহের একটি নির্দিষ্ট অঙ্গে যাকে সাধারণ কথায় 'সন্তান উৎ–পাদক যন্ত্র' বলে, সৃষ্টি করিয়াছেন, যার সাহায্যে নারীগর্ভে বীর্য নিক্ষেপ করিতে পারে। সেখানে বীর্য স্থির হইয়া ক্রমান্বয়ে মানবদেহে রূপান্তরিত হয়।

মানবদেহ গঠিত হইতে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। অর্থাৎ বীর্য হইতে জমাট রক্ত, জমাট রক্ত হইতে মাংসপিণ্ড, তারপর অস্থি, তার উপরে গোশতের আবরণ আবার তাকে শিরা উপশিরার জাল দ্বারা বেষ্টন করতঃ মানব দেহের আকারে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর কান, চোখ ও দেহের অন্যান্য অংশগুলি সৃষ্টি হয়। পরে এতে শক্তির সঞ্চার হয়।

চক্ষের দৃষ্টিশক্তি এমন এক বিস্ময়কর যার ব্যাখ্যা দেওয়া দুঃসাধ্য। চক্ষু সাত স্তরে গঠিত। তার প্রত্যেক স্তরের কাজ ভিন্ন এবং তার আকারও বিভিন্ন। যদি তার একটি স্তরও নষ্ট হইয়া যায়, তবে চক্ষের দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। চক্ষের চতুর্দিকে সূক্ষ্ম পলকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, চক্ষের ন্যায় নাজুক অঙ্গের হেফাজতের জন্য এগুলি সৃষ্ট করা হইয়াছে। একে আল্লাহ্ দ্রুত উঠানামার শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন–চোখের দিকে ক্ষুদ্র কোন কিছু আসিতে দেখা মাত্র পলকগুলি দ্রুত সক্রিয় হইয়া উঠে আর বিপদাংকা থেকে চক্ষুকে রক্ষা করে। বায়ুতে উড়ন্ত ধূলা-বালি থেকে চক্ষুকে বাঁচায়, পলক দুটি যেন চোখের দুখানি কপাট, প্রয়োজনে খোলে আবার প্রয়োজন মত বন্ধ হইয়া চোখকে আপদ বিপদ হইতে প্রতিরক্ষা করে।

চোখের হেফাজত ছাড়াও পলক সৃষ্টির মধ্যে চেহারার এবং চোখের সৌন্দর্য নিহিত রহিয়াছে। এ কারণে পলকের পশমগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে পরিমাণ মত, যদি খুব লম্বা হইত তা হইলে চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক আর যদি খুব ছোট হইত, চোখের পক্ষে তা হইত ক্ষতিকর। চোখের পানিকে আল্লাহ্ লবণাক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাতে চোখের ভিতরের ময়লা পরিষ্কার হইয়া যায়। পলকের উভয় পার্শ্ব কিছুটা নিম্নমুখী ঝুকানো, যাতে চোখের পানি চোখের কোন হইয়া অশ্রুরূপে বহিয়া যাইতে পারে। চোখের ভ্রূগুলি যেমন চোখকে হেফাজত করে তেমনি চেহারার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। ঝালরের ন্যায় সজ্জিত পশমগুলি চেহারাকে অপরূপ শোভায় শোভিত করে।

মস্তক এবং দাড়ির কেশগুচ্ছ আল্লাহ্ এভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, যা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বর্ধিত হয়। মানুষ তা কাটিয়া-চাটিয়া চেহারা ও আকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারে। মুখ আর জিহ্বা আল্লাহ্‌র সুনিপুণ

কারিগরীর দুটি নিদর্শন। মুখ বন্ধ করার জন্য কবাট স্বরূপ দু'খানা ওষ্ঠ সৃষ্টি করা হইয়াছে, যা প্রয়োজনের সময় খোলা যায় আর যখন প্রয়োজন থাকে না তখন তা বন্ধ রাখিয়া ক্ষতিকর দ্রব্য মুখে প্রবেশ করা হইতে রক্ষা করা যায়। তা ছাড়া, দাঁত আর মাড়ির হেফাজতও ওষ্ঠের দ্বারা হইয়া থাকে। ওষ্ঠ না হইলে মুখ দেখিতে বিশ্রী আর তার হেফাজতও হইত না। কথা বলার সময় ওষ্ঠের সাহায্য অপরিহার্য। ওষ্ঠের সঞ্চালনের বর্ণ উচ্চারণ করা হয়। বর্ণের সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি হয়; আর এ দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। আবার ওষ্ঠের সাহায্যে পানাহারে সুবিধা হয়। মুখের মধ্যে খাদ্য নাড়াচাড়া করার বেলায় ওষ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন।

দন্তপাটি আল্লাহ্ কিভাবে গঠন করিয়াছেন। দাঁতগুলি বত্রিশ খণ্ডে আলাদা আলাদা বিভক্ত রহিয়াছেন। সবগুলি খণ্ড একখানা হাড় করিয়া তৈরী করা হয় নাই। তা হইলে তা হইত ভারি অসুবিধাজনক। দাঁতগুলি যেভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন তাতে দু'একটি দাঁত নষ্ট হইলে বাকীগুলি ব্যবহার করা যায়। যদি দাঁত একখানা অভিন্ন হাড় হইত তবে তা সম্ভব হইত না। মুখের শ্রী সৌন্দর্য ছাড়াও আমরা দাঁত দ্বারা অনেক কাজ করিয়া থাকি। দাঁত ছাড়া আহার করাই কঠিন হইত। কোন শক্ত দ্রব্য খাওয়া চলিত না। দাঁত এমন মজবুত ভাবে গড়া যে, কঠিন ও শক্ত হাড়গুলি দাঁতের সাহায্যে চুরমার করা যায়। এ কারণে মাড়ীর গোশত বিশেষ ভাবে শক্ত করিয়া তৈরী করা হইয়াছে। নরম হইলে দাঁতগুলি সুদৃঢ় আর কাজের উপযুক্ত হইত না। খাদ্য উত্তমরূপে চর্বিত হওয়ার প্রয়োজন এই যে, খাদ্য-দ্রব্য পেটে পৌছিয়া তা সহজে হজম হইয়া শরীরে পুষ্টির সৃষ্টি করে। আর দেহকে কর্মক্ষম ও শক্তিশালী করিয়া তোলে।

দেহ-বিজ্ঞানীদের মতে খাদ্য পরিপাকের কয়েকটি স্তর আছে। তার প্রথম স্তর হইল মুখ। যাকে প্রথম পরিপাক যন্ত্র বলে। দাঁতের দুই পার্শ্বে শক্ত মাড়ি আছে, এর সাহায্যে শক্ত দ্রব্য চর্বণ করা যায়। ইহারা সুদৃঢ় মূল বিশিষ্ট মোতির মালার ন্যায় পরস্পর সন্নিহিত। মুখের মধ্যে দু'পাটি দাঁত মূলত দেখিতে বড়ই সুন্দর।

মুখের গহ্বরে আল্লাহ্ তরল লালা এমনভবে গুপ্ত রাখিয়াছেন, যা খাদ্যদ্রব্য চর্বণের সময় নির্গত হয়। আর তা খাদ্যের সাথে মিশিয়া হজম

ক্রিয়ার সহায়তা করে। তা যদি অন্য সময়ে মুখ ভরিয়া থাকিত, তবে কথা-বার্তা বলা হইত ভারী অসুবিধা-আর মুখ খোলাই হইত কঠিন। কেননা, মুখ খুলিতেই তা বাহির হইয়া পড়িত। সুতরাং তা খাদ্য চর্বণের সময় বাহির হইয়া হজমের সহায়তা করে। খাবার পরে লালা নির্গত হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। এতে আল্লাহর অশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় বিদ্যমান। অবশ্য পরে এতটা লালা থাকিয়া যায় যা কণ্ঠনালী সিক্ত রাখে, যদি কণ্ঠনালী শুকাইয়া যাইত, তবে কথা বলা হইত দুঃসাধ্য। এমনকি, কণ্ঠনালী শুকাইয়া যাওয়ার ফলে শ্বাসগ্রহণ করা হইয়া পড়িত অসম্ভব, ফলে প্রাণনাশ হইত অনিবার্য।

জিহ্বা ঃ আল্লাহ্ মানুষের আহার করার জন্য জিহ্বায় স্বাদ গ্রহণের শক্তি দান করিয়াছেন। যাতে সে রুচিকর খাদ্য গ্রহণ করে অরুচিকর ও বিস্বাদ খাদ্য বর্জন করে। স্বাদের কারণে খাদ্য হয় আরামদায়ক আর সুখকর, অপরদিকে সুস্বাদু খাদ্য অতি সহজে হজম হয়।

খাদ্য-দ্রব্য তাজা, বাসি, ঠাণ্ডা, গরম সব কিছু জিহ্বাই যাচাই করে।

আমাদের উপরি উক্ত বর্ণনার সমর্থ পাই আমরা আল্লাহ্র কালামে। সূরা বালাদে আল্লাহ্ বলেন-

ঃ আমি কি তার জন্য দুই চোখ, জিহ্বা আর ওষ্ঠ দেই নাই?'

আল্লাহ্ মানুষকে দুটি কান দিয়াছেন। কানের অভ্যন্তরে এক প্রকার তরল দ্রব্য আছে যা শ্রবণ শক্তিকে সংরক্ষণ করে আর কীট প্রভৃতি অনিষ্টকর প্রাণী যাতে কানে প্রবেশ না করে। কানের ছিদ্রের উপরে এক একটি ঝিনুকাকৃতি পাখা সৃষ্টি করা হইয়াছে, যা শব্দকে সংযত করে এবং কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিতে সাহায্য করে। কানের পাখায় আল্লাহ্র এমন তীব্র অনুভূতি দান করিয়াছেন যে, কোন ক্ষতিকর প্রাণী বা কোন কিছু কান স্পর্শ করা মাত্রই টের পায়। কানের ছিদ্রকে বক্র এবং পেচানো রূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাতে শব্দ দীর্ঘ হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে আর কোন কীট পোকা প্রভৃতি সহসা কানের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। পেঁচানো পথে ভিতরে যাইতে বিলম্ব হয়। আর তা বাহির করা বা ধ্বংস করা হয় সম্ভব।

নাক ঃ আল্লাহ্ পাকের মানুষের মুখমণ্ডলের মধ্যখানে উন্নত নাসিকাটি কি সৌন্দর্য সৃষ্টি। তার দুটি ছিদ্রে ঘ্রাণের অনুভূতি শক্তি সংরক্ষিত করা হইয়াছে, যদ্বারা খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের ঘ্রাণ অনুভব করা যায়। ইহার সাহায্যে লাভ করা যায় খোশবুর আনন্দ আর নাক বন্ধ করিয়া রক্ষা পাওয়া যায় বদবু হইতে।

নাসিকার সাহায্যেই নির্মল বায়ু সেবন করিয়া প্রাণকে সজীব করা সম্ভব হয়। আর দেহের আভ্যন্তরীণ তাপও এর ফলে বৃদ্ধি পায়। এই নাসারন্ধ্র মানুষের বহু প্রয়োজনে আসে। শব্দ নির্গমনে জিহ্বার সাহায্যে স্বর উচ্চারণ, শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল এসব ব্যাপারে নাসারন্ধ্র কাজে আসে। কোন কোন লোকের নাসারন্ধ্র খুব সরু, আবার কারো কারো খুব বড়, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি বা হ্রস্ব। এসব বিভিন্নতার কারণেই স্বরের তারতম্য হয়। এ কারণে দু'জনের স্বর কখনও এক রকম হয় না। যেমন দু'জনের আকৃতি কখনও এক হয় না, তেমনি দু'জনের স্বর কখনও এক রকম না। স্বর শুনিয়া লোক চেনা যায়। যেমন চেনা যায় একজনের চেহারা দেখিয়া। এই বিভিন্নতার মধ্যে আছে আল্লাহ্র সুনিপুণ কারিগরীর নিদর্শন। এই বিভিন্নতা আল্লাহ্ সৃষ্টির আদি হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন। হযরত আদম আর হাওয়ার আকৃতির মধ্যেও ছিল বিভিন্নতা, সেই বিভিন্নতা তাদের আওলাদের মধ্যেও ক্রমাগত আসিয়াছে। আল্লাহ্ সুনিপুণ কুদরতের পরিচয় আছে এই বিভিন্নতার মধ্যে। এই পার্থক্যের কারণে আমরা রক্ষা পাই অনেক মুশকিল হইতে।

আল্লাহ্ মানুষকে দু'খানা হাত দিয়াছেন, যার প্রয়োজনীয়তা শুমার করা কঠিন। হাত দু'খানা দ্বারা মানুষ করে উপার্জন আর প্রতিরোধ করে দুশমন। চওড়া পাঞ্জা, পাঁচটি আঙ্গুল এক সারিতে তৈরী করিয়াছেন। পঞ্চম বা বৃদ্ধাঙ্গুলি কিঞ্চিত দূরে, যাতে প্রত্যেকটি আঙ্গুলি সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে। হাতের এই গঠন নৈপুণ্যের বিপরীত দুনিয়ার সকল লোক একত্রিত হইয়া যদি হাতকে অন্য গঠনে তৈরী করার পরিকল্পনা করে, তা এর চাইতে উত্তম ও কার্যকর রূপ দেওয়া কখনো সম্ভব হইবে না। হাতের এই গঠনের সাহায্যে মানুষ যা ইচ্ছা ধারণ করিতে, উঠাইতে, নামাইতে ও দিতে-নিতে পারে। হাতের তালু বিস্তার করিলে হাত

একখানা থালার ন্যায় বানাইয়া নেওয়া যায়।, আবার মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া শত্রুকে আঘাত করা যায় কিংবা ভয় দেখানো যায়। আবার অঞ্জলী বানাইয়া পানি পান করার কাজে ব্যবহার করা চলে। চলে তার দ্বারা চামচের কাজ। হাত দ্বারা ঝাড়-মোছার কাজও করা যায়।

অঙ্গুলির মাথায় সৃষ্টি করা হইয়াছে নখ। এতে যেমন বাড়িয়াছে অঙ্গুলির সৌন্দর্য, তেমনি তা দ্বারা হেফাজত হয় অঙ্গুলিগুলি। আবার কোন জিনিস হাতে তোলার ব্যাপারে নখের সাহায্য দরকার; নখ ব্যতীত মাটি থেকে ক্ষুদ্র জিনিসগুলি তোলা সম্ভব নয়। শরীর চুলকাইতে নখের সাহায্য নেওয়া হইয়া থাকে।

নখ শরীরের কত ক্ষুদ্র অংশ এবং তা খুবই নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়, তারও বহু উপকারিতা আছে। অঙ্গুলির মাথায় যদি নখ না থাকে আর শরীরে যদি খুব চুলকানী হয় তবে তার কি-ইনা হয় নাজেহাল অবস্থা। নখের কার্যকারিতা কত ব্যাপক ও সুন্দর।

নখকে আল্লাহ্ না হাড়ের ন্যায় শক্ত, না গোশতের ন্যায় নরম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নখ বর্ধনশীল, ভাঙে পুনঃ জন্মে, অধিক বাড়িলে কাটিয়া ফেলা হয়। নিদ্রায়, জাগরণে চুলকাইতে হাত আপনা থেকে সেখানে যায়, আল্লাহ্ একে এই কার্যকারিতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ্ মানব দেহে দু'টি রান আর দু'খানি নলা সৃষ্টি করিয়াছেন। সেগুলি প্রসারিত করা যায়। তার সাথে সৃষ্টি করিয়াছেন দু'খানি পা। তার উপর ভর করিয়া দাঁড়ান যায়, তার সাহায্যেই চলাফেরা করিতে হয় আর দৌড়ানোর সময় দৌড়ানো যায়। পায়ের অঙ্গুলিতেও নখ রহিয়াছে, যার ফলে অঙ্গুলির শোভা বর্ধন হইয়াছে। আর এতে হেফাজতের কাজও হইয়া থাকে।

এসবই আল্লাহ্ মানবদেহের নাপাক বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। শরীরের অস্থিগুলিও আল্লাহ্র সেই অপবিত্র বীর্যের তৈরী। অস্থিগুলি দেহের খুঁটি স্বরূপ। তার উপর সারা দেহটি নির্ভরশীল। অস্থিগুলির গঠন ও আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তা কত রকমের বাঁকা, সোজা, লম্বা, গোলাকৃতি, নিরেট ফাঁপা, চওড়া, সরু, হালকা, আর ভারী প্রভৃতি নানা গঠনের অস্থি রহিয়াছে মানব দেহে। হাড়গুলির সন্ধিস্থলে

রহিয়াছে এক প্রকার তরল লালার ন্যায় পদার্থ, যাতে করিয়া অস্থিগুলি রক্ষা পায় আর উঠা নামা ও বাঁকা-সোজা করা সহজ হয়। তাছাড়া, সেগুলির রহিয়াছে আরো বহু উপকারিতা।

মানুষের জীবনের তাকিদে এবং নানা প্রয়োজনে তার দেহের মুখাপেক্ষী। তার দেহকে নানাভাবে সঞ্চালিত করিতে হয়। আল্লাহ্ তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করিয়া অস্থিগুলি পৃথক পৃথক বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন আবশ্যক মত অনায়াসে শরীর নড়া চড়া করা যায়। এসব অস্থিগুলি খণ্ড খণ্ড না হইয়া যদি সারা দেহে অখণ্ড একখানা অস্থি হইত তবে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা কিংবা বাঁকা হওয়া বা সোজা হওয়া বা সোজা হওয়া হইত অসম্ভব। অস্থিগুলি পরস্পর সংযুক্ত করার জন্য শিরা ও উপশিরা মাংশের ছাউনী দেওয়া হইয়াছে। অস্থিগুলি পরস্পর জোরইযা রাখার ন্য উভটির প্রান্তদেশ মেলান ও যুক্ত করা হইয়াছে যাতে একটির সাথে উত্তমরূপে জুড়িয়া থাকিতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহ্ এই অস্থিগুলিকে এমন নৈপুণ্য ও কৌশলে সংযোজিত ও সংগঠিত করিয়াছেন যে, মানুষ দরকার মাত্রই তার দেহকে যেমন ইচ্ছা সঞ্চালিত করিয়া নিজ কাজ সামাধা করিতে পারে।

মানবদেহের প্রধান অঙ্গ মস্তক। এ মস্তক সর্বমোট ১৫৫ খানা হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। অস্থিগুলি পরস্পর বিভিন্ন আকৃতির। আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে এগুলি এমনভাবে জুড়িয়া দিয়াছেন, যাতে গোটা মস্তকটি তৈরী হইয়াছে। মাথা খুপড়ির অংশে ছয়খানী হাড় রহিয়াছে। উপরের অংশে ১২৪ খানা আর দু'খানা নীচের জোড়ায়; বাকী দাঁতগুলি রহিয়াছে যদ্বারা খাদ্য-দ্রব্য পেষণ করা হয়।

ঘাড়কে আল্লাহ্ মস্তকের দণ্ড হিসাবে তৈরী করিয়াছেন। যা সাতখানা গোল ফাঁপা হাড় দ্বারা সৃষ্টি। সেগুলি একটির উপর অপরটি রক্ষিত। এতে যে হেকমত আর কারিগরী আছে তা বর্ণনা করিতে গেলে অনেক দীর্ঘ হইবে। ঘাড়ের নিম্ন প্রান্ত পিঠের মেরুদণ্ডের উপর সংস্থাপিত। সেগুলি হচ্ছে ৩৪ খানি হাড়। যেগুলি একের পর এক কোমর পর্যন্ত প্রলম্বিত। কোমরে তিনখানা অস্থি রহিয়াছে। পিঠের অস্থি নীচের দিকে লেজ বিশিষ্ট হাড়ের সাথে যুক্ত। সেখানেও তিনটি অস্থি খণ্ডে গঠিত। পৃষ্ঠদেশের

হাড়গুলি পাঁজর, বক্ষ, কাঁধ, হাত পা ও নিতম্বের সাথে অতি নিপুণতার সাথে সংযোজিত। মানব দেহে মোট ২৪৮ খানা অস্থি আছে। অবশ্য ফাঁকা স্থান পূর্ণ করার জন্য যে ক্ষুদ্রাকৃতির হাড়গুলি রহিয়াছে তা এ হিসাব হইতে স্বতন্ত্র।

আল্লাহ্‌র কি অপার কুদরত যিনি বীর্যের ন্যায় অপবিত্র পদার্থের দ্বারা এসব সৃষ্টি করিয়াছেন। এতে আছে আল্লাহ্‌র অপার মহিমা আর অসীম কুদরতের নিদর্শন। 'আল্লাহ্ যে নৈপুণ্য আর কৌশল দ্বারা মানব দেহ গঠন করিয়াছেন, তাতে কোন হ্রাস বৃদ্ধির অবকাশ নাই। যদি তা হইত তবে তা হইত মানুষের পক্ষে কঠিন সমস্যা।' চিন্তাশীলদের জন্য এতে আছে মহাশক্তি ও আল্লাহর নিদর্শন।

দেহের অভ্যন্তর ভাগের গঠন নৈপুণ্য আর শৃংখলার প্রতি মনোনিবেশ করিলে দেখা যাইবে, দেহের অস্থিগুলি যাতে প্রয়োজনের সময় নড়া-চড়া ও উঠা-নামা করিতে পারে, বাঁকা সোজা হইতে পারে আর এজন্য কতগুলি জিনিষ সৃষ্টি করা আছে, এগুলির সংখ্যা মোট ৫২৯। এগুলি মাংসপেশী ও ঝিল্লী দ্বারা গঠিত। এগুলির কোনটা ছোট, কোনটা চওড়া আবার প্রয়োজনানুযায়ী কোনটা সরু। এর সবটি চোখের পলক সঞ্চালন বিভিন্ন কাজে লাগে। যদি এর একটিও কম হইত তবে চোখের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হইত এবং দৃষ্টি শক্তি অকেজো হইয়া পড়িত।

এমনি প্রত্যেক অঙ্গের জন্য বিভিন্ন অংশ রহিয়াছে। প্রয়োজন মত কোনটি ছোট আর কোনটি বড়। তারপর শিরা, উপশিরা, পেশী, ঝিল্লী, প্রভৃতির সৃষ্টি, সেগুলির স্থান এবং তার ব্যাখ্যা আরো অধিক বিস্ময়কর। সেগুলির প্রকৃতির গুণাগুণ এবং কার্যকারিতা যা রহিয়াছে তা আমাদের জ্ঞানের অতীত।

সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ঃ এবার দেখা যাক মানব সৃষ্টির কৌশল আর অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টির কৌশল বৈশিষ্ট্য কোথায়? আল্লাহ্ মানুষের কঙ্কাল সোজা ও সরল গঠনের সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন বসার সময়ও তার উত্তম গঠন ও আকৃতি বহাল থাকে। এ অবস্থায় সে দু'হাতে অনায়াসে কাজ করিতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় উপুড়মুখী করিয়া আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেন

নাই। যদি অন্যান্য প্রাণী ন্যায় উপুড়মুখী করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তবে তার পক্ষে অনেক কাজই করা সম্ভব হইত না।

মানব সৃষ্টির ভিতর বাহিরের প্রতি সার্বিকভাবে নজর করিয়া দেখা যাক। আল্লাহ্‌র কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন রহিয়াছে তার গঠন নৈপুণ্যের মধ্যে। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেমন নিখুঁত আর স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আহারে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি শক্তি সঞ্চয় করে; আল্লাহ্ মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এক নির্দিষ্ট আকারে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। খাদ্যের প্রাচুর্য ও আধিক্যের কারণে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অস্বাভাবিক-ভাবে লম্বা, স্থূল আর ভারী হইত তবে চলা-ফেরা এবং কাজকর্ম করা তার পক্ষে সম্ভব হইত না। এটা আল্লাহ্‌র অসীম দয়া আর অপার করুণা যে, তিনি মানুষের প্রত্যেকটি জিনিষকে পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছেন। অন্যথা, তার জন্য ঘর বাড়ি পোষাক পরিচ্ছেদ আর পানাহার সর্বক্ষেত্রেই সৃষ্টি হইত অচলাবস্থার। মানব-দেহের প্রতি লক্ষ্য করিলে আর তার গঠন নৈপুণ্যের কথা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, মানব দেহে আল্লাহ্‌র কুদরতের কত কারিগরী লুক্কায়িত রহিয়াছে।

কুদরতের সাক্ষ্য ঃ পৃথিবীর সকল মানব দানব একত্রিত হইয়াও এবং তাদের যাবতীয় শক্তি ও বল ব্যয় করিয়া হইলেও, তাদের দ্বারা আদৌ সম্ভব হইবে না-বীর্য দ্বারা জীবন, শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি সৃষ্টি করার। আর দান করিয়াছেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির পরিমিত রূপ। দেহের বাহির ভিতরের পুষ্টি সাধন ও বর্ধনের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা এবং তা সু-কৌশলে উদরে প্রবেশের জন্য রাস্তা সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন দেহের অভ্যন্তরে কিভাবে হৃদপিণ্ড, কলিজা, প্লীহা, জরায়ু, মুত্রাশয় আঁত প্রভৃতি। এগুলি আবার নির্দিষ্ট আকার ও অবরবে যথাস্থানে সংরক্ষিত করিয়াছেন। সেগুলির প্রত্যেকটি নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। ফলে দেহ শক্তি লাভ করতঃ টিকিয়া থাকে।

খাদ্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলীকে উত্তম উপাদানে তৈরী করা হইয়াছে, পাকস্থলীতে খাদ্য-দ্রব্য সহজে পরিপাক হওয়ার জন্য তাকে দন্তের সাহায্যে মিহিন করিয়া উদরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাতে পরিপাক করিতে পাকস্থলীর উপর খুব বেশী চাপ না পড়ে। খাদ্যের

সারাংশ দ্বারা রক্ত উৎপাদনের জন্য কলিজা কাজ করিয়া থাকে আর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছায়। প্লীহা আর গুর্দা কলিজার কাজের সহায়ক। প্লীহার কাজ হইল রক্তে খাবার অংশ সংগ্রহ করা আর পীতকে রক্ত হইতে পৃথক করিয়া ফেলা। গুর্দা খাদ্যের জলীয় অংশ সংগ্রহ করে এবং প্রস্রাবের রাস্তা দ্বারা বাহির করিয়া দেয়। কলিজা সারা দেহে রক্ত পৌঁছাইয়া দিতে সাহায্য করে। রক্তের সারাংশ যা মাংসের সারবস্তু হইতে সূক্ষ্ম আর নির্মলতা হৃৎপিণ্ডে সঞ্চিত থাকে, ঠিক যেন একটি পাত্রের ন্যায়, যাতে রক্তের সারাংশ সঞ্চিত থাকে আর প্রয়োজন মত দেহের বিভিন্ন অংশে তা বেষ্টিত হয়। এসবই আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের লীলা-খেলা যা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

গর্ভাশয় সৃষ্টি, তার মধ্যে সন্তান সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, প্রয়োজন মত সেখানে তার খাদ্য পৌঁছানো সবই আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের নিদর্শন। তারপর সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণে ভালবাসা সৃষ্টি; যার কারণে সে সন্তান বুকে নিয়ে প্রতিপালন করে। আর এই ভালবাসার কারণেই মা সন্তানের প্রতি সহস্র প্রাণ কোরবান করিতে এবং কষ্ট স্বীকার করিতে রাজী। যদি আল্লাহ্ মায়ের প্রাণে সন্তানের জন্য এহেন মমতা সৃষ্টি না করিতেন, তবে মা এত কষ্ট স্বীকার করিতেন না বরং কষ্টের কারণে মার সন্তানের প্রতি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হইত। সন্তান যখন বড় হয়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবল ও শক্তিমান হয়, তখন আল্লাহ্ তার মুখে দাঁত গজাইয়া দেন। তখন সে দুধ ছেড়ে অন্য খাদ্য খেতে শুরু করে। কেননা, দাঁত অন্য খাদ্য গ্রহণে তাকে সাহায্য করিয়া থাকে। এভাবে সন্তানের মধ্যে ধীরে ধীরে বুদ্ধি ও চেতনা জাগ্রত হয়। এভাবে ক্রমাগত তার জ্ঞান-বুদ্ধির পূর্ণতা লাভ করে।

স্পষ্টতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, মানুষ যখন পয়দা হয় তখন সে থাকে একেবারেই অবোধ ও অজ্ঞ। না থকে তার জ্ঞান, না হুশ, না ভালমন্দ বিবেচনার শক্তি। যদি জন্মের সাথে সাথে তার জ্ঞান হইত তবে দুনিয়ার এসব নূতন নূতন জিনিস দেখিয়া সে তাজ্জব হইয়া যাইত। তারপর সে তার নিজের প্রতি লক্ষ্য করিতঃ কিভাবে তাকে নেকড়ায় করিয়া কোলে তোলা হয়, কিভাবে দোলনা রাখিয়া প্রতিপালন করা হয়। অবশ্য তার দেহ কোমল আর নাজুক হওয়ার কারণে এসব তার জন্য

প্রয়োজন। কিন্তু সাথে সাথে যদি শিশুর জ্ঞানোদয় হইত তবে সে বহু বিষয়েই বিরোধ করিত, অবাধ্য হইত এবং করিত কলহ। ফলে তার প্রতি মায়ের স্নেহ-মমতা হ্রাস পাইত। এমনকি, তাকে যথারীতি প্রতিপালন করাই হইত দুঃসাধ্য।

সুতরাং আল্লাহ্‌র হেকমতের বিধান এই যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। আর ক্রমান্বয়ে সে দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে আর হয় সচেতন। শিক্ষা করে প্রত্যেকটি জিনিসের আবশ্যকতা ও ব্যবহার। ধীরে ধীরে তার মধ্যে যৌন চেতনার উন্মেষ ঘটে, যা বংশ বৃদ্ধির কারণ। বালকের মুখমণ্ডলে কেশ গজায় যাতে পুরুষ আর নারীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়- বিকশিত হয় তার অঙ্গে যৌবনের রূপ-লাবণ্য! পরিশেষে বার্ধক্যে পৌঁছিলে চেহারার রূপ-লাবণ্য হইয়া যায় বিলীন।

বালিকার চেহারাকে আল্লাহ্ করিয়াছেন কেশমুক্ত। যাতে তার মুখমণ্ডলে যৌবনের কান্তি বিকাশ পেতে পারে আর পুরুষের জন্য তা হয় আকর্ষণীয়। এর ভিতরই নিহিত ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার রহস্য।

সৃষ্টির এই শৃঙ্খলা আর কুদরতের মহিমা কি শুধুই বৃথা আর উদ্দেশ্যহীন? জ্ঞান কি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ যা তার অপার মহিমা আর কুশলতায় সৃষ্টি করিয়াছেন তা এমনিই নিরর্থক সৃষ্টি? তা আদৌ হইতে পারে না। অবশ্যই এর পশ্চাতে মহান উদ্দেশ্য নিহিত, যা তার সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

যখন মাতৃগর্ভে সন্তান স্থিত হয়, তখন যদি সে রক্তের সারাংশ খাদ্য হিসাবে না পাইত তবে সে কি গর্ভে শুকাইয়া মরিত না? যেমন পানির অভাবে তরু-লতা শুকাইয়া যায়।

গর্ভে সন্তান পূর্ণতা লাভের পর যদি প্রসূতি প্রসব বেদনায় অস্থির না হইত আর যথাসময়ে সন্তান না হইত ভূমিষ্ঠ, মা ও সন্তান উভয়েই তবে মৃত্যু মুখে পতিত হইত। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর যদি শিশু প্রয়োজনীয় খাদ্য দুধ ইত্যাদি না পায়, তবে শিশু কি ক্ষুধ-পিপাসায় মারা যাইবে না? যদি যথা সময়ে শিশুর দাঁত না গজায় আর শক্ত দ্রব্য গিলিয়া খাইতে শুরু করে, তবে তা হজম করিতে না পারিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িবে না? যদি ছেলের মুখে যথাসময়ে কেশ না গজায় তবে তা দেখিতে হইত

মেয়েন ন্যায় আর বালকের সদৃশ। দাড়ি না হইলে চেহারার সৌন্দর্য, সৌম্যতা আর গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠিত না। এসবই মহীয়ান আল্লাহ্র অশেষ দান আর অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

চিন্তা করার বিষয়, মানুষের যৌন চেতনা কিভাবে সৃষ্টি হয়? পুরুষাঙ্গ কিভাবে জরায়ুতে বীর্য নিক্ষেপ করে এবং সেই উত্তেজনা যাহা ধমনী হইতে বীর্য নিঃসরণ করার জন্য সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে ইহার বিপরীত বা স্ত্রী-যোনী এবং উহার কার্যকারিতা লক্ষ্য করিলে, এভাবে মানব দেহের প্রতিটি কাজের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, আল্লাহ্ মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ কি কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেগুলি কিভাবে যথারীতি কাজ করিয়া যাইতেছে এবং সে কাজের উদ্দেশ্য, তার গঠন ও আকৃতি দান করিয়াছেন। চক্ষু দেখার জন্য, হাতকে স্পর্শ করার ও ধারণ করার জন্য, পা চলাফেরার ও দৌড়ানোর জন্য, পাকস্থলী খাদ্য পরিপাক করার জন্য, কলিজা উদরের পরিপাক করা ও খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ ছাঁকার জন্য এবং প্রয়োজন মত তা বন্টন করার জন্য; মুখ আহার করার এবং কথা বলার জন্য। মোট কথা, দেহের প্রতিটি বিষয় চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা আল্লাহ্র অসীম কুদরতেরই লিলাখেলা।

চিন্তা করার বিষয়-ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌছার পর কিছাবে উহা পরিপাক হয়। খাদ্যের সারাংশ হৃৎপিণ্ডে পৌছাইয়া দেয়। উহা সূক্ষ্ম তন্ত্রীর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডে গিয়া উপস্থিত হয়। আবার স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে সূক্ষ্ম সৃষ্টি করা হইয়াছে যেন খাদ্যের নির্দোষ পদার্থ ব্যতীত কোন দুষিত পদার্থ হৃৎপিণ্ডে গিয়া না পৌছে যা দেহের ক্ষতিকর হইতে পারে। এই সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি প্রায় ঝিল্লির স্থলবর্তী। এগুলি পরিপাক খাদ্যদ্রব্য ছাঁকিয়া প্রয়োজনীয় ও বিশুদ্ধ অংশ হৃৎপিণ্ডে পৌছাইয়া দিতে পারে। হৃৎপিণ্ড একে রক্তে পরিণত করে। আল্লাহ্র হেকমতে খাদ্যদ্রব্য এভাবেই রক্তে পরিণত হয়।

এখান থেকে রক্ত সূক্ষ্মতন্ত্রীর সাহায্যে সর্বাঙ্গে সরবরাহ হয়। খাদ্যের সারাংশ এভাবে উৎপন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট যে নিকৃষ্ট পদার্থ থাকিয়া যায়, তা যে যে অঙ্গের সেগুলি সেখানে পৌছিয়া বাকী মল-মূত্ররূপে

যথাস্থানে সঞ্চিত হয়। হৃৎপিণ্ড যেন দেহের সেরা পাত্র, সেখানে দেহের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য সঞ্চিত হয় আর প্রয়োজনমত তা সর্বত্র সরবরাহ হইয়া থাকে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ঃ মানুষের দেহে এমন একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দেখা যায় না, যা অনাবশ্যক বা যার সৃষ্টি অর্থহীন।

চক্ষু ঃ আল্লাহ্ চক্ষু তৈরী করিয়াছেন দেখার জন্য আর প্রত্যেকটি জিনিস চেনার জন্য। রূপ-রং এর পার্থক্য, ছোট-বড়, উঁচু-নীচুর ব্যবধান চক্ষু না হইলে করা আদৌ সম্ভব হইত না। এই যে আলো, যদি চোখের দৃষ্টিশক্তি না থাকিত তবে কি কাজে আসিত এ আলো? আলো থাকিলেই তবে চোখের কাজ। কারণ আলোর সাহায্যে চোখ দেখিতে পায়। বিভিন্ন রং-এর সমাহারে চোখ বিভিন্ন রং এর পার্থক্য অনুভব করিতে পারে।

কান ঃ কান আল্লাহ্ এজন্য পয়দা করিয়াছেন যে, তার সাহায্যে শব্দ শুনা যায়। যদি শব্দ হইত আর কান তা শ্রবণ করিতে না পারিত বা কানই আদৌ না হইত তবে শব্দের উপকারিতা কি ছিল?

এমনি প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা। ইন্দ্রিয় আর অনুভূতির মধ্যে এমন সম্পর্ক যে, ইন্দ্রিয় ব্যতীত অনুভূতি অর্থহীন। আলো আর বায়ুরও ঠিক সেই একই অবস্থা। যদি আলো না থাকিত তবে দর্শনেন্দ্রিয় অকেজো হইয়া পড়িত, বায়ু না থাকিলে কানে শব্দই পৌছিত না।

অন্ধ আর বধিরের অসুবিধা চিন্তা করা যাইতে পারে। আল্লাহর এ দু'টো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাদেরকে কি সব মুছীবতে ভুগিতে হয়। অন্ধ যখন পা পা করিয়া চলিতে থাকে, তখন সে জানে না কোথায় তার পা পড়িবে! সে বিপজ্জনক গর্তেই পা ফেলিতেছে, না কোন অনিষ্টকর প্রাণীর উপর। কিংবা তার সম্মুখে কি রহিয়াছে সে তার কিছুই জানে না। সম্মুখ থেকে যদি কোন মহা আপদ-বিপদও আসিতে থাকে, তাও তার দেখার উপায় নাই। মাখলুকের বহু দান-অবদান থেকে হইত সে বঞ্চিত। এই রূপ-রং-এর দুনিয়াও তার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। কালো, সাদা, লাল, হলুদ তার কাছে সবই সমান।

বধির বা শ্রবণ শক্তি হইতে বঞ্চিত বেচারা তো কথার মাধূর্যই অনুভব করিতে পারে না। শব্দে যে একটা মাধুর্য আর আকর্ষণ রহিয়াছে তা সে

উপভোগ করিতে অক্ষম। হৃদয়গ্রাহী শব্দ অথবা কর্কশ ও অপ্রিয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য করার সাধ্যও তার থাকে না। কানে শব্দ প্রবেশ করিলেও তার তারতম্য কল্পনা করিতে পারে না। কোন লোক সভায় বসা থাক বা কেহ তাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলুক সবই সমান। সে মজলিসে উপস্থিত থাকিয়াও যেন অনুপস্থিত, জীবিত থাকিয়াও সে মৃততুল্য।

আবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত–অর্থাৎ উন্মাদ, পাগল তার অবস্থা তো পশু থেকেও অধম। পশু তো ভালমন্দ কতকটা পার্থক্য করিতে পারে, কিন্তু পাগল তাও পারে না, কেননা সে জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণই বঞ্চিত।

সামগ্রিক অঙ্গ–দর্শন ঃ আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গগুলির প্রতি সামগ্রিকভাবে নজর করিলে দেখা যাইবে– মানুষের শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, স্বাদগ্রহণ প্রভৃতি শক্তিগুলির যাদের সাহায্যে সে জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মিটায়, যদি এসব শক্তির একটিরও অভাব হইত, তবে তার কাজ–কর্মে হইত দারুণ বাধা বরং তা হইত তার জন্য একটা বিরাট দুর্ঘটনা।

আল্লাহ্ যাকে তার কোন একটি অঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, সে অবশ্যই নিদারুণ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত। এসব নেয়ামতের কি মূল্য তা সে এ অভাবের কারণে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। অতঃপর তার ধৈর্য অবলম্বন করা ব্যতীত আর করার কি থাকে? এসব কারণে তার জীবনের যে সব বিপদ আর মুছীবত দেখা দিবে তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করিতে হইবে যাতে সে আখেরাতে তার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদান হাসিল করিতে পারে।

আল্লাহ্ সর্বাবস্থায় তাঁর বান্দার প্রতি দয়ালু। দান করার ক্ষেত্রে বান্দার কৃতজ্ঞতার জন্য আর বঞ্চিত করার বেলায় সবুরের জন্য আল্লাহ্ পুরস্কৃত করিবেন। মানবাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে অসুবিধা হইবেনা– কোন অঙ্গ একটি মাত্র আর কোন অঙ্গ দু'টি। সে গুলির কার্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে–কিভাবে সেগুলি নিজ নিজ কাজ ও দায়িত্ব পালন করিতেছে। মস্তক ঃ তা মাত্র একটি। কিন্তু কত কাজ আর দায়িত্ব তার প্রতি ন্যস্ত। এগুলি ছাড়া যদি মস্তকের উপর অতিরিক্ত কোন চাপ

পড়ে, তবে তার প্রতি তা খুবই ভারি হইয়া পড়ে। মাথা যদি একটির পরিবর্তে দুটি হইত, তবে একটি কথা বলার সময় অপরটি নিষ্ক্রীয় থাকিত। যদি উভয়ে মিলে একটি কথা বলিত তবুও একটি বেকার থাকিত। আর যদি এক মস্তক এক কথা, অন্যটি অন্য কথা বলিত তবে বিষম সমস্যা উদ্ভব হইত। কোনটি আসল কথা, কোনটি নকল, তা বুঝা হইত দুঃসাধ্য।

হাত কিন্তু অন্যরূপ। আল্লাহ্ দিয়াছেন মানুষকে দু'খানা হাত। হাত যদি একখানি মাত্র হইত তবে কাজ করিতে ভারি অসুবিধা দেখা দিত। বস্তুত হাত দু'খানা হওয়াই অপরিহার্য। যার এক হাত পঙ্গু বা বেকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝা যায় তার কাজ করিতে কি অসুবিধা। এক হাতওয়ালা কোন অবস্থায়ই দু'হাত ওয়ালার মত কাজ করিতে পারে না। অসুবিধার কথা তো বাদই।

এমনি দু'পা হওয়ারও যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। তা না হইলে মানুষের চলতশক্তি হইত রহিত।

শব্দ সৃষ্টির অঙ্গটির গঠন নৈপুর্ণ্যের প্রতি দেখা যাক। জিহ্বা, ওষ্ঠদ্বয় ও দাঁত–বর্ণ এবং শব্দকে বর্ণে ও কথায় পরিণত করার কাজে সাহায্য করিয়া থাকে। মুখে যদি এগুলো না থাকিত তবে শব্দ অর্থহীন–অকেজো হইয়া যাবার দরুণ কথা বলার কেমন অসুবিধা আর বিপর্যয় সৃষ্টি হইত? শ্বাসনালী শব্দ বাহির করা ছাড়াও বায়ু ফুসফুস পর্যন্ত লইয়া যায়। তাতে হৃৎপিণ্ডেরও আরাম হয়। যদি এই নালীর ব্যবস্থা না থাকিত কিংবা কিছু সময় তা বন্ধ করিয়া রাখা হইত তবে হৃৎপিণ্ড অস্থির হইয়া পড়িত।

জিহ্বা দ্বারা খাদ্য গ্রহণে সাহায্য হয়। দাঁত দ্বারা খাদ্য চর্বন ও পেষণে সাহায্য হয়। ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা খাওয়া আর পান করার সহায়তা হইয়া থাকে। আর মুখের জন্য ওষ্ঠ দু'টি কবাটের কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে।

এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মানুষের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গগুলি অসংখ্য কাজের। যদি এতে কিছু মাত্র কমবেশী হইত, তবে তার কাজে বিঘ্ন হইত আর অসম্ভব হইয়া পড়িত অনেক কাজ। সুতরাং আল্লাহ্ প্রতিটি অঙ্গ চূড়ান্ত নৈপুণ্য আর জ্ঞানের ভিত্তিতে পয়দা করিয়াছেন।

মগজ ঃ মগজের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে– তা যদি খুলিয়া ফেলা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, উহা পরস্পর নিবিড় ভাবে সন্নিহিত।

যাতে হঠাৎ কোন আঘাত পাইলে তা থেকে রক্ষা পায়। এর উপরে আছে খুপড়ির ঢাকনা, তা আবার কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত যাতে পাইতেছে মস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি। আর শীত গ্রীষ্ম থেকেও বাঁচিয়া থাকা যায়। আল্লাহ্ কোমল নাজুক মগজের হেফাজতের জন্য কি-ইনা ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর যা সকল অনুভূতির মূল। মস্তিক ছাড়া সকল অনুভূতিই অকেজো।

হৃৎপিণ্ড ঃ হৃৎপিণ্ড বুকের বদ্ধ খাঁচায় কিভাবে সংরক্ষিত। তার রহিয়াছে উপরে ঝিল্লির্র পর্দা, আর তার চুতর্দিক গোশত আর শিরা উপশিরা দ্বারা সংরক্ষিত করা হইয়াছে। দেহের মধ্যে এটিই সর্বপ্রধান অংশ। এটি দেহ রাজ্যের বাদশাহ। একই কারণে একে এমনি সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন।

হলক অর্থাৎ-গলনালী। তাতে দুটি রাস্তা আছে। একটি শব্দ বাহির হইবার, যাকে শ্বাসনালী বলে। এটি ফুসফুস পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি খাদ্য-নালী, এটি পাকস্থলী পর্যন্ত প্রলম্বিত। গলায় একটি পর্দা আছে, যাতে খাদ্য ফুসফুসে প্রবেশ করিতে না পারে। ফুসফুস পাখার ন্যায় তৈরী যা হৃৎ-পিণ্ডকে বায়ু দ্বারা সজীব রাখে আর উত্তাপ ও বদ্ধতার জন্য তার কাজে প্রতিবন্ধক না হয়। আর বায়ুর অভাবে হৃৎপিণ্ড বিষক্রীয় হইয়া মানুষের জীবন নাশের কারণ না হয়। এ কারণে ফুসফুসের ভিতরে ফাঁফা স্থান বায়ুপূর্ণ থাকে যাতে হৃৎপিণ্ড সর্বদা বায়ু লাভ করিতে সমর্থ হয়।

পেশাব পায়খানার রাস্তা ঃ আল্লাহ্ এ দু'টিকে কি কৌশলে আর নিপুর্ণতার সাথে তৈরী করিয়াছেন। তা কেবল প্রয়োজনের সময় কাজ করে অর্থাৎ প্রস্রাব পায়াখানার বেগ হইলে তখনই তার কাজ, অন্য সময় তা হইতে কিছু বাহির হয় না। সর্বাবস্থায় তা থেকে মলমূত্র নির্গত হইতে থাকিলে জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিত আর মানুষ কখনও পাক পবিত্র থাকিতে পারিত না।

রানদ্বয় ও নিতম্ব ঃ আল্লাহ্ মানুষের রানদ্বয় ও নিতম্বদেশ কি সুন্দর তৈরী করিয়াছেন। এতে স্থূল সুপুষ্ট মাংসপেশী রহিয়াছে যাতে বসার বেলায় লোকে অসুবিধা না হয়। স্বল্প মাংশ, ক্ষীণ ও শীর্ণ মানুষের বসার কত কষ্ট। এ কারণেই এ দু'টি নরম গদীর ন্যায়, কোন প্রকার কষ্ট না হয়। মাংসবিহীন শীর্ণ ও ক্ষীণ মানুষের বসায় কষ্ট হয়। তাই এ'দুটি নরম গদীর ন্যায়।

মানব-লিঙ্গ ঃ লজ্জার কথা নহে, এটাও আল্লাহ্ বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী করিয়াছেন। যদি তা সর্বক্ষণ শিথিল আর ঠিলা থাকিত তবে মানুষের পক্ষে গর্ভাশয়ে বীর্য ক্ষেপণ করা আদৌ সম্ভব হইত না। আর যদি সর্বাবস্থায় তা উত্তেজিত থাকিত তবে তা হইত অসুবিধাজনক। এজন্য আল্লাহ্ তাকে এভাবে তৈরী করিয়াছেন যে, যথাসময়ে তা দৃঢ় ও উত্তেজিত হয়, অন্য সময় নিঃসাড় শিথিল থাকে।

কেশ আর নখ ঃ যদিও সেগুলি বর্জনশীল। সেগুলি কাটিয়া ফেলার মধ্যেও আছে যুক্তি আর কল্যান। আল্লাহ্ নখ আর কেশ অনুভূতিহীন করিয়াছেন, যাতে তা কর্তন করার সময় কষ্ট না হয়। তাতে অনুভূতি থাকিলে হয়তো বেদনা বা কষ্টের ভয়ে তা কাটা হইত না। ফলে, তা অনেক বড় হইয়া দেখিতে বন্য জন্তুর ন্যায় হইত। কেশ গজানো লক্ষণীয়। যদি চোখের ভিতরেও কেশ গজাইত তাতে মানুষ হইয়া যাইত অন্ধ। কেননা, চোখের ন্যায় নাজুক আর সূক্ষ্ম অঙ্গ সহ্য করিতে পারিত না। অনুরূপ, মুখের ভিতরে হইলে পানাহারে হইত নিদারুণ অসুবিধা আর স্বাদ যাইত বরবাদ হইয়া। এমনি যদি হাতের তালুতে লোম হইত তবে স্পর্শ করা, ধরা প্রভৃতির আরাম হইতে মানুষ হইত বঞ্চিত। এতে বিঘ্ন হইত অনেক কাজে। এমনি যদি নারীর যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে লোম হইলে স্ত্রী সম্ভোগ-সুখ হইতে নর হইত বঞ্চিত।

মানব-বৈশিষ্ট্য ঃ আলোচ্য বিষয়-বস্তুর প্রতি আল্লাহর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি প্রত্যেকটি জিনিষ যথাস্থানে তৈরী করিয়া মানু-ষের শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা জিনিষ এমনভাবে সৃষ্টি করেন নাই, যাতে মানুষের অশান্তির আর কাজে বিঘ্ন হইতে পারে। আল্লাহ মানবদেহে পানাহার, নিদ্রা আর সহবাসের প্রয়োজনীয়তা এবং সেগুলির চাহিদা আর অনুভূতি দিয়াছেন। আহার পানিয়ের চাহিদায় সময় তৃষ্ণা পায়। পানাহার মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক।

নিদ্রাও মানুষের জন্য প্রাকৃতিক দাবী। নিদ্রা ব্যতীত মানুষের দেহমনে শান্তি হয়না এবং শরীরে নূতন শক্তি ও কার্যোৎসাহ পয়দা হয়না। দিবা রাত্রির মধ্যে কিছুক্ষণ নিদ্রা ভোগ করার পর তার দেহমনে আরাম, স্বস্তি আর নূতন কর্মশক্তি প্রত্যাবর্তন করে।

সহবাসের জন্য আসক্তি ও কামোদ্দীপনা আমন্ত্রণ আর আহ্বান স্বরূপ। বংশধারা রক্ষার জন্য যা অপরিহার্য। যদি কামাশক্তির উদ্রেক না হইত তবে মানুষ থাকিত অন্য কাজে লিপ্ত আর বংশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কষ্টে তার মন এতই নিমগ্ন থাকিত যে, জীবনের প্রতিই সে বিমুখ হইয়া পড়িত। জালেমের অত্যাচার, হিংসুকের হিংসা ও দুর্ব্যবহার প্রভৃতি সর্বদা তার হৃদয়ে জাগরিত থাকিয়া জীবনকে করিয়া রাখত দুর্বিসহ। তাই আল্লাহর স্মৃতি আর বিস্মৃতি দুইটি পরস্পর বিরোধী গুণ মানুষের মধ্যে দান করিয়াছেন। এ দু'টির মধ্যে রহিয়াছে অশেষ কল্যাণ আর রহস্য।

মানব–বৈশিষ্ট্য ঃ মহান আল্লাহ্ মানব চরিত্রে এমন কতগুলি গুণ দান করিয়াছেন যে গুলির সমারোহ নাই অন্য প্রাণীর মধ্যে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হইল লজ্জা বা শরম। সে লজ্জা আর শরম আল্লাহ একমাত্র মানুষকেই দান করিয়াছেন। যদি মানুষের মধ্যে লজ্জা ও কুণ্ঠা না থাকিত তবে সে গুনাহর কাজ থেকে কখনও বিরত হইত না। কর্তব্য কাজ করিত না, অতিথি মেহমানের কদর করিত না, ভাল কাজে আগ্রহী হইত না, থাকিত না মন্দ কাজ থেকে দূরে। কেননা, অনেক কাজই লোক শরমের ভয়ে করিয়া থাকে। আমানত আদায় করিয়া দেয়, পিতামাতার সেবা করে, লজ্জাজনক কাজ থেকে ফিরিয়া থাকে। এসব কাজ বহু সময় লোক লজ্জার খাতিরে করে।

মানব চরিত্রের অন্যান্য দিকও এভাবে ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। বাকশক্তি সম্পর্কে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে–বাকশক্তির কারণে মানুষ সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাকশক্তির সাহায্যে সে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় আর তা অন্যকে বুঝাইতে পারে। এমনি অন্যের মনের কথাও বুঝিতে পারে। যদি আল্লাহ মানুষকে এসব গুণ না দিতেন তবে পরস্পর ভাবের আদান–প্রদান কিছুতেই সম্ভব হইত না।

এমনি লিখন শক্তির বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, লিখন শক্তির সাহায্যে আজ আমরা হাজার হাজার বৎসর পূর্বের ইতিহাস ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের কথা জানিতে পারি। আবার সহস্র সহস্র বৎসর পরে লোক আমাদের কথা জানিতে পারিবে এই লেখার সাহায্যে। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্র সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ভুলিয়া যাওয়া জ্ঞান আমরা পুস্তকের সাহায্যে শিখিয়া নেই, পুনঃ ইয়াদ করি। যদি আল্লাহ

আমাদের লেখার কৌশল শিক্ষা না দিতেন তবে আমরা পূর্ববর্তীদের জ্ঞান বিদ্যা কিছুই হাছিল করিতে পারিতাম না, আর যা কিছু জ্ঞান–বিজ্ঞান সব ধ্বংস হইয়া যাইত। এমনকি, মূর্খ–বর্বর জীবনই আমাদের যাপন করিতে হইত। ফলে সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হইত বিরাট সঙ্কট।

ক্রোধ ঃ আল্লাহ মানুষকে ক্রোধ দান করিয়াছেন। যদ্বারা সে শত্রু, আর অনিষ্টকর দ্রব্য থেকে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্রীয় হয়। আর হিংসা বৃত্তির দ্বারা নিজ স্বার্থ অর্জন করে। তবে এই ক্রোধ আর হিংসাবৃত্তিকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যবহার করার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ রহিয়াছে। কারণ ক্রোধের ন্যায় স্বভাব যদি সীমা অতিক্রম করে তবে হইবে নিশ্চিতভাবে শয়তানী স্বভাব। ফলে সে আল্লাহ থেকে হইয়া পড়িবে দূরে। ক্রোধের বশবর্তী হইয়া যখন সে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করিতে অগ্রসর হইবে তখন তাকে খুব সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হইবে। তবে, হিংসাবৃত্তিকে দমন করিয়া ঈর্ষা করিতে পারে। কেননা হিংসায় হইল অন্যের ক্ষতি সাধন আর নিজের স্বার্থ কামনা। আর ঈর্ষার বেলায় অন্যের ক্ষতির কামনা হয় না বরং তার সমকক্ষতা বা তদপেক্ষা ভাল হওয়ার প্রেরণার অনুভব করে।

কামনা–বাসনা ঃ আল্লাহ মানুষের মধ্যে কামনা–বাসনা দান করিয়াছেন। যার ফলে সংসার আবাদ রহিয়াছে আর বংশধারা বৃদ্ধি পাইতেছে। এরই কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গরীব লোকেরা শক্তিমান আর সম্পদশালী লোক থেকে স্বার্থ লাভ করিয়া থাকে। শক্তিমান লোক দুনিয়াকে আবাদ করিয়াছে শহর–নগরী, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে আর এসব কাজে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা পরোক্ষভাবে অসংখ্য স্বার্থ হাছিল করিয়াছে।

মানবকে প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল করিয়া পয়দা করা হইয়াছে। যদি পূর্ব পুরুষ কর্তৃক নির্মিত বাড়ি–ঘর, দালান–কোঠা ও শিল্প দ্রব্যাদি না দেখিত তবে তাদের ঘর–বাড়ি তৈরী করা হইত না বা তাদের কাছে এমন কোন কিছুই ছিল না যা দ্বারা তাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিত। সুতরাং তাদের আশা আকাংখা হইতেছে তাদের কর্মেরই পটভূমি। এসব দেখিয়া শুনিয়া তাদের কর্মের উৎসাহ উদ্দীপনা জন্ম নেয়। আবার পরবর্তী লোক তাদের বংশধরদের জন্য এসব রাখিয়া যাইবে যার দ্বারা তারা

জীবনের অসংখ্য উপকার লাভ করিবে। আবহমান কাল ধরিয়া এই ধারা অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে। এসব মানুষের ভিতরে জন্মগত আশারই সুফল।

জীবন-মৃত্যু ঃ জীবন মৃত্যু বা আয়ু ও মৃত্যুর ন্যায় কতগুলি বিষয় আল্লাহ মানুষের অগোচর ও অজ্ঞাত রাখিয়াছেন। যেমন তার আয়ু আর মৃত্যুর সংবাদ। যদি মানুষ তার আয়ুর খবর জানিত আর তা হইত সংক্ষিপ্ত তবে তার জীবনের স্বাদ ও আশা বিস্বাদে ভরিয়া যাইত আর দুনিয়ার কোন কাজ কর্মেই তার মন উঠিত ন। এমনকি বংশ রক্ষা অথবা ঘর-দোর নির্মাণের ব্যাপারে তার মোটেই কোন আগ্রাহ উৎসাহ থাকিত না। অপর দিকে যদি তার আয়ু কাল খুব দীর্ঘ হইত আর সে তা জানিত, তবে সে হইয়া পড়িত প্রবৃত্তের দাস। আর খোদার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিত, লিপ্ত হইয়া পড়িত নানা দুষ্কর্মে। কেননা মনে করিত তার মৃত্যুতো অনেক দূরে। ফলে সে ভুলিয়া যাইত তার মৃত্যুর কথা সুতরাং আল্লাহ এই বিষয়টি মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখিয়াছেন, যাতে সবর্দা তার মনে মৃত্যুর আশংকা লাগিয়া থাকে। আর কুপথে অগ্রসর হইলে যাতে খোদার ভয় অন্তরে জাগরিত হয় আর মৃত্যুর পূর্বে সৎকাজ করার সুন্দর ধারণা তার পয়দা হয়।

শেষ কথা ঃ আল্লাহ্ মানব জাতিকে দান করিয়াছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আর মর্যাদা। অন্য কোন প্রাণীকে তা দেন নাই। সূরা বনী ইস্রাঈলের ৭০ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ঃ আর আমি আদম সন্তানকে দিয়াছি সম্মান আর দিয়াছি স্থলে ও জলে চলার যানবাহন আর পবিত্র খাদ্য। বিশেষতঃ বহু জিনিসের উপর তাদের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছি।

মানুষের এই সম্মান, বৈশিষ্ট্য আর মর্যাদার মূলে রহিয়াছে তার জ্ঞান। এই জ্ঞানের ফলেই সে আল্লাহর নৈকট্যের অধিকারী, এই জ্ঞানের সাহায্যে সে সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করিয়া স্রষ্টাকে চিনিতে পারে; সে নিজের অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া আল্লাহর পরিচয় ভাল করিতে পারে। আল্লাহ ফর্মান-

ঃ তোমার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। তুমি কি তা দেখ না?

সুতরাং লক্ষ্য করা প্রয়োজন, আল্লাহ মানুষের মধ্যে কি কি গুণাবলী তৈরী করিয়াছেন। পাত্রের মূল্য নির্ণিত হয় পাত্রের মধ্যস্থ জিনিস দ্বারা আর গৃহের মর্যাদা গৃহে অবস্থানকারীর দ্বারা হইয়া থাকে। আল্লাহ মানুষের কলবকে তার মারেফতের গৃহ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এতে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে পুরোপুরিভাবে।

আল্লাহ্ মানুষের প্রত্যাবর্তন আর গন্তব্য স্থান হিসাবে অন্য একটি গৃহ নির্দিষ্ট রাখিয়াছেন, যাকে বলে আখেরাত বা পরোকাল। যে গৃহের অবস্থা আর পরিচয় মানবের কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছেন। সে গৃহের খবরের জন্য আল্লাহ্ রিসালত সৃষ্টি করিয়াছেন। সে নূরের আলোকে মানু-ষের প্রতি আখেরাতের অবস্থা প্রকাশ পায়। এ কারণে আল্লাহ্ দুনিয়াতে নবী আর রসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁদের দুটি কাজ ঃ আল্লাহ্ অনুগত বান্দাদের জন্য বাশীর বা সুসংবাদ দানকারী, আর নাফরমান বান্দার জন্য নাজীর ভীতি প্রদর্শনকারী। ওহীর দ্বারা আল্লাহ নবীগণের সাহায্য করিয়াছেণ। ওহী ধারণ আর সংরক্ষণ ক্ষমতা আল্লাহ্ নবীগণকে দান করিয়াছেন।

নবীগণ পার্থিব ব্যাপারে জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা দিয়াছেন। আর আখেরাতের বিষয়ও যা কল্যাণকর আর জ্ঞান গবেষণা রহিয়াছে তাও তাঁরা অবহিত করিয়াছেন। এই খোদাতত্ব দর্শন যা নবী আর রসূলগণের সাহায্য অর্জিত হইয়াছে, তা জ্ঞানের আলোক দ্বারা কখনো অর্জিত হওয়া সম্ভব হইত না। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ এমন সব সুস্পষ্ট প্রমাণ আর প্রকাশ্য নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছেন যার প্রতি মানুষের ঈমান আনা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তার দান পূর্ণ করিয়াছেন। আর প্রমাণও চূড়ান্ত হইয়াছে। দ্বীন-দুনিয়ার উভয় রাস্তাই তাঁরা দেখাইয়া গিয়াছেন। মুক্তি আর সর্বনাশের উভয় রাস্তাই সুস্পষ্টভাবে মানুষের কাছে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

আল্লাহ্ মানুষকে কতই না সম্মান, মর্যাদা দান করিয়াছেন! মানব বংশাবলীকে করিয়াছেন সম্মানিত। তাদের বংশধারা থেকে মহান, কত সম্মানিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাদের কেউ লাভ করিয়াছেন নবুয়ত আর বেলায়েতের মর্যাদা আর কেউ লাভ করিয়াছেন নূরের প্রতিবিম্ব। সুতরাং যে ভাগ্যবান সে ঈমান আনিয়া আল্লাহর নেয়ামতের

প্রকাশক আর দান ও অবদানের অধিকারী হইয়াছে, আর দুর্ভাগা সে নবুয়ত ও বেলায়েতকে অস্বীকার করিয়া চির দুঃখ আর দুর্ভাগ্য খরিদ করিয়াছে। সে শুধু পার্থিব জীবনের জন্য আখেরাত বরবাদ করিয়া দিয়াছে- বিক্রি ও বরবাদ করিয়া দিয়াছে।

-০-

পাঁচ ঃ ফেরেশতাগণের সৃষ্টি রহস্য

রাসূলে পাকের (সাঃ) 'নূর মোবারক' সৃষ্টি হওয়ার পরে তদীয় নূর দ্বারা আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম হযরত ইসরাফীল, তৎপর মীকাঈল, জিব্রাঈল ও আজরাঈল এই নেতৃস্থানীয় প্রধান চারিজন ফেরেশতাকে পয়দা করেন। আল্লাহতা'লা নিখিল বিশ্বের যাবতীয় কাজ পরিচালনার ভার এই চারিজন ফেরেশতার উপরই অর্পণ করেন।

তম্মধ্যে হযরত জিব্রাঈলকে (আঃ) যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহর ঐশীবার্তা বা ওহী পৌছানোর ভার অর্পণ করেন।

হযরত মীকাঈল (আঃ) নিখিল বিশ্বে আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি বর্ষণের কাজ পরিচালনার জন্য ও খাদ্য-শস্যের সুবন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছেন।

হযরত আজরাঈলকে (আঃ) সকল প্রকার জীব-জন্তুর জীবনের উপর অধিকার দান করিয়াছেন। তিনি আল্লাহর হুকুমে সকলের রূহ বা জান কবজ করিয়া থাকেন।

হযরত ইসরাফীলকে (আঃ) আল্লাহ্ পাক সিংগার ফুৎকারে বিশ্ব জগৎ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন। তিনি সকল সময় সিংগা মুখে নিয়া খোদার আদেশ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছেন। যখন আল্লাহর আদেশ হইবে, তখনই তিনি সিংগার ফুৎকারে ত্রিভুবন লয় করিয়া দিবেন।

এই চারিজন ফেরেশতার মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহতা'আলা হযরত ইসরাফীলকে (আঃ) পয়দা করিয়াছেন।

এই মর্মে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত ইসরাফীল (আঃ) আল্লাহর সমীপে সপ্তম আসমান ও জমীনের শক্তি প্রার্থনা

করিয়াছিলেন। তাই খোদা তা'আলা তাঁহাকে সপ্তম আসমান জমীনের শক্তি দান করিয়াছেন। ইহা চাহিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই বরং দুনিয়ার যাবতীয় জীবের অর্থাৎ, মানব-দানব, জিন ফেরেশতা, আগুন-বাতাস ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুর সমপরিমাণ শক্তি ও ক্ষমতা-অর্থাৎ, শক্তি ও বাহাদুরীর সকল প্রভুত্ব চাহিয়াছিলেন। তাই আল্লাহতা'আলা তাঁহাকে যাবতীয় মাখলুকের উপর শক্তির প্রভুত্ব দান করিয়াছেন।

হযরত ইসরাফীলকে (আঃ) আল্লাহতা'লা যে অপূর্ব ও ভয়াবহ দেহাকৃতি দান করিয়াছেন, তাহা মানবজ্ঞানে উপলব্ধি করা কষ্টকর। তাঁহার দেহের গঠন-আকৃতি এত বড় যে, সমস্ত দুনিয়ার নদ-নদী, খাল-বিল, সাগর-দরিয়ার পানি যদি একত্রিত করিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালা হয়, তবুও বিন্দুমাত্র পানি জমীনে পড়িবে না। ইহাতেই মানবজ্ঞানে কিছুমাত্র অনুভূতি আসিতে পারে যে, তাঁহার দেহাকৃতি কত বিশাল।

এতদ্ব্যতীত, তাঁহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর জাফ্রানী লোম দ্বারা সুনিপুণভাবে আবৃত। এই সব লোমের প্রত্যেকটির বহু সংখ্যক মুখ রহিয়াছে। সেই মুখের প্রত্যেকটিতে আবার দশ লক্ষাধিক বার খোদার জিকির-আজকার ও তাসবীহ-তাহলীল পড়িতেছে। আর তাঁহার প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে এক একজন আল্লাহর অতীব নিকটতম ফেরেশতা পয়দা হয়। উহারাই আল্লাহর পবিত্র আরশ বহন করিয়া থাকে। উহারা কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা তাঁহার জিকির-আজকারে মশগুল থাকিবে।

হযরত ইসরাফীলের (আঃ) শ্বাস-প্রশ্বাসে যে সব ফেরেশতা পয়দা হয়, তাঁহারা দেখিতে ইসরাফীলের ন্যায়। এমন কি, সম্মানিত কেরামুন-কাতেবীন নামক ফেরেশতাদ্বয়ও তাঁহারই আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া কথিত আছে।

হযরত মীকাইল (আঃ) হযরত ইসরাইফীলের (আঃ) পাঁচশত বৎসর পরে পয়দা হইয়াছেন। তাঁহারও দেহের গঠন আকৃতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হযরত মীকাঈলেরও আপাদমস্তক জাফ্রানী রংগের লোমে আবৃতি।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার মূল্যবান জবর্জাত নামক পাথরের তৈরী দুইখানা অত্যাধিক শক্তিশালী ডানাও আছে। যাহার দ্বারা আল্লাহর আদেশ মতে নিমিষে তিনি ত্রিভূবন ঘুরিয়া বেড়ান।

হযরত মীকাঈলের (আঃ) শরীরে অসংখ্য লোম আছে। প্রত্যেকটি লোমের দশ হাজার মুখ ও চক্ষু রহিয়াছে। তিনি এই সকল চক্ষু হইতে মোমেন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর দরবারে রহমত ও মাগফেরাত কামনার্থে ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুধারা বহাইয়া দেন। যাহার ফলে প্রত্যেকটি অশ্রুর ফোঁটা হইতে মীকাঈলের (আঃ) আকৃতিরূপ এক একজন ফেরেশতা পয়দা হয়। উহারা কেয়ামত অবধি খোদার জিকের-আজকার, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদিতে রত থাকে। এই সকল ফেরেশতাকে হযরত মীকাঈলের (আঃ) ভারপ্রাপ্ত কার্যের সাহায্যকারী বা মুয়ীন ফেরেশতা বলা হয়। উহারা মীকাঈলের (আঃ) নির্দেশিত কার্যের সহায়তাকল্পে সর্বদা নিযুক্ত ও প্রস্তুত রহিয়াছে।

কথিত আছে, দুনিয়ার বুকে এমন কোন পানির বিন্দু বা ফোঁটা নাই যাহার সাথে মীকাঈলের এক একজন সাহায্যকারী নাই। এমন কি, বৃষ্টির প্রত্যেকটি ফোঁটার সাথে মীকাঈলের কার্যে সাহায্যকারী একজন ফেরেশতা জমীনে অবতীর্ণ হয়। এইরূপে ফল-মূল, জিরাত-শস্য, দানা-পানি এক কথায় খাদ্য দ্রব্যের প্রত্যেকটির সহিত হযরত মীকাঈলের নির্দেশিত কার্যের সাহায্যকারী একজন না একজন ফেরেশতা অবশ্যই নিয়োজিত আছে।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মীকাঈলের (আঃ) পাঁচশত বৎসর পরে পয়দা হইয়াছেন। হযরত জিবরাঈলের (আঃ) দেহের আকৃতি অত্যন্ত ভয়াবহ। যদি তিনি তাঁহার প্রকৃত দেহাকৃতি লইয়া একবার দৃশ্যমান হন, তাহা হইলে এমন কোন প্রাণী নাই তাহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে। জিবরাঈলের মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর জাফ্রানী রংগের লোমে আবৃত। প্রত্যেকটি লোম যেন চন্দ্র-তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার অপূর্ব জ্যোতিষ্মান দুইটি চক্ষু ও এক হাজার দুইশত খানা ডানা আছে। তাঁহার চক্ষুর অভ্যন্তরে সূর্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান আলো বিদ্যমান। যদি তিনি তাঁহার জ্যোতিষ্মান চক্ষু দ্বারা কোন বস্তুর উপর প্রগাঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে সেই বস্তু দগ্ধিভূত হইয়া ভস্ম হইতে আরম্ভ করিবে।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) সৌন্দর্যে সকল ফেরেশতার অন্যতম। কেননা, তিনি আল্লাহ্ পাকের আদেশে প্রত্যহ তিনশত সাতবার খোদার

নূর বা জ্যোতির দরিয়ায় আসন পাতিয়া বসিয়া থাকেন। ইহাতে বুঝা যায়, যাঁহাকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় নূরের দরিয়ায় বসিবার ইজ্জত দান করিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য কতখানি হইতে পারে। জিবরাঈল (আঃ) যখন উক্ত নূরের সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান করেন, তখন তাঁহার পবিত্র শরীরে মিশ্রিত হইয়া বহুসংখ্যক নূরের কণা উঠিয়া পড়ে। সেই সকল নূরের কণা হইতে জিবরাঈলের (আঃ) আকৃতিরূপ অসংখ্য ফেরেশতা পয়দা হয়, উহাদিগকে আত্মজ ফেরেশতা বলা হয়। উহারা কিয়ামত অবধি আল্লাহ্ তা'আলার জিকের-আজকার ও তাসবীহ-তাহলীল করিতে থাকিবে এবং মোমেন বান্দাদের জন্য ইলাহির দরবারে দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিতে থাকিবে।

আজরাঈল তথা মালাকুল মউত প্রধান চরিজন ফেরেশতার মধ্যে সর্বশেষে পয়দা হইয়াছেন মালাকুল মউত হযরত ইসরাফীলের আকৃতি বিশিষ্ট এবং দেখিতে প্রায় হযরত ইসরাফীলেরই (আঃ) ন্যায়। তাঁহাকে আল্লাহ্ পাক সকল সৃষ্ট জীবের আত্মা বা রূহ কবজ করিবার ভার প্রদান করিয়াছেন এবং আত্মার উপর তাঁহাকে অপরাজেয় শক্তি দান করিয়াছেন। তাই তিনি মানব-দানব, জিন-ফেরেশতা, পশু-পাখী অর্থাৎ খোদার সৃষ্ট তামাম জীব বা মাখলুকাতের আত্মা কবজ করিয়া থাকেন। এমন কি সর্বশেষে তিনি নিজের আত্মা নিজেই কবজ করিবেন।

তৈরি নূরে ফেরেশতা সব নূরে নূর বদন,
করেন তারা খোদার হুকুম পালন অনুক্ষণ।
হর হামেশা বাধ্য তারা অবাধ্যতা নাই,
যখন যা হয় হুকুম তাঁহার করেন তারা তাই।

–০–

ছয় ঃ মৃত্যুর সৃষ্টি রহস্য

আকৃতিহীন বস্তু-মৃত্যুকে আল্লাহ্ পাক কোন সময়ে পয়দা করিয়াছেন, সঠিকভাবে তাহা জানা যায় না। তবে কাহারও মতে বুঝা যায় যে, আদম নবীকে পয়দা করিবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুকে পয়দা করিয়াছেন। এই মর্মে কোরআন শরীফে স্পষ্ট দেখা যায় ঃ 'খালাকাল

মাউত অল হায়াতা–'আল্লাহ্ পাক জীবন ও মরণ নামে দুইটি বস্তু পয়দা করিয়াছেন।'

যাহার শুরু আছে, তাহার শেষও আছে, তাই প্রাণী মাত্রের অবশ্যই মরণসুরা পান করিতে হইবে–কেহ উহা হইতে বাদ পড়িবে না।

আল্লাহ পাক মৃত্যুকে কিরূপে পয়দা করিয়াছেন, রাসূলে পাকের হাদীছের মর্মে এই সম্পর্কে জানিতে পারা যায়–'আল্লাহতা'আলা মৃত্যুকে জমীন ও আসমানের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ করিয়া পয়দা করিয়াছেন। এমন কি, জমীন ও আসমান হইতেও উহা অধিকতর শক্তিশালী।

আল্লাহ্ পাক মৃত্যুকে পয়দা করিয়া বহুসংখ্যক মজবুত জিঞ্জির দ্বারা বাঁধিয়া এমন এক সুরক্ষিত গোপন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন যে, তাহার অতীব নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও মৃত্যুর তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। সন্ধান তো দূরের কথা, মৃত্যু নামের একটা ভয়াবহ বস্তু আল্লাহ পয়দা করিয়াছেন, সেই বিষয়ও তাহারা অবগত হইতে পারে নাই। তবে, কোথাও হইতে মৃত্যুর ত্রিভুবন বিদীর্ণকরণ বিকট গর্জন তাহারা শুনিতে পাইত। যখন আল্লাহ্ পাক হযরত আদমকে (আঃ) পয়দা করেন, তখন হইতে ফেরেশতাগণ কেবল মৃত্যুর সন্ধান পাইয়াছিল এবং জানিতে পারিয়াছিল, মৃত্যু নামেও আল্লাহ্ একটি ভয়াবহ বস্তু পয়দা করিয়াছেন।

আল্লাহতা'আলার ইচ্ছায় যখন ফেরেশতাগণ মৃত্যুর সৃষ্টি রহস্য জানিতে পারিল, তখন তিনি মালাকুল মউতকে (আজরাঈল) বলিলেন–'হে মালাকুল–মউত! আমি অদ্য হইতে তোমাকে মৃত্যুর উপর সম্পূর্ণ অধিকার শক্তি প্রদান করিলাম।'

মালাকুল মউত ইহা শুনামাত্র বলিয়া উঠিলেন–'হে রাববুল আলামীন! মউত আবার কি জিনিস? তখন আল্লাহ্ পাক মউতের চতুষ্পার্শ্বের অসংখ্য পর্দা তুলিয়া বলিলেন, 'এই দেখ মউত, ইহার উপর তোমার অধিকার দান করিয়াছি।' অতঃপর আল্লাহ্ পাক সকল ফেরেশতাদেরকে ডাকিয়া মউতকে দেখাইয়া বলিবেন–'হে ফেরেশতা! তোমরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া যাও এবং মউতকে ভালরূপে দেখিয়া লও।' আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাহারা দাঁড়াইয়া গেল এবং মউতকে দেখার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময় আল্লাহ্ মউতকে আদেশ করিলেন–'হে মউত! তোমার মুদিত চক্ষুসমূহ খোল এবং তোমার শক্তিশালী ডানাদ্বয়ের দ্বারা আকাশ ও ভুবন ভ্রমণ করিয়া সকল ফেরেশতাগণকে তোমার বিশাল আকৃতি প্রদর্শন কর।' মউত আল্লাহর এই আদেশ শ্রবণ মাত্র তাহার মুদিত চক্ষুসমূহ খুলিল এবং তাহার অতীব শক্তিশালী ডানাদ্বয়ের সাহায্যে আকাশ ও ভুবন ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ফেরেশতাগণ মউতের এইরূপ ভয়াবহ বিশাল আকৃতি দর্শন করামাত্র বেহুশ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। এই অবস্থায় তাহারা এক হাজার বৎসর মাটিতে গড়াগড়িখাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা আল্লাহর আদেশে চেতনা পাইল।

ফেরেশতাগণ তাহাদের চেতনাশক্তি পুনঃ প্রাপ্তিমাত্র আল্লাহ পাকের মসীপে করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিল, "হে দয়াময়! আপনি কি ইহা হইতে দ্বিতীয় আর কোন ভয়াবহ ও বিশাল আকৃতির বস্তু পয়দা করিয়াছেন?" তদুত্তরে আল্লাহ পাক বলিলেন, 'হে ফেরেশতাগণ! তোমরা মনে রাখিবে যে, আমি সকলের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। আমি মউতকে এই জন্যই পয়দা করিয়াছি যে, আমার প্রত্যেক সৃষ্ট জীবকে একবার না একবার ইহার করতলগত অবশ্য হইতে হইবে। এমন কি, তোমাদেরও ইহার হাত হইতে রেহাই নাই।

অতঃপর আল্লাহতা'আলা হযরত আজরাঈলকে (আঃ) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–'হে আজরাইল! তোমাকে উহার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার দান করিলাম। আজরাঈল ইহা শুনিয়া বলিলেন–'হে খোদা! আপনি মউতকে বিরাট শক্তিশালীরূপে পয়দা করিয়াছেন, উহাকে আমি কি প্রাকারে অধীন করিব?" আল্লাহ্ বলিলেন–'হে আজরাঈল। তুমি মউতকে দেখিয়া ভয় পাইও না। আমি এখনই তাহার উপর তোমার প্রভুত্ব প্রদান করিতেছি– তুমি ইহার উপর ক্ষমতাবান হইবে।'

এই বলিয়া আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে মউতের শক্তির উপর প্রভুত্ব দান করিলেন। আজরাঈল মউতকে তখনই তাহার অধীনতা স্বীকার করাইয়া লইলেন। মউত হযরত আজরাঈলের বশ্যতা স্বীকার করিল।

ইহার পরে মউত আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিল–'ইয়া বারে এলাহী! আমাকে আদেশ দান করুন আমি সমস্ত আসমান ও জমীন ভ্রমণ করিয়া সকল জীবন্ত বস্তুকে আমার শক্তি ও কার্যের বিষয় অবগত

করাইয়া আসি। আল্লাহ সম্মত হইয়া তাহাকে আদেশ দান করিলেন। মউত তখন সমস্ত আসমান-জমীন পরিভ্রমণ করিয়া বিজলীর ন্যায় গম্ভীর স্বরে গর্জন করিয়া বলিতে লাগিল ঃ 'হে সৃষ্টজীব! আমি এমন বস্তু যে, সকল বন্ধুকে তাহার বন্ধুর মিলন হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইব; এমনিভাবে স্বামীকে তাহার স্ত্রীর এবং স্ত্রীকে তাহার স্বামীর সম্মুখ হইতে জীবন টানিয়া বাহির করিয়া লইব।'

মউত আরও বলিল-'আমি এমনি ভয়াবহ বস্তু যে, পিতার সম্মুখ হইতে ছেলের জান কবজ করিয়া পিতাকে পুত্রহীন এবং ছেলের সম্মুখ হইতে পিতার জান কবজ করিয়া পুত্রকে ইয়াতীম করিব। এমনিভাবে ভাইগণের জান তাহাদের ভাই-বোনদের সম্মুখ হইতে নির্দয়ভাবে টানিয়া বাহির করিয়া ভাই-বোনদিগকে সাথীবিহীন করিব। আমার আকস্মিক হামলায় সকল আদম-সন্তানের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, সকল শক্তি সেই দিন আমার নিকট হইবে পদদলিত। আবার আমার হঠাৎ আক্রমণে প্রত্যেক ঘড়-বাড়ী, শহর-বন্দর, পথ-ঘাট ইত্যাদি জনশূন্য স্থানে পরিণত হইবে-বিরাণ হইবে সকল কিছু।'

খোদার বিকট সৃষ্টি আমি, মউত আমার নাম,
ভবের লীলা সাঙ্গ করা হইল আমার কাম।
পিতা-মাতা হরণ করে ইয়াতীম করি ছাও,
তাওলাদে হরণ করে কাঁদাই বাবা মাও।
ভাইকে নিয়ে কাঁদাই বহিন, বহিন নিয়ে ভাই,
আমার ভীষণ ছোবল হতে রক্ষা কারুর নাই।
স্বামী হরে কাঁদাই বিবি, বিবি হরে স্বামী,
সময় হলে তোমার কাছে হাজির হব আমি।

'হে মানুষ! তোমরা জানিয়া রাখ, আমি এত বড় শক্তিশালী যে, আমার হাতে প্রত্যেইটি আদম সন্তান অবশ্যই একবার নিষ্পেষিত হইবে। যত বড় শক্তির অধিকারই হউক না কেন, আমার আক্রমণ হইতে রেহাই পাইবে না কেহই।

'আমি এত বড় শাক্তিশালী যে, প্রাণী বলিতে আমার হাত হইতে কেউ রেহাই পাইবে না। দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যথাভাবে থাকিয়া

সকল জীবের জান কবজ করিব। শুধু কি তাই, এতবড় শক্তির বাহাদুর জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল এবং আজরাঈল ও একদিন আমার হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। তাহাদের জানও আমার হাতে কবজ হইবে। এতদ্ব্যতীত আমি এতবড় নির্দয় ও ভয়ংকর যে, দুনিয়ার সর্বশেষ মুহূর্তে আমার নিজের প্রাণ আমি নিজেই কবজ করিব।'

উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মউত একটি আত্মাবিশিষ্ট দেহযুক্ত প্রাণী। কিন্তু সত্যিকারে তাহা নহে, বরং মউত আল্লাহর আদেশ মাত্র। আর আজরাঈল (আঃ) সেই আদেশ বহনকারী। তাই যে মউত সে-ই আজরাঈল বলিলেও ভুল হইবে না। দুনিয়ার শেষ মুহূর্তে আজরাঈল তাহার নিজের জান নিজেই কবজ করিবেন।'

মৃত্যুর কার্যক্রম ঃ কথিত আছে, মানব জীবনের অন্তিমকালে যখন মৃত্যু আদম-সন্তানের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহার ভয়াবহ বিকট আকৃতি পরিবর্তন করিয়া আদম-সন্তানের দেহের নিকট উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া মানবাত্মা মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা করে-

'তুমি কে? এখানে কি চাও?' তদুত্তরে মউত গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিবে, 'আমি তোমার আত্মার যমদূত! আমি তোমাকে এই ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের দুনিয়া ত্যাগ করাইয়া অমরধামে ডাকিবার জন্য যমদূত সাজিয়া আসিয়াছি। আজ তোমার জান কবজ করিয়া তোমার স্ত্রীগণকে বিধবা করিব। আর তোমার সেই সকল ধন-সম্পত্তি যাহা তুমি কখনই কাহাকেও দান-ছদকা করিতে প্রস্তুত ছিলো না-অদ্য সেই সকল ধন-সম্পত্তি তোমার উত্তরাধিকারগণের মধ্যে বন্টন করিতে আসিয়াছি।'

ইহার পরে মৃত্য বলিবে-'হে মরণশীল? আফসোস, তুমি তোমার এই অমুল্য জীবনাবধি অমরধামে গমনের কোন পাথেয় সংগ্রহ করিলে না।' শুনিয়া মৃত্যুবরণকারী তাহার মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরাইয়া লইবে। তখনই আবার মৃত্যু ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া বলিবে-

'হে হতভাগা, হে মৃত্যুর পথের অভিযাত্রী! দেখত, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাকি? আমি যে তোমার সেই যমদূত, তোমার মাতা-পিতার আত্মা যে তোমার সম্মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল; তুমি যখন তাহাদের কাছে দাঁড়ানো ছিলে, তখন তুমি অনুভব করিতে পার নাই যে, মৃত্যু আবার কি জিনিস? কি করিয়া বা জান কবজ হয়। তাই অদ্য

আল্লাহর হুকুমে তোমার জানও কবজ করিতে আসিয়াছি। এখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া লও, মৃত্যু কি জিনিস এবং কিই-বা কষ্ট আছে ইহাতে। অদ্য আবার তোমার সন্তানগণও তোমার মৃত্যুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবে। কিন্তু তোমার মত উহারাও অনুভব করিতে পারিবে না যে, তাহাদের পিতার জানটা কিরূপে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। আবার এমন একদিন উহাদেরও আসিবে। 'হে মৃত্যগামী! ভয় পাইও না, আমি সেই বস্তু যাহার হাতে তোমার পূর্বের মহা শক্তিশালী সম্প্রদায়ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

কেতাবে আছে, মৃত্যু মানুষের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিবে-'হে অমুক! তুমি দুনিয়াটিকে কিরূপ দেখিয়াছ?' তদুত্তরে সে বলিবে-'আমি দুনিয়াটিকে অত্যন্ত কুমন্ত্রণাকারী, অসচ্চরিত্র, বিশ্বাসহন্তা রূপে পাইয়াছি।' পরপার গমনকারী ইহা বলা মাত্র দুনিয়ার আকৃতি আল্লাহর আদেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে-

হে পাপীষ্ঠ! এইরূপ কথা বলিতে কি লজ্জা হয় না? তুমি দুনিয়ায় আসিয়া নিজেকে দুশ্চরিত্রতা হইতে দূরে রাখ নাই, হালাল-হারামের পার্থক্য কর নাই, আর এখন কি না বলিতেছ, দুনিয়াটি অত্যন্ত কুমন্ত্রণাকারী অসচ্চরিত্র ইত্যাদি। তুমি বুঝিয়াছিলে, দুনিয়া হইতে বুঝি আর যাইতে হইবে না। এখন তাহার পরিণাম ভোগ কর।' দুনিয়া আরও বলিবে-হে অমরধামে গমনকারী! অদ্য হইতে তোমার কৃত যাবতীয় পাপকার্যের উপর আমি অসন্তুষ্ট রহিলাম। এই সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।' এই বলিয়া দুনিয়ার আকৃতি চলিয়া যাইবে।

তৎক্ষণাৎ আবার মৃত্যুগামীর সঞ্চিত ধন-দৌলত হাজির হইয়া বলিবে-

'হে পাপীষ্ঠ! তুমি আমাকে অসদুপায়ে উপার্জন করিয়াছিলে। কিন্তু আমার হক্ক, দান-ছদকা, যাকাত-ফেৎরা ইত্যাদি যথারীতি আদায় কর নাই। অসহায় গরীবকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে এক কপর্দক দান কর নাই, দান-খয়রাত করিতে পর্বত সমান কষ্ট অনুভব করিতে। সমস্তই ধন-দৌলত ছেলে-মেয়ে, পুত্র-পরিজনের জন্য পুঞ্জিভূত করিয়াছিল। কিন্তু অদ্য আমি অপরের হাতে চলিয়া যাইতেছি। তুমি তো আমাকে দান-ছদকা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে, অথচ তোমার জানা নাই যে, কেয়ামত

দিবস মাল-দৌলত, পুত্র-পরিজন কোনই উপকারে আসিবে না। এই মালই তোমার যন্ত্রণার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আল্লাহ পাক ফর্মান-
` ঃ মাল-দৌলত, পুত্র-স্বজন সেদিন কোন উপকারেই আসিবে না- উপকারে আসিবে শুধু সরল হৃদয়।'

এই বলিয়া ধন-দৌলত প্রস্থান করিবে। অতঃপর মউত তাহার গলদেশ টিপিয়া ধরিবে।

মৃত্যুগামীর কৃতকর্ম ভাল হইলে অতি আরামেই তাহার আত্মা বাহির করা হইবে। আর যদি সে মোনাফেক বা পাপী হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতিশয় কঠিন ভাবে তাহার আত্মা বাহির করা হইবে।

--০--

দ্বিতীয় অধ্যায়

জান কবজের কথা

জান কবজের প্রণালী

পূর্বে বলা হইয়াছে, মউত আল্লাহর আদেশ মাত্র। সেই আদেশ বহনকারী আজরাঈল। এইজন্য আজরাঈলকে (আঃ) মালাকুল-মউত বা মৃত্যুর অধিপতি বলা হয়। তিনি কি প্রকারে আদম সন্তানের জান কবজ করিবেন, এই সম্পর্কে মাকালিত ইবনে সুলাইমান নামক মোফাচ্ছের হইতে বর্ণিত আছে–

মালাকুল মউতের সপ্ত আসমানে নূরের তৈরী অত্যাশ্চর্য একখানা আসন আছে। আসনখানা নির্দিষ্ট স্থানে বহু হাজার পায়ার উপর দণ্ডায়মান। আজরাঈল বা মালাকুল-মউত সর্বদা উক্ত আসনের উপর উপবিষ্ট থাকেন। হযরত আজরাঈলের (আঃ) ইহা ছাড়াও বিরাট বিরাট চারিখানা শক্তিশালী ডানা আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শরীরে যাবতীয় প্রাণীর সংখ্যা অনুপাতে হাত, পা, চক্ষু, নাসিকা ও মুখ রহিয়াছে। যখন যাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন সেই নির্দিষ্ট চক্ষু, হাত ইত্যাদি দ্বারা তিনি মৃত্যুবরণকারীকে দেখিতে পান এবং আল্লাহর আদেশ প্রাপ্তি মাত্র উক্ত ব্যক্তির জান কবজ করিয়া ফেলেন। যখন উক্ত ব্যক্তির জান কবজ হইয়া যায়, তখনই আজরাঈলের শরীর হইতে উক্ত নির্দিষ্ট চক্ষু, হাত, পা ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়। কথিত আছে, শেষ মুহূর্তে মালাকুল মউতের শরীরে সে সব চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, হাত পা ইত্যাদির একটিও অবশিষ্ট থাকিবে না। ক্রমে ক্রমে সকলই তাঁহার শরীর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

আজরাঈলের (আঃ) দেহের আকৃতি এতই বিশাল যে, তাঁহার এক পা দোজখ-শীর্ষে স্থাপিত পুলসেরাতের উপর, আর অপর পা বেহেশতের পবিত্র আসনের উপরে অবস্থিত। ইহাতে বুঝা যায় যে, মৃত নেককার হইলে তাহার আত্মা বেহেশত এবং বদকার হইলে তাহার আত্মা দোজখে নিক্ষেপ করিতে তাঁহার মোটেই অসুবিধা হইবে না। বরং নিমেষের মধ্যে নেককার ও বদকারের আত্মা যথাস্থানে রাখিতে পারিবেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আজরাঈলের দেহের আকৃতি এত বিশাল যে যদি সমস্ত দরিয়ার পানি তাঁহার মস্তকে ঢালা হয়, তবু এক ফোঁটা পানি মাটিতে পড়িতে পারিবে না। সমস্ত পৃথিবীটা তাঁহার সম্মুখে একটা থালার সদৃশ মাত্র। উহার মধ্যে যেন যাবতীয় খাদ্য-খাদক মওজুদ, যখন যে খাদ্য ইচ্ছা খাইতে পারেন। মানে-দুনিয়াটা বরতন স্বরূপ এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় খাদ্য-খাদক যেমন সমস্ত প্রাণীর আত্মাসমূহ। যখন যাহার আত্মা ভক্ষণ (হরণ) করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন। এমন কি, পৃথিবী ধ্বংস হইবার প্রাক্কালে তিনি আরশ বহনকারী চারিজন ফেরেশতা ও আজরাঈলসহ অন্য প্রধান চারি ফেরেশতা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণীর জান কবজ করিয়া ফেলিবেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, কেয়ামত তথা পুনরুত্থানের পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহতাআ'লা ছাড়া আর কেহ জিন্দা থাকিবেন না।

আজরাঈল সমস্ত প্রাণীর জীবন হরণ করিয়া অবশেষে নিজের জানও নিজে হরণ করিবেন। যখন তিনি সমস্ত জীব-জন্তু-জীন-ফেরেশতা ইত্যাদির জান কবজ করা শেষ করিবেন, তখন আল্লাহ বলিবেন-'হে আজরাইল! এবার তোমার নিজের জান নিজেই কবজ কর।'

আল্লাহতাআ'লার এই আদেশ লংঘণ করিবার আজরাঈলের বিন্দুমাত্র শক্তি হইবে না। তাই তিনি নিজ আত্মা বাহির করিবার ভয়ে এইরূপ বিকট চিৎকার করিয়া উঠিবেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবন লীলা সাঙ্গ হইবে। এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ব্যতীত তখন আর কেহ জিন্দা থাকিবেন না।

সাধারণ লোকের জান কবজ ঃ হযরত কা'য়াব হইতে বর্ণিত আছে–আল্লাহ্ পাক তাঁহার পবিত্র আরশের নিম্নে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বৃক্ষে জীবিত আদম-সন্তানদের সংখ্যা পরিমাণ পাতা-পত্র আছে। তাহার প্রত্যেকটিতে আদম সন্তানের নাম-ধাম লিখা রহিয়াছে। যখন কোন আদম-সন্তানের আয়ু শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছার মাত্র চল্লিশ দিবস বাকী থাকে, তখন সেই বৃক্ষ হইতে উক্ত ব্যক্তির নাম-ধাম খচিত নির্দিষ্ট পত্রটি হযরত আজরাঈলের (আঃ) কোলে পতিত হয়। উহা দেখিয়া আজরাঈল বা মালাকুল মউত তখনই বুঝিতে পারেন যে, অমুক আদম-সন্তানের আয়ুর মেয়াদ শেষপ্রান্তে পৌছিবার মাত্র চল্লিশ দিবস বাকী। তখন

হইতে আজরাঈল তাহার আত্মা বাহির করিবার জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন।

কথিত আছে, এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যুর চল্লিশ দিবস পূর্বেই আসমানে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইয়া পড়ে। যদি সে দুনিয়ায় তখনও নিশ্চিন্ত মনে আরামে কাল যাপন করিতে থাকে। আফসোস! আসন্ন মৃত্যুগামী তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোন মানুষই জানিতে পারে না যে, সে আর কতদিন দুনিয়ায় আরাম করিবার সুযোগ পাইবে। এতদ্ব্যতীত এইরূপ ব্যক্তি এই চল্লিশ দিনে কত যে গোনাহর কার্য করিয়াছে, তাহার হিসাব কে রাখে–সে নিজেও জানে না যে, সে কি করিতেছে, কোথায় চলিয়াছে সে। হয়তো ইহার মধ্যে সে একটা হত্যাকাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে।

কেতাবে আছে, যখন মানুষের মৃত্যু ঘনাইয়া আসে, তখন তাহার রক্ত পরিচালক ফেরেশতা হযরত আজরাঈলের (আঃ) সমীপে করজোড় মিনতি করিয়া বলে, 'হে মালাকুল-মউত! আমি আল্লাহর আদেশে উক্ত ব্যক্তির রক্ত পরিচালনার কার্যে রত ছিলাম, কিন্তু অদ্য হইতে আল্লাহর আদেশে রক্ত পরিচালনার কার্য বন্ধ করিলাম। কাজেই এখন আপনার ইচ্ছানুযায়ী তাহার জান কবজ করিতে পারেন।'

এইরূপে তাহার সাথে সামান্য মাটি আনিয়া মিশ্রিত করিয়া দেয়।

জীবন অবসানে আদম-সন্তানের যে স্থানেই মৃত্যু হউক না কেন, তাহার গোর উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে হইবে-যেখান হইতে মালাকুর-রেহেম ফেরেশতা মাটি আনিয়া স্বামী-স্ত্রীর মিলিত বীর্যের সাথে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। এমন কি, সেই ব্যক্তির মৃত্যু উক্ত স্থান হইতে কোন দূরবর্তী স্থানেও ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আল্লাহর কুদরতে আদম-সন্তান সেই স্থানে পৌঁছিবেই এবং যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। এই মর্মে কোরআন পাকে আছে–

'হে মোহাম্মদ (ছাঃ)! আপনি মোনাফেকগণকে বলিয়া দেন যে, যদি তোমরা মৃত্যু ভয়ে ধর্ম-যুদ্ধ হইতে নিজ বাসস্থানে অবস্থান করিতে থাক, তবু আল্লাহর ইচ্ছা হইলে তোমাদের শয়ন কক্ষেও মৃত্যু আসিতে পারিবে।

এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, যাহার যেখানে মৃত্যু লেখা আছে, ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে অবশ্য সেখানে পৌঁছিয়া মরিতে হইবে। এই

আয়াত যদিও আল্লাহ পাক মোনাফেকদের উদ্দেশ্যে নাজিল করিয়াছেন, তবু উহার মর্ম সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তকদীরেতে লেখা আছে যেথায় মউত যার,
যেথাই থাকুক সেথাই পৌঁছতে হবে তার।

আদম-সন্তান যত দূরদেশেই থাকুক না কেন, মৃত্যুর প্রক্কালে তাহাকে কবরের নিকটবর্তী স্থানে অবশ্যই হাজির হইতে হইবে। যদি সেইস্থানে হাজির হওয়া মানব-শক্তির বাহিরেও হয়, তবুও যে কোন উপায়ে হউক, আল্লাহ তাঁহাকে সেই স্থানে পৌঁছাইবেনই। আর মালাকুল-মউতের উপর সে সময় যে স্থানে যাহার জান কবজ করিবার আদেশ রহিয়াছে, সে যদি ঐ স্থান হইতে শত সহস্র মাইল দূরেও থাকে, তবু তিনি তাহাকে শেষ মুহূর্তে যথাস্থানে উপস্থিত পাইবেন। এই মর্মে একটি সুন্দর ঘটনা আছে–

পূর্বকালে আজরাঈল (আঃ) নিজ আকৃতি পরিবর্তন করতঃ মানব আকৃতি ধারণ করিয়া নবী ও রাসূলগণকে সাক্ষাত দান করিতেন। হজরত সুলাইমান নবীর কালে একদা আজরাঈল (আঃ) মানব আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট হাজির হইয়াছিল এবং তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন যুবকের প্রতি বারংবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। আর মনে মনে ভাবিতেছিল যে-'সুদুর চীন দেশে এই যুবকের জান কবজ করিবার জন্য আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, কিন্ত কোন মানব-শক্তি নাই যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে যথাসময়ে সেইস্থানে ইহাকে পৌঁছাইতে সক্ষম।' এই ভাবিয়া আজরাঈল এস্তভাবে পুনঃ আল্লাহর দারগাহে গিয়া করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিল-'হে রাব্বুল আ'লামীন! এই সময় আমাকে যে যুবকের জান কবজ করিতে যেস্থানে আদেশ করিয়াছেন সে এখন সেস্থান হইতে এত দূরে রহিয়াছে যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন মানব শক্তিই তাহাকে সেই স্থানে পৌঁছাইতে পারিবে না'। এতদশ্রবণে আল্লাহ পাক পুনঃ আদেশ করিলেন-যাও যুবককে যথাস্থানে পাইবে।'

এদিকে মালাকুল-মউত যুবকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তাহার প্রাণে অত্যন্ত অশান্তি ও কষ্ট বোধ হইতেছিল। তাই যুবক হজরত

সুলাইমানের (আঃ) কাছে বলিল–'হুজুর! আমি আমার মনে-প্রাণে খুব অশান্তি বোধ করিতেছি, তাই দয়া করিয়া আপনার অনুগত বায়ুকে আদেশ করুন, যেন আমাকে বায়ু সুদূর চীন দেশে নিয়া যায়। হয়তো–বা সেখানে গেলে আমার মন ও প্রাণ শান্ত হইবে।'

হজরত সুলাইমান নবী তখনই বায়ুকে অনুরূপ আদেশ করিলেন। অমনি বায়ু নিমিষে যুবককে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল।

কিছু সময় পরে আজরাঈল খোদার পুনরাদেশ প্রাপ্ত হইয়া হজরত সুল-ইমানের (আঃ) নিকট উপস্থিত হইল। এবার সুলাইমান (আঃ) আজরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ভাই আজরাঈল! আপনি সে সময় আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকের প্রতি বারবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন কেন? আজরাঈল উত্তর করিল, 'আল্লাহর আদেশ হইয়াছে যে, উক্ত যুবকের জান সুদূর চীনদেশে কবজ করিতে হইবে। অথচ যুবককে এখানে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিতেছিলাম যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে সে যুবক কি করিয়া সেখানে উপস্থিত হইবে এবং আমিই-বা কি করিয়া তাহার জান যথাস্থানে কবজ করিব। এই জন্যই আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া যুবকটির প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।' তখন হজরত সুলাইমান (আঃ) তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। আজরাঈল (আঃ) বলিলেন–এক্ষণে আমি উক্ত স্থানে যাইতেছি।' এই বলিয়া আজরাঈল রওয়ানা হইয়া গেলেন। আজরাঈল গিয়া উক্ত যুবককে যথাস্থানে হাজির পাইয়া সেখানেই তাহার জান কবজ করিলেন।

কথিত আছে, আজরাঈলের (আঃ) বহু সংখ্যক সাহায্যকারী ফেরেশতা আছে, তাহারা মালাকুল-মউতের স্থলবর্তী হইয়া আদম সন্তানের রূহ কবজ করিয়া থাকে। এই মর্মে একটি সুন্দর ঘটনা আছে–

এক ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর দরগাহে দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিত–'হে খোদা! আমাকে এবং সূর্যচালক ফেরেশতাকে মাফ করিয়া দিন।' উক্ত ব্যক্তি এইরূপে বহুদিন পর্যন্ত দোয়া ও মোনাজাত করিতেছিল। সূর্যচালক ফেরেশতা যখন উক্ত ব্যক্তির দোয়া ও মাগফেরাতের বিষয় জানিতে পারিল, তখন তাহার কোমল হৃদয় গলিয়া গেল। সে তাহার

সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর সূর্যচালক ফেরেশতা আল্লাহর দরগাহে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল, আল্লাহ পাক তাহাকে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি করিলেন। সূর্যচালক ফেরেশতা তখনই উক্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল–'হে ভাই! তুমি আমার জন্য অনেকদিন যাবৎ আল্লাহর দরগাহে দোয়া মাগফেরাত কামনা করিতেছ, ইহার উদ্দেশ্য কি? কি চাও তুমি?'

তদুত্তরে উক্ত ব্যক্তি বলিল–হে সূর্যচালক ফেরেশতা! আমার কোন উদ্দেশ্য নাই; শুধু এতটুকু যে, তুমি আমাকে তোমার বাসস্থানে নিয়া যাইবে এবং দয়া করিয়া আমাকে মালাকুল-মউতের সাথে দেখা করাইয়া দিবে। আমি তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিব যে, আমি আর কত দিন জীবিত থাকিব।'

তৎক্ষণাৎ উক্ত ফেরেশতা তাহাকে তাহার বাসস্থানে নিয়া গেল এবং ফেরেশতার নিজ আসনে বসাইয়া মালাকুল-মউতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল–

'হে ভাই আজরাঈল! অমুক ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত আমার জন্য খোদার দরবারে দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিয়া আসিতেছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, সে জানিতে চায়, সে আর কতদিন বাঁচিবে। উদ্দেশ্য, তাহার জীবনের বাকী অংশটুকু যেন সে আল্লাহর ইবাদতে কাটাইতে পারে এবং আখেরাতের কিছু সম্বল অর্জন করিয়া তাঁহার দরবারে হাজির হইতে পারে। তাই, দয়া করিয়া তাহার আয়ুনামাখানা খুঁজিয়া দেখুন যে, সে আর কতদিন বাঁচিবে?' তখন মালাকুল-মউত উত্তর করিলেন, 'তোমার সাথী তো মস্তবড় একটি প্রশ্ন করিয়াছে?'

অতঃপর হজরত আজরাঈল (আঃ) বলিলেন–'তোমার সাথী তোমার আসনে উপবেশন না করা পর্যন্ত তাহার জীবনের মুদ্দত। তোমার আসনে উপবেশন করা মাত্র তাহার জীবন লীলা সাঙ্গ হইবে।' এই কথা শুনামাত্র সূর্যচালক ফেরেশতা চমকিয়া উঠিল–কি সর্বনাশ! এখন যে তাহাকে আমার আসনেই উপবেসন করাইয়া আসিয়াছি।'

হজরত আজরাঈল বা মালাকুল-মউত বলিলেন–তাই যদি হইয়া থাকে, তবে জানিয়া রাখ, এতক্ষণ হয়তো আমার প্রতিনিধি জান

কবজকারী ফেরেশতাগণ তার জান কবজ করিয়াছে–সে এখন জীবিত নাই।'

অতঃপর সূর্যচালক ফেরেশ্তা নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া দেখিল, সত্যই তাহার বন্ধুর প্রাণ হরণ করা হইয়াছে।

হাদীছ শরীফে আছে– সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহর জিকের–আজকারে সর্বদা মশগুল আছে। যে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু যখনই আল্লাহর জিকের হইতে বিরত হইবে, তখনই আল্লাহতা'আলা সেই সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর প্রাণবধের আদেশ দান করিবেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মৃত্যু আল্লাহর একটি আদেশ মাত্র। কাজেই সকল প্রানীর জান কবজ করিয়া থাকে একমাত্র আল্লাহর উক্ত আদেশ বহনকারী ফেরেশতা আজরাঈল। তাই, লোকে বলিয়া থাকে যে, আজরাঈল জান কবজ করিয়াছে অর্থাৎ জায়েদ তাহাকে বধ করিয়াছে। অথবা কোন পীড়া হইয়া মারা গেলে লোকে বলে, অমুক পীড়ায় লোকটি মরিয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ যে জান নিয়াছেন, সে কথা কেহই বলে না।

--০--

নবী ও রাসূলগণের জান কবজ

পূর্বের আলোচনায় সাধারণ লোকের জান কিরূপে কবজ করা হইয়া থাকে, সে বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আলোচ্য অংশে নবী ও রাসূলগণের জান কবজ কিরূপে করা হয়, তাহা বর্ণনা করা হইবে। হাদীছ শরীফে আছে, রাসূলগণের জান কবজ করিবার উদ্দেশ্যে আজরাঈল তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাদের রূহ বা আত্মা বলিয়া উঠে–

'হে আজরাঈল! যতক্ষণ আমি আল্লাহর আদেশ প্রাপ্ত না হই, ততক্ষণ আমি তোমার বশ্যতা স্বীকার করিতে কখনই প্রস্তুত নহি।' তদুত্তরে মালাকুল-মউত বলিবে–'হে পবিত্র রূহ! আল্লাহর আদেশ প্রাপ্ত না হইলে আমার নিজ ক্ষমতা বলিতে কিছুই নাই। আমি এখন যে আসিয়াছি, তাহাও একমাত্র আল্লাহর আদেশেই আসিয়াছি। কাজেই দয়া করিয়া আমার সাথে

চলুন, আল্লাহর আদেশ হইয়াছে।' তখন আবার রূহ বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিবে–

'হে আজরাঈল! আমি তোমাকে কখনও বিশ্বাস করি না, যতক্ষণ না তুমি আল্লাহর আদেশে আসিয়াছ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ কোন কিছু হাজির কর।' ইহা বলিয়াও রূহ ক্ষান্ত হইবে না বরং আরও বলিবে–

'হে আজরাঈল! তুমি আমার বিষয় কি জান? আল্লাহ পাক আমাকে সৃষ্টি করিয়া এই পবিত্র দেহে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন,' তখন কি তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে? আর এখন তুমি আমার কাছে কি চাও? যাও, আল্লাহর দরবারে চলিয়া যাও, এখানে তোমার কোন প্রয়োজন নাই।'

রূহের এরূপ কথা শুনিয়া আজরাঈল বিমুখ হইয়া খোদার দরবারে হাজির হইয়া বলিবেন–'আয় বারে খোদা! আপনার প্রিয় বন্ধু অমুক নবীর আত্মা কবজ করিতে আমাকে আদেশ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রূহ আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে রাজী নহে। বরং বলে যে, আল্লাহ পাকের নিকট হইতে তজ্জন্য দলিল প্রমাণ নিয়া আইস।' এতদশ্রবণে আল্লাহ পাক মৃদু হাসিয়া বলিবেন–'হে আজরাঈল! আমার বন্ধুর রূহ ঠিকই বলিয়াছে, তুমি প্রথমে ভুল করিয়াছিলে।'

তৎপর আল্লাহ বলিবেন, 'যাও, বেহেশত হইতে একটা 'সেব' অথবা 'আঙ্গুর নিয়া আমার বন্ধুর আত্মাকে দেখাও এবং বল–এই যে আল্লাহর আদেশের নিদর্শন নিয়া হাজির হইয়াছি।'

আজারাঈল (আঃ) তখনই বেহেশত হইতে অতীব সুন্দর একটি বেহেশতের মেওয়া (ফল) লইয়া পুনঃ উক্ত নবীর আত্মার নিকটি উপস্থিত হইবে। মেওয়ার উপর আরবীতে 'বিসমিল্লা–হির রাহমানির রাহীম' লিখা আছে। যখন আজরাঈল পুনর্বার উপস্থিত হইয়া উক্ত মেওয়া নবীর আত্মাকে দেখাইবে, তখন আত্মা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং অতি সহজে হাসিতে হাসিতে পবিত্র দেহ হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

অতঃপর আজরাঈল এবং তাহার সাথী অন্যান্য ফেরেশতাগণ সানন্দে মিছিল সহকারে উক্ত আত্মাকে লইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

দুনিয়ার অন্য সব লোকের মতন,
হয় নাক নবীদের মউত কখন।

হইলেই তাহাদের মৃত্যুর সময়,
আজরাঈল ফেরেস্তা এসে হাজির হয়।
ছালাম আরজ করে তাজীমের সাথ,
জান কবজের লাগি চাহে এজাজত।
খুশীতে করিলে তারা এজাজত দান,
তখনই আজরাঈল নিয়ে নেয় জান।

উপরি উক্ত বর্ণনা দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, নবী রাসূলগণের আত্মা কবজ করিবার পূর্বে আজরাঈল বা মালাকুল-মউতের ইজাজত লইতে হইবে যে, সে আজরাঈলের সঙ্গে খোদার দরবারে উপস্থিত হইতে রাজি আছে কি না। অন্যথায়, তাহাদের রূহ কখনই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে না। এই মর্মে হজরত মুসা নবীর মৃত্যুকালীন চমৎকার একটি ঘটনা বর্ণিত আছে-

হজরত মুসা (আঃ) যখন মৃত্যুর দুয়ারে পা রাখিয়াছিলেন, তখন আজরাঈল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ লইয়া তাঁহার জান কবজ করিতে উপস্থিত হয়। আজরাঈল হজরত মুসা নবীর আত্মার নিকট এজাজাত না চাহিয়াই তাঁহার জান কবজ করিতে উদ্যত হয়। এতদ্দর্শনে মুসা (আঃ) রাগের মাথায় আজরাঈলের মুখমণ্ডলীতে চড় বসাইয়া দেন। চড়ের আঘাতে তাহার একটি চক্ষু কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আজরাঈল চক্ষে হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আল্লাহর দরগাহে গিয়া বলিল-

'হে মা'বুদ! আপনি আমাকে এমন একজন লোকের জান কবজ করিতে পাঠাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনার আদেশ মান্য করে না, মরিতে চাহেন না। এই দেখুন, তাঁহার জান কবজ আরম্ভ করাতে আমার কি দুর্দশা ঘটাইয়াছে।' -আমি যে আজরাঈল, আমাকেই অপর আজরাঈল পাইতে বসিয়াছে। 'তদুত্তরে আল্লাহ পাক বলিলেন-

'তুমি কি তাঁহার কাছে আত্মা কবজ করিবার ইজাজত চাহিয়াছিলে? আজরাঈল উত্তর করিলঃ 'জ্বী না, তাতো করি নাই।' আল্লাহ বলিলেন, তাইতো আমার প্রিয় বান্দা তোমাকে এই অবস্থা ঘটাইয়াছে।'

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁহার কুদরতী হস্ত দ্বারা আজরাঈলের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহার চক্ষু পূর্বের ন্যায় ভাল হইয়া গেল। তৎপর আল্লাহ মালাকুল-মউতকে পুনঃ আদেশ করিলেন, 'এইবারে যাও, এবং তাহাকে আমার সালাম জানাইয়া বল যে, আপনি কি দুনিয়ায় থাকিতে চাহেন, না আপনার প্রিয় মা'বুদের মিলন কামনা করেন?'

আজরাঈল তাহাই করিল। হজরত মুসা (আঃ) তাহাতে উত্তর করিলেন-'যদি দুনিয়ায় থাকিতেই চাই তবে কি হইবে?' আজরাঈল বলিল-'আল্লাহ বলিয়াছেন যে, আপনি একটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠের উর আপনার হাত রাখিলে আপনার হাতের নিম্নে যতগুলি লোম পড়িবে, তত বৎসর আপনার আয়ু আল্লাহ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। মুসা নবী বলিলেন, 'তাহার পরে কি হইবে?' মালাকুল-মউত বলিল, 'তাহার পর মরিতে হইবে।' মুসা নবী বলিলেন-মরিতেই যখন হইবে, তখন দুনিয়ায় আর থাকার সাধ আমরা নাই। ভাই আজরাঈল! আসুন, এখনই আমার জান কবজ করুন।' মালাকুল-মউত তখন তাঁহার জান কবজ করিল।

--oo--

মো'মেনদের জান কবজ

হাদীছ শরীফে আছে, যখন কোন মো'মেন আদম-সন্তানের আয়ু শেষ প্রান্তে আসিয়া উপনীত হয় এবং জান কবজ হইবার সময় একেবারেই ঘনাইয়া আসে, মালাকুল-মউত আল্লাহর নির্দেশক্রমে সে ব্যক্তির জান কবজ করিবার জন্য তখনই তাহার নিকটে হাজির হয়। প্রথমতঃ যখন মালাকুল-মউত উক্ত ব্যক্তির জান কবজ করিবার নিমিত্ত তাহার মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, তখন মুখ প্রহরীর ন্যায় চক্ষু রাঙ্গাইয়া তাহাকে রুখিয়া দাঁড়াইয়া বলিবে-

'হে আমরা আত্মার যমদূত! তুমি এই রাস্তায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, কেননা এই ব্যক্তি আমার দ্বারা আল্লাহর জিকের-আজকার, তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদিতে দিবারাত্র মশগুল থাকিত। তাই প্রবেশার্থে অন্য রাস্তা অনুসন্ধান কর।' মালাকুল-মউত নিরাশ হইয়া হাতের দিক হইতে প্রবেশ

করিতে চেষ্টা করিবে। অমনি হাত আবার মালাকুল-মউতকে বাধা দিয়া বলিবে—

'হে মালাকুল-মউত! এই পথে প্রবেশ করিতে পারিবে না, কেননা এই হাত দ্বারা উক্ত ব্যক্তি ছদকা-খয়রাত, জাকাত ফিৎরা অকাতরে দান করিয়াছে, দীনহীন অনাথ-ইয়াতীমকে স্নেহে পুত্রতুল্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া সহানুভূতি দেখাইয়াছে। আবার দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করিয়াছে এবং এই হাত দ্বারাই সে কালামুল্লাহ (আল্লাহর বাণী) লিখিয়াছে। কাজেই তুমি অদ্য এই রাস্তায় প্রবেশ করিতে পরিবে না-অন্য পথ তালাশ কর। আজরাঈল এই রাস্তা হইতেও নিরুপায় হইয়া যখন পায়ের পথে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, তখন পা-ও বলিয়া উঠিবে—

'হে যমদূত! আমার আত্মা হরণ করিবার জন্য এই পথেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেননা, এই পদদ্বয় দ্বারা উক্ত ব্যক্তি জামাতে নামাজ পড়ার জন্য, ঈদগাহে হাজির হইয়া অন্যান্য মুসলমানদের সহিত একত্রে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য এবং হক্কানী আলেম বুজর্গানের ওয়াজ-নছীহত শ্রবণ করার জন্য চলাফিরা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এই পদদ্বয়ের দ্বারা সে আরও বহু নেক কাজ করিয়াছে। তাই তুমি এই পথ দিয়াও আত্মা হরণ করিবার জন্য প্রবেশ করিতে পারিবে না।' আজরাঈল পায়ের দ্বার হইতেও বিমুখ হইয়া আবার চক্ষুর পথে প্রবেশ করার জন্য চক্ষুর নিকটে উপস্থিত হইবে। চক্ষু আজরাঈলের মতলব বুঝিয়া বলিয়া উঠিবে—

'হে আজরাঈল! তুমি কখনই এই পথে এই মো'মেন ব্যক্তির জান কবজ করার জন্য প্রবেশ করিতে পারিবে না! কেননা এই মো'মেন ব্যক্তি ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনিয়া আমার দ্বারা আল্লাহর বাণী (কোরআন), হাদীছ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তাকাদি পাঠ করিয়াছে, তদনুযায়ী সে আমল করিয়াছে। কজেই ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই; দরকার হয় অন্য উপায় তালাশ কর।' এখান হইতেও আজরাঈল অনুপায় দেখিয়া শেষবারে কর্ণের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। কর্ণ তখনই আজরাঈলের সম্মুখে রুদ্ধ দ্বারের ন্যায় প্রতিবন্ধক সাজিয়া বলিবে—

'হে আমরা আত্মার যমদুত! তোমার সমস্ত কুমতলব বুঝিতে পারিয়াছি। সাবধান! ব্যর্থ চেষ্টা করিও না। কখনই এই পথে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুমি জান না, এই মো'মেন বান্দা তাহার এই কর্ণ কুহর দ্বারা আল্লাহর পবিত্র বাণী, রসুলের হাদীছ শ্রবণ করিয়াছে এবং হক্কানী আলেম, পীর বুজর্গের মজলিসে গমন করিয়া তাহাদের পবিত্র ওয়াছ-নছীহত শ্রবণ করিয়াছে। তদনুযায়ী সে আমল করিয়াছে, তাই তুমি কোন শরমে এই পবিত্র দ্বার দ্বারা তাহার আত্মা হরণ করিতে প্রবেশ করিতে চাও?-আমরা কেহই তাহার নিমকহারামী করিতে পারিব না। যাও দয়াময় আল্লাহর দরবারে, যিনি তোমাকে ইহার আত্মা হরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। শুনিয়া আইস তিনি কি বলেন।'

আজরাঈল (আঃ) তখন চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া মলিন মুখে আল্লাহর দরবারে হাজির হইয়া বলিবে-

'হে দয়াময় খোদা! আমাকে এমন এক ব্যক্তির জান কবজ করিতে পাঠাইয়াছেন; যাহার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ এক কথায় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উক্ত ব্যক্তির আত্মার কাছে প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছে। আমি বহু চেষ্টা ও অনুনয় বিনয় করিয়াও তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলাম না। শেষবারে তাহারা বলিয়া দিয়াছে-'যাও, দয়াময় খোদার দরবারে, গিয়া দেখ, তিনি কি বলেন।' হে খোদা! তাহারা উক্ত ব্যক্তির জান কবজ করিতে অনুমতি দিতেছে না-এখন আমি কি করিব?

আল্লাহ হাসিয়া উত্তর করিবেন-'হে আজরাঈল! ঘাবড়াইও না। তাহাদের কর্তব্য তাহারা পালন করিয়াছে। তাহারা নিমকহারামী করিতে পারে না। এবারে যাও এবং আমার পবিত্র নাম তোমার হাতের তালুতে লিখিয়া আমার বন্ধু উক্ত মো'মেন ব্যক্তির আত্মাকে গিয়া দেখাও।' আল্লাহর আদেশ পাইয়া মালাকুল-মউত তখনই আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম তাহার হাতের তালুতে লিখিয়া উক্ত ব্যক্তির সমীপে উপস্থিত হইবে এবং তাহার আত্মাকে বারবার উক্ত পবিত্র নাম দেখাইতে থাকিবে। তখনই মো'মেনের আত্মা আল্লাহর পবিত্র নামের মহব্বতে সহজে বাহির হইয়া আসিবে।

হাদীছ শরীফে আছে, মানুষের অন্তিমকালে যখন মালাকুল-মউত আত্মা বাহির করিতে আরম্ভ করে, তখন গায়েবী আওয়াজ আসে-'হে

জান কবজকারী" কিছুক্ষণের জন্য জান কবজ স্থগিত রাখ। আত্মাটাকে কিছু সময় আরাম করিতে দাও।'

তখন আজরাঈল (আঃ) আত্মাকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম দিয়া আবার জান কবজ করিতে আরম্ভ করিবে। আত্মা যখন মরণ বরণকারীর বক্ষদেশ পর্যন্ত পৌছে, তখন আবার গায়েবী আওয়াজ আসে 'হে মালাকুল-মউত! একটু থাম, রূহটা বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! উহাকে কিছু সময়ের জন্য আরাম করিতে দাও।' আজরাঈল (আঃ) তখন কিছু সময়ের জন্য জান কবজ বন্ধ রাখে। এইরূপে, মালাকুন-মউত মরণ বরণকারীর প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগে জান কবজ করিয়া পৌঁছিলে নুতন নুতন গায়েবী আওয়াজ আসিতে থাকিবে।

অবশেষে যখন মালাকুল-মউত জান কবজ করিতে করিতে মৃত্যু বরণকারীর গতদেশ পর্যন্ত পৌঁছিবে, তখন গায়েব হইতে সর্বশেষ আওয়াজ আসিবে-'হে আজরাঈল! রূহকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম দাও, রূহ শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া নিক।'

আজরাঈল ফেরেশতা এই অনুরোধ পাইয়া কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম দিবে। তৎপর এক হাত অন্য হাত হইতে, এক কর্ণ অন্য কর্ণ হইতে, এমনকি প্রত্যেক অংগ অপরাপর অংগ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে। শেষবারের মত তাহারা একে অন্যকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাতে-'কেয়ামত পর্যন্ত আমরা চির বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিলাম।

মৃত্যু বরণকারীর সর্বাংগে একে অন্য হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলে আজরাঈল (আঃ) অতি আরামের সাথে তাহার জান কবজ করিবে। মা-তৃকোলে দুগ্ধপায়ী সন্তান যেরূপ মাতার স্নেহের জড়ান চাপে কষ্ট না পাইয়া আরামই পায়, ঈমানদারদের মৃত্যুকষ্ট ঠিক তেমনই শান্তি ও আরামের হইবে।

ঈমানদারের প্রতি খোদা বড়ই মেহেরবান,
খুব আছানীর সাথে তাদের কবজ হবে জান।
শিশু যেমন পায়গো আরাম স্নেহের চাপে মার,
ঠিক সেমত মরণের সুখ পায়গো ঈমানদার।

জান কবজের পর মৃত্যুবরণকারীর হাত পূর্বের ন্যায় আর থাকিবে না-কাষ্ঠ নির্মিত হস্তের ন্যায় উহা নির্জীব পড়িয়া থাকিবে। পা থাকিতেও হাঁটিতে পারিবে না-তাহাও আজ অবশ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটির দৃষ্টি শক্তি রহিত হইয়া যাইবে, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও দেখিবার শক্তি থাকিবে না। কর্ণ দুইটি বধির হইয়া যাইবে; কর্ণ তখন আর আজান ও কোরআন পাঠের সুমধুর ধ্বনি শুনিতে পাইবে না। মোটকথা, সর্ব শরীরটা একটা মাটির তৈয়ারী পুতুলের ন্যায় ধুলায় পড়িয়া থাকিবে।

এই সকল মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করা ও সর্বাংগ অবশ হইয়া যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার। আল্লাহ এই জীবন বিহীন মুর্তিময় দেহ কিয়ামতের দিবস পুনঃ জীবিত করিবেন। সকল অংগ-প্রত্যংগ আবারও মিলিত হইবে। একে অন্যের সাক্ষাৎ পাইবে। কিন্তু আফসোস! যদি কেহ মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদৎ পড়িয়া বা শ্রবণ করিয়া মরিতে না পারে, তবে তাহার ছিল দুনিয়ায় আসাও যেমনি বৃথা, কেয়ামতের দিবস ইলাহির আদালতে দণ্ডায়মান হওয়াও হইবে তেমনি বৃথা। তাহার পরকাল-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দুঃখ আর দুঃখ। আশার স্বপন বলিতে সে আর কিছুই দেখিতে পাইবে না।

ঈমান নিয়ে মরণ নছীব হইবে নাক যার,
বৃথা তাহার মানব জীবন, আখের অন্ধকার।
সমুখে পথের কোথাও সুখ পাইবে না এক তিল,
দুঃখে ভরা হইবে তাহার সবগুলি মঞ্জিল।

আর যদি কেহ খোদার অসীম কৃপায় মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাৎ ইয়াদ করিতে করিতে মরিতে পারে, তবে মৃত্যুটা হইবে তাহার পক্ষে সোনায় সোহাগাতুল্য। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের শান্তির ময়দান হইবে উন্মুক্ত। দুঃখ বলিতে তাহার থাকিবে না কোন কিছুই। তাহার মৃত্যু যে দুঃখের দিনের অবসান-সুখের দিনের আগমন। ব্যাপারটি কবির ভাষায় শোনা যাক-

ঈমানের সাথে হল মউত যাঁহার,
বড়ই বুলন্দ হবে নছিব তাঁহার।

তাঁহার সমুখে নাই দুঃখ লজ্জা, ভয়,
অনন্ত জীবন হবে শুধু সুখময়।

ফেকাহ শাস্ত্রবিদ আলেমগণ বলিয়াছেন- মৃত্যুকালে ঈমান লইয়া মরণ বরণ করাটা বড়ই কটিন ব্যাপার। অনেকের ভাগ্যে তাহা জোটে না। তবে আল্লাহ যাহার মঙ্গল কামনা করেন, সে-ই শুধু ঈমান ইয়াকীনসহ প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হন।

--০০--

মৃত্যুকালে শয়তানের চক্রান্ত

হাদীছ শরীফে আছে, আদম-সন্তানের অন্তিমকালে আত্মা বাহির করিবার সময় কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান মরণ বরণকারীর বাম পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিতে থকিবে-

'হে মরণ বরণকারী! তুমি যে ধর্মাবলম্বী ছিলে, তাহা এখনি ছাড়িয়া দাও। তুমি যে বিশ্বাস করিতে 'আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং মোহাম্মদ (ছঃ) তাঁহার প্রেরিত পুরুষ ও শেষ নবী, ইহা কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। কেননা এই বিশাল বিশ্ব-জগত একজনের পরিচালনাধীন হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। নিশ্চয় ইহার প্রতিপালক একাধিক হইবে। হয়ত তাঁহাকে অন্যতম পরিচালক মনে করিতে পার। এতদ্ব্যতীত, মোহাম্মদও (ছঃ) শেষ নবী হইতে পারেন না। কেননা, তাঁহার পূর্বে আরও বহু নবী ও রসূল প্রেরিত হইয়াছিলেন। কাজেই মোহাম্মদের (ছঃ) পরে আরও বহু নবী আসিতে পারেন। এই বিশাল জগতের প্রত্যেক প্রাণীকে একবার মরিতে দেখিয়াছ এবং নিঃসন্দেহে সকল প্রাণী একবার মরিবেই; তাই জানিয়া রাখ, আল্লাহও একবার মরিবেন। মৃত্যুর হাত হইতে তিনিও রক্ষা পাইতে পারেন না- জীব মাত্রই যখন মরিতে হইবে, আল্লাহ কেন মরিবেন না? তাঁহাকেও মরণ সুরা পান করিতে হইবে।'

তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গ ও নরক বলিতে কোন জিনিস নাই। দুনিয়াই স্বর্গ আর দুনিয়াই নরক। দেখনা, দুনিয়ায় কেহ শাহানশাহী হালে

থাকে আর কেহ ফকীরের মত জীবনযাপন করে; কেহ খাইতে পায় না, আর কেহ খাইতে চায় না-ইহাই যে স্বর্গ নরক! বৈজ্ঞানিক যুগে বিশাল বিশ্ব ভূ-মণ্ডল ঘুরিয়া দেখিয়াছ; কোথাও কি স্বর্গ নরক বলিতে কিছু দেখিয়াছ! সকলই প্রবঞ্চনা মাত্র-স্বর্গ-নরক যে দুনিয়ায়।

'মৃত্যুর পরেই সব কিছুর শেষ-ইহাই যে মানুষের শেষ মঞ্জিল। মৃত্যুর পরে আবার কি করিয়া জিন্দা হইবে? ইহাও কি হইতে পারে? কখনই না! এ পর্যন্ত কত মানুষকেই, না মরিতে দেখিয়াছ কাহাকেও কি কোন ডাক্তার বা বিজ্ঞ হেকীম জিন্দা করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইয়াছ? তাহারা যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে; কিন্তু কেহ মরিয়া গেলে তো জিন্দা করিতে পারে না-সব কিছুই মিথ্যা।'

তাই, এখন হইতে আল্লাহরও অংশীদার আছে জ্ঞান কর। মোহাম্মাদ (ছঃ) শেষ নবী হইতে পারেন না! দুনিয়া ছাড়া স্বর্গ-নরক বলিতে কিছুই নাই। পুনর্জীবন মিথ্যা। ভাল চাও এখনও বলিতেছি শোন।'

কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান এইরূপে আরও বহু যুক্তিতর্ক দ্বারা মৃত্যুকালে আদম-সন্তানকে ধোকা দিতে চেষ্টা করিবে। কোন সময় হয়তো বেহেশতের ভোগ-বিলাসিতার প্রলোভন দেখাইয়া বলিবেঃ

'আল্লাহকে অংশী জ্ঞান করিলে এইরূপ বেহেশতে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিতে পারিবে। অন্যথায় দোজখের কঠিন আজাবের সম্মুখীন হইবে। মোটকথা, মরণকালে শয়তান আদম-সন্তানদের ঈমান ও ইয়াকীন নষ্ট করিতে চেষ্টার বিন্দুমাত্র অবহেলা করিবে না।

রাহের ছামান লও বাঁধিয়া হওগো হুশিয়ার,
মৃত্যু কালে আসবে ইবলিস ঈমান লুটিবার।
এমনি ফেরেব-কটিন ধোকা হইবে তাহার হায়,
সেই ধোকাতে ঈমান রাখা হইবে বড় দায়।

দাক্বায়েকুল-আখবারের লিখক ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলিয়াছেন, এইরূপ সঙ্কটময় মুহূর্তে অনেকের ঈমান বিনষ্ট হইবার পূর্ণ আশংকা রহিয়াছে। শয়তানের এইরূপ চক্রান্ত হইতে একমাত্র নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কাহারও রক্ষা পাওয়া বড়ই মুস্কিল। তাই ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন-বন্ধুগন, আপনারা সর্বদা দয়াময় আল্লাহর দরবারে মিনতি

সহকারে রোনাজারী (কাঁদা-কাটি) করতঃ কামেল ঈমান লইয়া মরিবার জন্য দিবারাত্র দোয়া মাগফেরাত করিতে থাকুন। রাত্র জাগরণ করতঃ নফল ইবাদাত, নফল নামাজ (তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) খুব বেশী করিয়া আদায় করিয়া কান্নাকাটি করিতে থাকুন; দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করুন! তাহা হইলেই আল্লাহর অসীম রহমত নাজিল হইবে এবং মৃত্যুর সঙ্কটময় মুহূর্তে শয়তানের লোভনীয় চক্রান্তে না ভুলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিবেন।'

এক ব্যক্তি ইমাম আজমের নিকট জিজ্ঞাসা করিল-হুজুর! এমন কি কি গুনাহ আছে, যাহা দ্বারা ঈমান নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে?

তিনি উত্তর করিলেন-'বিশেষ তিনটি কারণে মৃত্যুকালে ঈমান নষ্ট হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

(১) ঈমান গ্রহণ করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা অন্তঃকরণে আনয়ন না করা। কেননা, ঈমান মানুষের জীবনের প্রথম হইতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শান্তির পথ প্রদর্শক। কাজেই, যে কেহ এই শান্তি-দাতা ঈমানের কৃতজ্ঞতা পূর্ণরূপে আদায় না করিবে, ঈমান তাহার প্রতি নারাজ হইবে।

(২) দুনিয়ার মোহে আল্লাহর ভয়কে অন্তঃকরণ হইতে উঠাইয়া দেওয়া। কেননা-ঈমান আনয়ন করার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁহার দানরাশির প্রত্যাশী হওয়া। যদি ইহাই না থকিল তবে তাহার ঈমান কোথায় রহিল।।

(৩) আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচার করা। যেহেতু জীবের ভালমন্দ কামনা একমাত্র খোদ আল্লাহ করিবেন; সে স্থলে মানুষের কি অধিকার থাকিতে পারে? হয়তো আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহারা অত্যাচারীকে সর্বদা বদ্দোয়া (অভিশাপ) দেয়। এ কারণেই মৃত্যুকালে অত্যাচারী ব্যক্তির ঈমান হারাইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।'

কথিত আছে, মরণকালে আদম-সন্তান পানির তৃষ্ণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। পানির তৃষ্ণায় বক্ষদেশ শুষ্ক হইয়া কলিজা জ্বলিতে আরম্ভ করে। মরণগামী পানির তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া বিছানার এপাশে ওপাশে পানি খুঁজিতে থাকে। আদম-সন্তানের এরূপ পানি তৃষণায় অস্থির কালে বিতাড়িত শয়তান তাহার একজন আত্মিয়ের আকৃতি ধারণ করিয়া পনির

নামে একটি সুন্দর পাত্র পেশাব ভরিয়া হাসিমুখে মরণ বরণকারীর মুখের কাছে ধরে। মরণ বরণকারী ইহা দেখিয়া অনুমান করিতে পারে না যে, শয়তান পানির পাত্র নিয়া হাজির হইয়াছে, না অন্য কেহ। তাই সে পানির পাত্র চাহিয়া বলে-'হে অমুক! পানির তৃষ্ণায় কলিজা শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি পানি দাও।'

গভীর চিন্তার বিষয়, পানির তৃষ্ণায় এহেন অস্থিরতার কালে কেহ যদি মুখের কাছে পানির পাত্র ধরিয়া যাহা কিছু স্বীকৃতি লইয়া পানি পান করাইতে চাহে; তাহাতে সে রাজী হয় কি না? নিশ্চয় হয়।

কুমন্ত্রণাদাতা আজাজিল শয়তান ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না বরং আরও বলিবে-'হে তৃষ্ণাতুর! ইহা অতি পবিত্র পানি, ইহা আবে হায়াতের কূপ হইতে আনয়ন করা হইয়াছে। যে কেহ এই পানি একবার পান করিতে পরিবে, জীবনে তাহাকে এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করিতে হইবে না। যদি এই পানি পান করিতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে-'এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা বলিতে কেহই নাই। তবেই এই পবিত্র পানি পান করিতে পারিবে এবং চিরস্থায়ী ভাবে দুনিয়ায় বসবাস করিতে পারিবে।'

দুষ্টের মুখে এইরূপ তুষ্টিদায়ক গাল ভরা মিষ্টি কথা শুনিয়া অনেকেই ঠিক থকিতে পারে না। তাই যাহার কিসমত মন্দ হইয়া পড়ে, সে বাধ্য হইয়া এরূপ স্বীকৃতি প্রদান করিয়া পানির স্থলে শয়তনের পেশাব পান করিয়া ফেলে এবং পবিত্র ঈমান নষ্ট করিয়া নরকধামে গমন করে। আর আল্লাহ যাহার কিসমত ভাল চাহেন, তাহাকে শয়তান কোন অবস্থায়ই এইরূপ পানি পান করাইতে চাহিলে সে বলিয়া উঠিবে- দুর হ শয়তান, তোর চক্রান্তে আমি ভুলি না। তোর চক্রান্ত জাল ছিন্ন করিয়া আমি কি বলিতেছি কান পাতিয়া শোন-

'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অরাসুলুহু' -আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ (ছঃ) তাঁহার প্রেরিত রাসূল।'

ইহা শুনা মাত্র বিতাড়িত শয়তান উক্ত পানপাত্র দুরে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যু বরণকারীর নিকট হইতে তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইবে।

এই মর্মে প্রখ্যাত অলি হজরত জাকারিয়ার (রহঃ) বিষয়ে সুন্দর বিখ্যাত একটি ঘটনা প্রচলিত আছে।

হজরত জাকারিয়া (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেছিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্ববর্তী বন্ধু-বান্ধবগণ বুঝিতে পারিল যে তিনি এই নশ্বর ধরাধাম হইতে এখনই হয়তো বিদায় গ্রহণ করিয়া অবিনশ্বর ধামে গমন করিতেছেন। তাই তাহারা তাঁহাকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়িয়া স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। এ দিকে কুমন্ত্রনাদাতা শয়তান একটা পানির পাত্রে কৃত্রিম পানিসহ হাজির হইয়া হজরত জাকারিয়া (রাঃ) নিকট বলিতে ছিল 'হে জাকারিয়া! জীবনে বহু নেক কাজ করিয়াছ, শেষবারের মত একবার বলিয়া যাও-'লা-ইলাহা-অর্থাৎ কোন মা'বুদ বা সৃষ্টিকর্তা নাই' হয়তো ভবিষ্যৎ জীবন তোমার আরও সমুজ্জ্বল হইবে।'

তিনি শয়তানের এই চক্রান্তের কথা বুঝিয়া দু'দু'বার বিষন্নভাবে তাহার মুখমণ্ডল এদিকে সেদিকে ফিরাইতে ছিলেন। তৃতীয় বারে তিনি রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন-'দুর হ শয়তান! তোর কথায় আমি কখনই 'লা ইলাহা' বলিব না। সকলকে একরূপে ধারণা করিস না।'

শয়তানের এই চক্রান্তের কালে তাঁহার পার্শ্ববর্তী বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে কালেমায়ে শাহাদাৎ পড়িয়া শুনাইতেছিল। শয়তানের চক্রান্তের জবাবে তিনি যে এদিক-ওদিক মুখমণ্ডল ফিরাইতেছিলেন এবং শেষবারে যখন তিনি বলিলেন,' আমি ইহা বলিব না' ইহা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ খুবই ভীত হইয়া পড়িল এবং ভাবিল, হায়রে! না জানি জীবনের সকল পূণ্যকাজ এখন-ই পণ্ড হইয়া যায়। আমাদের কথায় (তালকীনের) বিপরীত বুঝিয়া হয়তে বেঈমান হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

এমন সময় হঠাৎ জাকারিয়া (রাঃ) হুশ ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার মুদিত চক্ষুদ্বয় খুলিয়া তিনি শেষবারের জন্য একবার তাঁহার বন্ধুদিগের প্রতি তাকাইলেন। ইহাতে তাহাদের ভগ্ন হৃদয় খুশীতে নাচিয়া উঠিল। তাহরা বলিল-'হে জাকারিয়া! তুমি ঐরূপ করিতেছিলে কেন? জাকারিয়া উত্তর করিলেন-'ভাই, মরণকালে শয়তানের চক্রান্ত জাল হইতে রেহাই পাওয়া বড়ই মুশকিল।'

অতঃপর হজরত জাকারিয়া (রাঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন-'তোমরা কি আমাকে কালেমায়ে শাহাদাৎ পড়িয়া শুনাইতে ছিলে?' তাহারা বলিল-হ্যাঁ, আমরা তোমাকে বারবার কালেমা স্মরণ করাইতেছিলাম আর তুমি তোমার মুখমণ্ডল এদিক সেদিক ঘুরাইতেছিলে। এমনকি শেষবারে বলিয়া ফেলিলে, 'আমি উহা বলিব না' শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি-'হায়রে! এইরূপ কেন বলিতেছে, তবে কি মরণকালে কালেমা পড়িয়া মরিতে পারবে না? এই ভাবিয়া আমরা দুঃখ করিতেছিলাম।

জাকারিয়া উত্তর করিলেন-'বন্ধুগণ! মূলে আমি তোমাদের কালেমা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় ঐরূপ করি নাই; দুর্নীতিপরায়ণ বিতাড়িত শয়তান একটি পাত্রে পানি লইয়া আমাকে 'লা-ইলাহা' বলিতে শিক্ষা দিতেছিল, তাই তাহার কথার জবাবে আমি ঐরূপ করিয়াছি। শেষবারে যখন আমি বলিলাম, 'দুর হ শয়তান, আমি উহা বলিব না' শয়তান তখন তাহার হাতের কৃত্রিম পানির পাত্র অনতিদুরে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমরা সাক্ষী থাক, এখনই তোমাদের স্মরণীয় কালেমায়ে শাহাদাৎ পড়িতেছি :

'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ অরাসূলুহ'

এই পবিত্র কালেমা শরীফ পাঠ করিতে করিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বন্ধুরা তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল এবং আল্লাহর লাখো শুকরিয়া আদায় করিল।

মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার মাল-আসবাব, ধন-দৌলত উত্তরাধিকারীগণ বন্টন করিয়া নিয়া যায়; রূহ মালাকুল-মউত বা আজরাঈল লইয়া যায়, হাড় মাটির সংগে মিলিয়া যায় এবং কিয়ামতের দিবস মৃতের পক্ষে ইলাহির আদালতে সাক্ষ্য দিবে এমন বস্তু (নামায়ে আ'মাল) ফেরেশতাদের হাতে গচ্ছিত থাকিয়া যায়-এই সকল অতি সহজ, পুনঃ প্রাপ্তির আশা আছে। কিন্তু মরণকালে কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের চক্রান্ত হইতে রেহাই পাইয়া ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ইহা সকলের ভাগ্যে জোটে না। এই

জীবন-মরণ মছীবত হইতে আল্লাহর পবিত্র দরবারে পানাহ চাওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের এহেন চক্রান্ত হইতে পানাহ দাও এবং তোমার করুণার শীতল ছায়ায় আমাদিগে আশ্রয় দাও, আমীন!

দ্বীন ইসলামে খোদা মোদের কদম রেখ ঠিক,
ঈমান নিয়ে আসতে গোরে দাও খোদা তৌফিক।

--০--

মৃত্যুর পরে গাইবী আওয়াজ

হাদীছ শরীফের মর্মে জানা যায়, মোমেন ব্যক্তি যখন মরণমুখে পতিত হয়, তখন আসমান হইতে তিনটি গাইবী আওয়াজ আসে। প্রথম আওয়াজে বলা হয়—

হে আদম-সন্তান! তুমি কি দুনিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছ-না দুনিয়া তোমাকে ছাড়িয়াছে?' দ্বিতীয় আওয়াজে বলিবে-'হে অমুক! তুমি কি দুনিয়ার চক্রে ঘুরিয়া দুনিয়াকে রাজী রাখিয়াছ-না তোমার মত ও পথে দুনিয়াকে ঘুরাইয়া তাহার উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছ! তৃতীয় আওয়াজে আবার বলিলে-'তুমি কি দুনিয়ার হাতে হাত মিলাইয়াছ-না দুনিয়াকে তোমার হাতে হাতে মিলাইতে বাধ্য করিয়াছ?'

আবার শবদেহকে ঘর হইতে গোসলের জন্য বাহির করা হইলে পুনঃ গাইব হইতে তিনটি আওয়াজ আসে। প্রথম আওয়াজে বলিবে-'হে আদম-সন্তান! জীবিতকালে তোমার যে শক্তি ছিল সে শক্তি কোথায়? দ্বিতীয় আওয়াজে বলিবে-'হে শবদেহ? পূর্বে যে রূপ কথা বলিতে, সেই মধুর মিষ্টকথা এখন তোমার কোথায় গেল?' কে তোমাকে মুক (বোবা) করিল। এখন আর কথা বলিতেছ না কেন! পূর্বের কোকিলের ন্যায় কুহুতানে জগৎ মুখরিত গানের সেই মিষ্টি মধুর সুর তোমার কোথা গেল? কে তোমার সুর কাড়িয়া লইল?' তৃতীয় আওয়াজে বলিবে-'পূর্বের তোমার বন্ধু-বান্ধব কোথায় গেল? কে তোমাকে তোমার বন্ধু-মিলন হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইল এবং কে-ই বা তোমাকে সাথী ছাড়া করিল।'

আবার যখন শব দেহকে গোসল করাইয়া কাফন পরাইতে আরম্ভ করিবে, তখন আবার গাইব হইতে তিনটি-আওয়াজ আসিবে। প্রথম আওয়জে বলিবে-'হে পরলোক গমনকারী! তুমি নশ্বর দুনিয়া ছাড়িয়া অজানার পথে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তোমার পথের সম্বল সংগ্রহ করিয়াছ কি, না খালি হাতেই রওয়ানা হইয়াছ? মনে রাখিও, নশ্বর দুনিয়ার ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা ও তখন-ইমারত ছাড়িয়া রওয়ানা হইয়াছ; এদিক কিন্তু আর ফিরিতে পারিবে না! পথ ভোলার ন্যায় যাত্রা পথে শুধু চলিতে থাকিবে! এই পথের যে আর সীমা নাই, তোমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কোথায়? এই তো তোমার চির-বিদায়, আর যে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সকলই আজ তোমাকে তোমার ভয়াবহ যাত্রা পথে তাড়াতাড়ি আগাইয়া দিতেছে।'

আবার যখন জানাজা দিবার জন্য মুর্দারকে খাটে উঠান হয়, তখন আসমান হইতে পুনঃ গাইবী আওয়াজ আসিবে-'হে আদম-সন্তান। তোমার জন্য সুসংবাদ, যদি তুমি তোমার কৃত গোনাহরাশি হইতে তওবা করিয়া মরিয়া থাক। তোমার জন্য আরো আনন্দের কারণ হইবে, যদি তোমার অমূল্য জীবন খোদার ইবাদত বন্দেগীতে কাটাইয়া অমরধামে গমন করিয়া থাক। কেননা, পরকালে অগ্নিবর্ষিত কেয়ামতের মাঠে এক-মাত্র আল্লাহর রহমত ছাড়া কাহারও নিস্তার নাই। আর যদি তোমার কৃতকার্য বদ লইয়া আখেরাতের পথে রওয়ানা হইয়া থাক বা তওবা না করিয়া মরিয়া থাক, তবে মনে রাখিবে, তোমার উপর নিশ্চয় আল্লাহর অভিস্পাত পতিত হইবে। এমনও হইতে পারে যে আল্লাহ তোমার উপর রাগান্বিত হইয়া তোমাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন।

আবার শব দেহকে যখন জানাজার নামাজ পড়াইবার জন্য লোকজনের সম্মুখে রাখা হয়, তখন গাইবী আওয়াজ আসে-' হে আদম সন্তান! তুমি দুনিয়ায় থাকিয়া পাপ পুণ্য যাহাই করিয়া থাক না কেন সকলই তোমার সাথী হইয়া অমরধামে গমন করিবে! যদি ভাল কাজ (পুণ্য) করিয়া থাক, তাহা হইলে ঐ পুণ্য তোমার কাজে আসিবে। আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হইবেন। অদুর ভবিষ্যতে তোমার জীবন আলোকিত হইবে। আর যদি কুকার্য (পাপ) করিয়া থাক, তবে ঐ পাপরাশি কেয়ামতের দিবস তোমার

পক্ষে যমদুত আকার ধারণ করিবে! আল্লাহ তোমার উপর রাগান্বিত হইবেন।

মৃতদেহকে যখন তাহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ কবরে রাখিয়া তাড়িতাড়ি মাটি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন, মাটি হইতে একটি আওয়াজ আসিবে-'হে আমার বক্ষে শায়িত মৃতদেহ! তুমি জীবিতকালে আমার উপর দিয়া বিনা বিঘ্নব কত বন্ধু-বান্দব, আত্মীয়-স্বজন লইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়া ফুর্তি সহকারে চলাফেরা করিয়াছ এবং নিজের বীরত্ব দেখাইয়া অতীব দর্পভরে চলিয়াছ। মনে করিয়াছিলে বুঝি আর মরিতে হইবে না এবং মাটির সংকীর্ণ স্থানেও শুইতে হইবে না। তাই আজ দেখ, তোমার কি অবস্থা। কোথায় তোমার সেই বন্ধু-বান্ধবগণ? তোমাকে যে তাহারা এই সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে ফেলিয়া যাইতেছে। তুমি যে আজ এই ভয়াবহ স্থানে একা। তোমার যে কোন প্রহরী নাই। সবই যে দুনিয়ায় রাখিয়া এই মাটির বিছানায় শুইতে বাধ্য হইয়াছ। এখন যে তুমি তাহাদের বিয়োগে একা একা চিন্তাশীল হইয়াছ এবং মলিন মুখে কাঁদাকাটা করিতেছ। আজ যে তুমি নিজ কৃতকার্যের জন্য অনুতাপ করিতেছ। মনে করিয়াছিলে, বুঝি আর মরিতে হইবে না?'

'মনে রাখিবে, যত বড় শক্তিশালী হও না কেন, আজ আর আমার খপপর হইতে উদ্ধার নাই। এমন এক চাপ দিব, যাহা কোন দিন শুন নাই, দেখা নাই, অনুভবও করিতে পার নাই। ভীষণ প্রচাপনে এক পার্শ্বের হাড্ডি অন্য পার্শ্বে লইয়া যাইব। চাপের চোটে হাড়, মাংস মিশিয়া একত্রিত হইয়া যাইব।'

ইহা শুনামাত্র মৃত ব্যক্তি ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দাঁড়াইবে না।

পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি আল্লাহর নেক বান্দা হইয়া থাকিলে আল্লাহ এইরূপ সঙ্কটময় মুহূর্তে অনতিদুর হইতে সাদরে ডাকিয়া বলিবেন-

'হে আমার চিন্তাযুক্ত বান্দা, তোমার কোন ভয় নাই, আজ হয়তো তোমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তোমাকে নির্দয়ভাবে একা এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে রাখিয়া গিয়াছে এবং তুমি এখানে একা সঙ্গিহীন হইয়াছ, তবু অদ্য আমিই তোমার অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গোরের আলো,

সঙ্গিহীন অবস্থায় সঙ্গী। কাজেই তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। আজ আমি তোমার প্রতি এত সহানুভূতি প্রদর্শন করিব যে, সমস্ত সৃষ্টজীব তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইবে। অদ্য তোমার প্রতি এত দয়ার্দ্র হইব যে, তোমার জীবিতকালে তোমার মাতা-পিতাও কোন দিন তোমার প্রতি ঐরূপ দয়ার্দ্র হয় নাই।'

হে মোর পেয়ারা বান্দা কি ভয় তোমার,
যদিও তোমার হেথা কেহ নাই আর।
ছাড়িয়া গিয়াছে সব ভাই বন্ধুগণ,
একেলা করিয়া আছ কবরে শয়ন!
ভয় নাই আমি আল্লা, আছি নেগাবান,
সকল বিপদ তব হইবে আছান।

--০--

মৃত্যুর আগে জমীন ও কবরের আওয়াজ

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-এর একটি হাদীছের বর্ণনায় জানা যায়, জমীন প্রত্যহ আদম সন্তানকে বলে-'হে আদম-সন্তান! তুমি আমার পৃষ্ঠের উপর স্বাধীনভাবে ও স্বাধীন মনে চলা-ফেরা করিতেছ। মনে রাখিও, তোমার মরণের পরে যখন সকলে তোমাকে আমার উদরের সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে পুঁতিয়া একা রাখিয়া চলিয়া যাইবে, তখন তোমার কি দুর্দশা হইবে? তখন তোমার পূর্বের সেই স্বাধীন মনোভাব আর থাকিবে না। আমি তোমার মৃত্তিকা শয়নগৃহ এত সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিব যে, একদিক ফিরিলে আর অন্যদিক ফিরিবার ইচ্ছা করিবে না। ভয়ে জড়সড়-হইয়া কাঁদিতে থাকিবে।

আরও বলিবে-'হে মানুষ! তুমি আমার পিঠের উপর থাকিয়া অসদুপায়ে ধন-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা উপার্জন করিয়া তদ্দারা হারাম খাদ্য খাইয়া তোমার দেহকে মোটা-তাজা করিয়াছ, এই মোটা-তাজা সুখের শরীর আর আদৌ থাকিবে না। মনে রাখিও, মরণের পর তোমার সাধের মোটা-তাজা শরীর আর মোটা-তাজা থাকিবে না, কীট-

পতংগের আহার্য বস্তু হইয়া যাইবে -সবই কীট-পতংগে খাইয়া শেষ করিবে।'

মাটি আরও বলিবে-হে মানুষ! তুমি আমার আমার পিঠের উপর থাকিয়া কত যে গোনাহর কার্য করিয়াছ এবং অপরকেও গোনাহর কার্যে প্রেরণা দান করিয়াছ, মরণের পরে কবরে তাহার প্রকৃত সাজা পাইবে। এমন করিয়া আমার পিঠের উপর হাসি-তামাসা, আমোদ-প্রমোদও উল্লাস করিয়া বেড়াইতেছ এবং অযথা সময় নষ্ট করিতেছ, তাই উহার প্রতিফল একদিন অন্ধকারময় কবরে ভোগ করিতে হইবে। সেদিন দুঃখে মথায় করাঘাত করিয়া কাঁদিলেও কোন ফল হইবে না। আজ আমার পিঠের উপর থাকিয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছ। মরণের পরে আমার মধ্যে আসিয়া তাহার প্রতিফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতে হইবে।'

এইরূপে মাটি আরও বলিবে-'হে আদম-সন্তান! আমার এই উন্মুক্ত পিঠে আলোকময় খোলা ময়দানে বিচারণ করিতেছ; কিন্তু মরণের পরে এমন সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে বাস করিতে হইবে, যেখানে মুক্ত বায়ু বহিবে না-আলো বলিতে কিছুই সেখানে দেখিতে পাইবে না।'

পুনঃ আবার বলিবে-'হে আদম-সন্তান! নশ্বর দুনিয়ায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন লইয়া মহা আনন্দে প্রসস্ত ময়দানে ও খোলা বায়ুতে ভ্রমণ করিতেছ কিন্তু মরণের পরে সংগীহীন কবরে একা বসবাস করিতে হইবে- বন্ধু-বান্ধাব, আত্মীয়-স্বজন বলিতে সেখানে কেহ থাকিবে না।

হাদীছ শরীফে আছে-কবর আদম-সন্তানকে প্রত্যহ তিনবার আহ্বান করিয়া থাকে-'হে মানুষ! আমি অত্যন্ত ভয়াবহ সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থান। এমন কোন সাহসী লোক নাই, যে আমার মধ্যে আসিলে ভয়ে তাহার কলিজা শুকাইয়া না যাইবে। আমি অত্যন্ত সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থান। আমার মধ্যে অসংখ্য কীট-পতংগ রহিয়াছে। তাই আমার সেই অন্ধকারের আলোরূপে এবং কীট-পতংগের ধ্বংসকারী হিসাবে এমন কিছু জিনিষ কি সঞ্চায় করিয়া লইয়াছ!'

আরও জানিয়া রাখ, আমার উদর বন্ধু-বান্ধব ও সাথীহীন স্থান। তাই সর্বদা কোরআন শরীফ পাঠাভ্যাস রাখিয়া আমার ভিতরকার সাথীহীন নির্জন স্থানে সাথীর বন্দোবস্ত কর-কারণ আমার অভ্যন্তর অত্যন্ত ভয়াবহ

অন্ধকার, কাজেই সময় থাকিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া নফল নামাজ, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি ইবাদত করিয়া আমাকে আলোকিত কর। আমার মধ্যে তোমার বিছানার জন্য শুধু মাটি আর ধুলা রাখা হইয়াছে; দুনিয়ায় যেরূপ খাট পালংকে আরাম করিয়া শুইতে, সেরূপ খাট-পালংক আমার মধ্যে নাই। তাই সময় থাকিতে নেক কার্য করিয়া খাট-পালংকের ন্যায় মহা আরামের শয্যা তৈরার কর।

মনে রাখিবে-আমার মধ্যে তোমাদের দংশনকারী বড় বড় ভয়ানক বিষাক্ত অজগর রাখা হইয়াছে। সে অজগর তোমাদিগকে দংশন করিবে। কাজেই মরিবার পূর্বে সময় করিয়া বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এই পবিত্র আয়াতাংশ পড়িয়া এবং নফল নামাজাদি যাতারীতি আদায় করিয়া উক্ত ধংশনকারী অজগর হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা কর।

জানিয়া রাখ, 'হে আদম-সন্তান! তোমার মৃত্যু হইয়া গেলে তোমার আত্মীয়-স্বজনগণ তোমাকে মৃত্তিকা গর্ভে একটি নির্জন কক্ষে পুঁথিয়া রাখিয়া আসিলেই কিছু পরে মুনকার ও নকীর নামক দুই ফেরেশতা অতি ভয়ানক আকৃতি ধারণ করিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে ও তোমার জীবনের কৃত যাবতীয় পাপ-পুণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিকাশ চাহিবে, তখন তাহাদিগকে কি উত্তর দান করিবে! কাজেই সময় থাকিতে তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য দিবা-রাত্র আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাক এবং সকাল-বিকাল বেশী পরিমাণে কলেমায়ে ত্বাইয়েব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' একগ্র চিত্তে পাঠ করিতে থাক। এই কলেমার বরকত ও বদৌলতে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দিতে সমর্থ হইবে।'

পাঠক! উপর উল্লিখিত মর্মে আমার কয়েকটি আরবী শে'র বা কবিতা মনে পড়িল।

জনৈক আরবী কবি বলেন- (অনুবাদ)

কবর বলে শোন আমি ঘুটঘুটে অন্ধকার
হৃদয় নুরে কর আমায় নুরানী-গোলজার।
আমার পেটে বোঝাই বহু সর্প বিষধর,
চোখের নীরে প্রতিষেধক অষুধ বানাও তার।

উম্মুল মো'মেনীন হজরত আয়েশা ছিদ্দীকা বলেন, একদা আমার ঘরে বসিয়াছিলাম, এমন সময় রাসূল (ছাঃ) আমার ঘরে তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সালাম করিলাম। আর আমার অভ্যাস অনুযায়ী তা'জীমের জন্য দাঁড়াইতেছিলাম। ইহাতে হুজুর (ছাঃ) বলিলেন—

'হে আয়েশা! যথাস্থানে বসিয়া থাক।' আমি তাই করিলাম। তখন রাসূলে পাক (ছাঃ) আসিয়া আমার উরুর উপর তাঁহার মস্তক মোবারক রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার দাড়ি মোবারক হইতে বাছিয়া একে একে উনিশটি সাদা দাড়ি বাহির করিলাম। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখ ও ভীতির সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, হুজুর বুঝি আর বেশী দিন দুনিয়ায় অবস্থান করিবেন না। হয়তো তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত উম্মতকে ইয়াতীম করিয়া চলিয়া যাইবেন। এইরূপ দুঃখে আমার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। এমন কি কয়েক ফোঁটা অশ্রু হুজুরে পাকের (ছাঃ) মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইল। হুজুর অমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন ঃ

'হে আয়শা, তোমার কি হইয়াছে! তোমার এই অবস্থা কেন? তখন আমি মিনতি সহকারে বলিলাম— ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার জীবন আপনার কদম মোবারকে উৎসর্গ করিতেছি। বলুন যে, মর্দারের উপর মরণকালে সবচেয়ে কোন অবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।'

তিনি উত্তর করিলেন ঃ 'মুর্দারের ঐ যন্ত্রণাই সবচেয়ে বেশী কঠিন, যখন মুর্দারকে তাহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণ ঘর হইতে বাহির করে এবং তাহার বিয়োগে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদাকাটি করিতে থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আবার ইরশাদ করিলেনঃ

'হে আয়েশা, ইহা হইতেও মুর্দারের উপর অত্যন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা ঐ সময় হয়, যে সময় তাহার আত্মীয়বর্গ, লোকজন নির্দয়ভাবে নিবিড় বনের ক্ষুদ্রাকার মৃত্তিকা গর্তে তাহাকে পুঁতিয়া আসে।' ইহার পর হুজুর (ছঃ) আরও বলিলেন ঃ

'হে আয়েশা। জানিয়া রাখ, মৃত ব্যক্তির **শরীর হইতে** যখন তাহার যাবতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, কাপড়-চোপড় খোলা **হয়,তখন** মৃত ব্যক্তির

আত্মা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলে— 'হে উলঙ্গকারিগণ! আমার দেহ এত তাড়াতাড়ি উলংগ করিও না, বড়ই লজ্জা হইতেছে।'

মোর্দায় মিনতি করে বলেগো তখন,
হে মোর ইয়ার বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
কি কর কি কর বড় লজ্জা হয় মোর,
খুল না খুল না মম অঙ্গের কাপড়।

তাহার এইরূপ চীৎকার মানব-দানব ব্যতীত আর সব সৃষ্টজীবই শুনিতে পাইবে।

এইভাবে যখন আবার মৃতদেহকে গোসল করাইবার জন্য তাহার শরীরের কাপড়-চোপড় খোলা আরম্ভ করা হয়, তখন আবার আত্মা চীৎকার করিয়া বলে— হে অমুক! আমার দেহ হইতে কাপড়-চোপড় ধীরে ধীরে খুলিতে থাক। কেননা, এইমাত্র আমি মরণের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি। মরণ আমার দেহকে একেবারে শাকসিদ্ধের মত নরম করিয়া ছাড়িয়াছে। আমার শরীরে এখন ফুলের আঘাত পর্যন্তও সহ্য হইতেছে না। কাজেই কাপড়-চোপড় আস্তে আস্তে খোল।'

ধীরে ধীরে খোল ভাই বসন আমার,
ফুলের আঘাতও আমি নারি সহিবার।
মৌতের কষ্ট ভাই এমন ভীষণ,
শরীর হয়েছে সিদ্ধ শাকের মতন।

আবার যখন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাইবার জন্য তাহার শরীরে পানি দেওয়া আরম্ভ করে, তখন মৃতদেহের আত্মা বলে ঃ 'হে গোসলদানকারী! আমার শরীরে অতিরিক্ত গরম বা শীতল পানি দিও না, তাহাতে আমার শরীর অত্যন্ত কষ্ট হয়। কোননা, মালাকুল-মউত এইমাত্র আমার শরীরকে ছাড়িল। আমার শরীরকে যে একেবারে পিষিয়া তুলার মত নরম ও ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই গরম বা শীতল পানি যাহাই দিতে থাক, তাতেই আমার কষ্ট-কোনটাই আমি বরদাস্ত করিতে পারিব না।'

অতি উষ্ণ কিংবা ভাই অতি ঠাণ্ডা বারী,
ঢেল না শরীরে মোর সহিতে না পারি।

আজরাঈল হরিয়াছে জীবন যখন,
শরীর করিছে ধূনা তুলার মতন।

আবার যখন সমস্ত শরীর উত্তমরূপে পানি দ্বারা মাজিয়া ঘসিয়া ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে, তখন বলে ঃ 'হে অমুক! তোমার কি আমার জন্য মোটেই দরদ নাই! এত নির্দয়ভাবে মাজিয়া-ঘষিয়া ধৌত করিতেছ? তুমি কি জান না যে, এইমাত্র আমি মউতের কবল হইতে রক্ষা পাইলাম। মউত যে আমার শরীরকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই শক্তভাবে আমার শরীর স্পর্শ করিও না। ধীরে ধীরে মাজিয়া পরিকার কর। মরণের যে কি যাতনা তাহা অনুভব করিতে পার নাই বলিয়াই এরূপভাবে করিতেছ, অন্যথা এ প্রকার নির্দয়ভাবে করিতে না!

ধীরে ধীরে তনু কর পরিষ্কার,
বড়ই বেদনা ভাই শরীরে আমার।

মৃতদেহকে গোসল দেওয়া হইলে যখন কাফন পরান আরম্ভ করে এবং কাফন পরাইয়া দুই পায়ের নিকট কাফন একত্র করিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করে ও মস্তকে কাপড় বাঁধিবার জন্য মস্তকের কাছে যায়, তখন মৃতদেহ আরও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলে-'হে কাফন প্রদানকারী, তোমাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, আমার মুখমণ্ডল এত তাড়াতাড়ি বাঁধিও না। এই যে আমার শেষ বিদায়। শেষবারের মত আমার আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু ও স্ত্রী-পুত্রগণকে একবার দেখিয়া লইতে দাও। এই যে আমার চির বিদায়। তাহারা যে কেয়ামতাবধি আমার চেহারা আর দেখিতে পাইবে না এবং আমি যে আর তাহ'দেরকে স্নেহ ও ভালবাসা দান করিতে পারিব না।

বাঁধিও না বাঁধিও না এত তাড়াতাড়ি,
আমিতো চলেছি আজি এ দুনিয়া ছাড়ি।
ক্ষণিক পরেই হব গোরে উপস্থিত,
হবে নাত দেখা আর কাহার সহিত।
ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন,
সবিত যাইব ছাড়ি জন্মের মতন।

হাশরের পূর্বে হায় আর কারো সাথ,
হবে না কোন দিন কভু মোলাকাত।
একটু সবুর তাই কর ওহে ভাই,
চির জনমের মত সবে দেখে যাই।

যখন মুর্দারকে কবরস্থানে নেওয়ার জন্য ঘর হইতে বাহির করা হইবে, তখন আবার মৃতদেহের আত্মা বলিয়া উঠিবে-'হে বন্ধুগণ। তোমাদিগকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, তোমরা আমাকে আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির কর। অদ্যই আমি নশ্বর দুনিয়া হইতে চির বিদায় নিয়া এমন স্থানে যাইতেছি, যেখানে কোনদিন যুগের হাওয়া প্রবাহিত হইবে না, কোলাহল বলিতে কিছু থাকিবে না সেখানে। তাই শেষ বারের মত একবার আমার চির জীবনের সাধনার ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা উত্যাদি দেখিয়া লইতে দাও" পুত্র-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন হইতে শেষ বারের মত বিদায়। কপালে করাঘাত করিলেও যে তাহারা আমি হতভাগাকে আর দেখিতে পাইবে না।'

খোদার কছম দিয়া বলি তোমাদের,
ঘর হতে ধীরে ধীরে করগো বাহের।
চির জনমের মত লইয়া বিদায়,
যাইতেছি আমি আজি এমন জায়গায়।
যেথায় বিরাজ সদা সীমাহীন ঘুম,
সাড়া নাই, শব্দ নাই, নীরব নিঝুম।
থামিয়া গিয়াছে যেথা গতি জামানার,
যেথায় আজিকে হবে বসতি আমার।
ধীরে তাই ঘর হতে নিকাল আমায়,
সবার হইতে দাও লইতে বিদায়।

আরও বলিবে-'হে বন্ধুগণ! অদ্য আমি আমার স্ত্রীকে বিধবা করিয়া চিরসঙ্কটময় স্থানে গম করিতেছি এবং আমার ছোট শিশু-সন্তানগণকে ইয়াতিম করিয়া চির বিদায় লইতেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহর দিকে চাহিয়া উহাদের উপর সদয় হইও,-করিও উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ। উহারা যেন আমাকে হারাইয়া বিয়োগ বেদনায় কোনরূপ কষ্ট না পায়; আর

তোমরাও তাহাদিগকে যাতনা দিতে চেষ্টা করিও না। হায়রে, আমার পুত্র-পরিজন! আমার বিয়োগে কে তাহাদেরকে সান্ত্বনা দিবে, কেই-বা তাহাদিগকে পিতৃবৎ স্নেহ করিবে।'

সবারে যাইগো রাখি জন্মের মতন,
ওদের করিও সবে আদর যতন।

আবার যখন মৃতদেহকে মুর্দারের খাটে তুলিয়া কবরস্থানের দিকে নেওয়ার জ্য প্রস্তুত করা হয়, তখন আত্মা বলিয়া উঠে-'হে লোক সকল! তোমারা আমাকে এত তাগাতাড়ি লইয়া যাইও না। আজ আমি এই নশ্বর দুনিয়া হইতে চির বিদায় লইয়া যাইতেছি। শেষ বারের মত আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব খেশ-আকাবেরগণকে একবার দেখিয়া লই। তাহাদিগকে যে আর কেয়ামত পর্যন্ত দেখিতে পাইব না। তাহাদের একটু কণ্ঠস্বর শুনিতে দাও।'

আবার যখন লোকজন শবদেহকে মুর্দারের খাটে তুলিয়া কবর স্থানের দিকে লইয়া রওয়ানা হয়, তখন মর্দারের আত্মা খোদার শপথ দিয়া বলে-'হে আমার বন্ধুগণ! হে আমার ভাইগণ! হে আমার সন্তান-সন্তুতিগণ! তোমরা দুনিয়ার সৌন্দর্য দেখিয়া তাহার চক্রে পড়িও না। এই দুনিয়া নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। এইখানে ভোগ-বিলাস, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত সকলই ক্ষণ-স্থায়ী। তাই তোমরা এই দুনিয়ার মোহে পতিত হইয়া আমার ন্যায় পথভ্রষ্ট হইও না। দুনিয়ার মোহে যতই পতিত হইবে, ততই আল্লাহ দূরে সরিয়া পড়িবেন। এখন বুঝিতেছি, কি অন্যায় করিয়াছি, অমূল্য জীবনকে কিভাবে মাটি করিয়াছি। এখন যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা আমি বুঝি। হায় অফসোস। কেন যে আল্লাহর আদেশ অবহেলা করিয়া দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়াছিলাম, কেনই বা ধন-দৌলত সঞ্চয় করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম?'

দেখ, হে আমার ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণ! আমার মরণে তোমরা আমার যাবতীয় ধন সম্পত্তি, মাল-দৌলত কড়ার গণ্ডায় হিসাব করিয়া বণ্টন করিয়া নিয়াছ, তাহাতে আমার কি উপকার হইল! তোমরা কেহ তো আমার এক তিল গোনাহর ভাগীও হইলে না? সবই যে আজ আমার জীবনে ধ্বংসাত্মত হইয়া দাঁড়াইল। জীবনে শুধু নানা উপায়ে ধন-

দৌলত উপার্জন করিয়াছি, কিন্তু তাহা হইতে এক কপর্দকও দান-ছদকা করি নাই। আজ যে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নেকীর কার্য বলিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। শেষবারের মত তোমাদিগকে বলিয়া যাই, আল্লাহর আদেশ অবহেলা করিয়া কোনরূপ ধন-দৌলত উপার্জন করিতে চেষ্টা করিও না।

মোর্দার কাঁদিয়া বলে কছম খোদার ,
অতি ক্ষণস্থায়ী শোন এই যে সংসার।
অস্থায়ী ইহার সুখ টাকা কড়ি ধন,
এর লাগি মুহব্বত বৃথা অকারণ।
পড়িয়া ইহার মোহে ভীষণ ধোকায়,
বরবাদ করেছি সব হায়, হায়, হায়।
আখের ভুলিনু যেই ধনের লাগিয়া,
সেই ধন যাইতে না যাইতে ছাড়িয়া।
ভাগ করে নিল সবে কড়া গণ্ডা তার,
কেহত নিল না ভাগ আমার গুনার।
তাই এই ধন লোভে পড়িয়া কখন,
আখের ক'র না নষ্ট আমার মতন।
এই দুনিয়ায় সব অনিত্য অসার,
তোমরা ইহার ফাঁদে পড়িও না আর।

এতদ্ব্যতীত শেষবারের মত তোমাদিগকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি-দয়া করিয়া আমার পরিত্যক্ত ধন-দৌলত হইতে মাঝে-মধ্যে আমার জন্য কিছু কিছু ছদকা করিয়া আমার রূহের মাগফেরাত করিও।

আবার যখন মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়া শেষ করিয়া দু' একজন লোক এদিক সেদিক চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তখন মৃতদেহের আত্মা সকলকে অনুরোধ করিয়া বলে- 'বন্ধুগণ! সদ্য মৃত ব্যক্তিকে কিছুদিন পরে তাহার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনগণ ভুলিয়া থাকে, কিন্তু তোমাদের কাছে আজ মিনতি সহকারে অনুরোধ করিয়া বলিতেছি, তোমরা কেহ আমাকে কবরে না রাখিয়া যাইও না।

যা কিছু আমার ছিল সব আজি ছাড়ি,
অজানার দেশে আমি জমাইনু পাড়ি।

তোমরা করিও ভোগ টাকা-কড়ি ধন,
কিন্তু দয়া করে রেখ আমায় স্মরণ।

হে বন্ধুগণ! মরণের পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকট অমূল্য রতন ছিলাম। বুঝি, এখন আমি তোমাদের কাধের বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তাহা সত্ত্বেও আজ তোমাদের নিকট অনুরোধ, দুনিয়ায় নানা উপায়ে বহু ধন-সম্পত্তি, মাল-দৌলত উপার্জন করিয়া তোমাদেরই জন্য রাখিয়া যাইতেছি। তাই দয়া করিয়া আমার জন্য মাঝে মাঝে দান ছদকা করিয়া কিছু পুণ্য (নেক) দিতে ভুলিও না।

আমি জীবিত থাকাকালীন তোমাদিগকে কোরআন পাঠ শিক্ষা দিয়াছিলাম; তোমরা আমাকে সুদূর অজানা পথে ছাড়িয়া ভুলিয়া যাইও না। মাঝে মাঝে সকাল বিকাল কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া আমার রূহের কল্যাণের জন্য বখশিয়া দিও। দুনিয়া হইতে আখেরাতের পথে কোন সম্বল লইয়া যাইতে পারিলাম না। তবে পরকালে সুখ-শান্তি অনেকটা তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছি ভুলিয়া যাইও না। আমার মত অসহায় একদিন তোমাদেরও হইতে হইবে, ভুলিলে চলিবে না।'

পাঠ করিয়া দোয়া দরূদ পবিত্র কুরআন,
কিংবা টাকা-পয়সা করে খোদার রাহে দান।
মুর্দেগানে করিলে সে ছোয়াব রেছানি,
সেই নেকীতে হয়গো তাদের কবর নুরানী।

মৃত ব্যক্তির জন্য কোর আন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া তাহার আত্মার শান্তির জন্য ছওয়াব রেসানী বা দোয়া করিলে তাহাতে মৃত ব্যক্তির অন্ধকারময় কবর আলোকিত হয়।

এই মর্মে ইবনে কলাবা (রাঃ) সুন্দর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ 'আমি একদা রাত্রিকালে স্বপ্ন যোগে একটি কবরস্থান দেখিতে পাইলাম, কবস্থানের সকল কবরগুলি ভাংগিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকটি কবর হইতে মুর্দার বাহির হইয়া কবরের উপর উঠিয়া বসিয়াছে। আরও দেখিলাম যে, আমার একজন মৃত প্রতিবেশী ব্যক্তির সম্মুখ ব্যতীত সকল মুর্দারের সম্মুখে এক একটি উজ্জ্বল আলো দেখা যাইতেছে। এতদ্দর্শনে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-

'ভাই! সকল মুর্দারের সম্মুখে আলো আছে, কিন্তু তোমার সম্মুখে আলো নাই-এর কারণ কি?'

আমার প্রতিবেশী উক্ত মুর্দার ব্যক্তি দুঃখ করিয়া উত্তর করিলঃ উহার কারণ এই যে, এই সকল মুর্দারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-মেয়ে, পুত্র-পরিজনেরা কোরআন শরীফ পাঠ করতঃ তাহাদের জন্য দোয়া করিতেছে এবং দান-ছদকা করিয়া তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছে; এই জন্য তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ পাক এমন সুন্দর আলো দান করিয়াছেন।' অতঃপর আবার আমার মৃত প্রতিবেশী আরও দুঃখ করিয়া বলিল ঃ আফসোস! আমার ছেলে গোনাহগার। সে আমার আত্মার শান্তির জন্য কোরআন শরীফ পাঠ তো দূরের কথা, দু'একটি পয়সা দান-ছদকা করিয়াও আমার রূহের মাগফেরাত কামনা করে না। এইজন্য আমি আলোহীন অন্ধকারময় স্থানে থাকিয়া অন্যান্য মুর্দারের কাছে লজ্জিত আছি।'

ইবনে কালাবা (রাঃ) বলেন,-এই ঘটনার পরে আমি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলাম। ইহার পরের দিবস অতি প্রত্যূষে উক্ত ব্যক্তির ছেলেকে ডাকাইয়া আমার স্বপ্ন তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া সে ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িল। অতঃপর সে আমার কাছে যাবতীয় গোনাহর কার্য হইতে বিরত থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল-তওবা করিল এবং বলিল ঃ 'আজ হইতে সকাল-বিকাল আমার পিতার জন্য যথারীতি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিব এবং দান ছদকা করতঃ তাঁহার রূহের মাগফেরাত কামনা করিব।'

ইবনে কাবালা বলেন- ইহার পরে আর এক রাত্রে স্বপ্নযোগে উক্ত কবরস্থান এবং উক্ত মুর্দারদিগে অনুরূপ দেখিতে পাইলাম। কি আশ্চর্য! ইহার পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম অদ্য তাহার বিপরীত দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, উক্ত প্রতিবেশীর সম্মুখে সূর্যের ন্যায় অপূর্ব জ্যেতির্ময় একটি নূর (আলো) তাহার চতুস্পার্শে আলোকিত করিয়াছ। আমাকে দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল ঃ

আল্লাহ আপনার দীন-দুনিয়া মঙ্গল করুন; সুখে ও আল্লাহর করুণার ছায়াতলে আপনার জীবন অতিবাহিত হউক। আল্লাহর অপার করুণা এবং আপনার ন্যায় খোদাভক্ত একজন বান্দার বদৌলতে অদ্য আমি ভয়াবহ

অন্ধকার এবং আমার অন্যান্য প্রতিবেশী মুর্দাদের কাছে লজ্জা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।'

দোয়া ও কোরআন তেলাওয়াত করিয়া মুর্দার প্রতি বখশিয়া দিলে যেমনি কবরে হাশরে তার উপকার হয়, অনুরূপ উপকার হয় বিসমিল্লা'র বরকতেও। এই সম্পর্কে হাদীছের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

কোন এক শহরে এক ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হইলে মালাকুল-মউত তাহার আত্মা কবজ করিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উক্ত ব্যক্তি মালাকুল-মউতের ভীষণ আকৃতি দেখিয়া বলিল-'আপনি কে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন- 'আমি মালাকুল মউত। আল্লাহর আদেশে এখনই তোমার আত্মা হরণ করিতে আসিয়াছি।' এতদশ্রবণে উক্ত ব্যক্তি কাঁপিতে লাগিল। মালাকুল-মউত বলিলেন-'এইরূপ কাঁপিতেছ কেন, দোজখের ভীষণ আজাবের ভয় পাইয়াছ না কি?' সে বলিল-হ্যাঁ হুজুর, জীবনে কোন নেক কাজ করিতে পারি নাই। না জানি মৃত্যুর পরে কি অবস্থা ঘটে।' মালাকুল-মউত তখন বলিলেন-ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তোমাকে এমন এক টুকরা কালাম লিখিয়া দিব, যাহার কারণে তুমি দোজখের ভীষণ আজাব হইতে রক্ষা পাইবে।' এই কথা শুনিয়া উক্ত ব্যক্তি সবিনয়ে বলিল- দয়া করিয়া আমাকে সে কালাম টুকরা লিখিয়া দিন। মালাকুল-মউত তখন এক টুকরা কাগজে আরবীতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিয়া দিয়া বলিলেন-যাও, এ কলেমার বরকতে আল্লাহ পাক তোমাকে দোজখের ভয়াবহ আজাব হইতে রক্ষা করিবেন।

--০--

মৃতের প্রতি বিলাপ করিয়া কাঁদা

হাদীছ শরীফে আছে-যে ব্যক্তি বিপদে অধৈর্য হইয়া বস্ত্র ছিন্ন করে এবং বক্ষে করাঘাত করে, সে যেন আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল।

অন্য একটি হাদীছে আছে-যে ব্যক্তি মছীবতে পড়িয়া দরজায় বিষাদময় কাল রেখা অঙ্কিত করে বা কাল কাপড় পরিধান করে অথবা ঘড়-বাড়ি বিরাণ করিয়া ফেলে কিংবা বৃক্ষ-লতাদি ধ্বংস করে, তাহার

জন্য আল্লাহ পাক দোজখে ভীষণ অগ্নি কাননে অসংখ্য ঘর-বাড়ি তৈয়ার করিয়া রাখিবেন। আর সে এত বড় পাপীরূপে গণ্য হইবে যে, সে যেন সত্তর জন নবীর হত্যাকাণ্ডের গোনাহে যোগদান করিয়াছে।

যে ব্যক্তি এইরূপ শরীয়ত বিরোধী কার্য-কলাপ করিয়াছে, যতদিন না সে উহা হইতে তওবা করিবে এবং নিজের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কিছুই কবুল হইবে না। আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিবস এই সকল লোকদের তন্নতন্ন করিয়া হিসাব লইবেন। আর উহারা কেয়ামতের দিবস বস্ত্রহীন ও নগ্নপদে হাজির হইবে। তাহাদের আমলনামায় অসংখ্য গোনাহ-রাশি লেখা হইবে এবং আকাশ ও জমীনের যাবতীয় ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিতে থাকিবে।

হাদীছ শরীফে আছে-যে ব্যক্তি মছীবতে পতিত হইয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, মৃতের প্রতি বিলাপ করিয়া কাঁদা-কাটা করে, মালাকুল-মউত এইরূপ ব্যক্তির দরজায় হাজির হইয়া বলে-'হে অমুক! তুমি এইরূপ করিতেছ কেন! কাহার উপর রাগ করিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতেছ? তোমার আপনজনের আত্মা হরণ করায় আমার উপর রাগ হইয়াছ কি? তাই যদি হয়, তবে তুমি একান্ত ভুল করিতেছ। কেননা আমি আল্লাহর আদেশ পালন করিয়াছি মাত্র। আল্লাহ যখন তোমার আত্মীয়ের আত্মা হরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখনই তাহার আত্মা হরণ করিয়াছি। আল্লাহর আদেশ ছাড়া এক মিনিট পূর্বে কাহারও জীবন বিনাশ করার অধিকার আমার নাই। কাজেই আমার উপর রাগ করিয়া কি লাভ? আর যদি একান্তই আল্লাহর উপর রাগ করিয়া তকদীরের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া থাক, তবে মনে রাখিবে, তুমি ভীষণ অন্যায় করিলে এবং কাফের হইলে। পরকালে দোজখের অগ্নিকুণ্ডে তোমাকে জ্বলিতে হইবে।' মালাকুল-মউত আরও বলিবেন-'হে অমুক! জানিয়া রাখ, কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আমি বার বার আসিয়া আল্লাহর আদেশে তোমাদের জান কবজ করিব-প্রত্যেককেই তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া করিব।

বিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ আলেম আবুল লাইছ (রহঃ) বলিয়াছেন-বিলাপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা হারাম, তবে কেহ প্রাণের কষ্টে অধীর হইয়া

অশ্রুধারা বহাইয়া কাঁদিতে পারে। কিন্তু এইরূপও না করিয়া আত্মাকে সান্তনা দেওয়াই উত্তম। আল্লাহ ফর্মান–

ঃ মছীবতে ধৈর্য ধারণকারীগণ অসংখ্য নেকীর অধীকারী হইবে।

বিপদে ছবর করে রহে যেই জন,
অবশ্য অশেষ নেকী লভে সেইজন।

কথিত আছে হজরত হুসাইনের (রাযিঃ) পুত্র আলির (রামিঃ) মৃত্যুর পরে তাঁহার স্ত্রী বহুদিন যাবৎ তাঁহার মাজারের নিকট 'খীমা' গাড়িয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। অনেক দিন পরে যখনই তাঁহার স্ত্রী খীমা তুলিয়া রওয়ানা করিল তখন গাইবী আওয়াজ আসিল–'হে অমুক। তুমি এতদিন যাহার প্রতীক্ষায় ছিলে, তাহাকে কি পাইয়াছ?'

মৃত লোকদের জন্য কেবল অশ্রু নির্গত করিয়া কাঁদা জায়েজ আছে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন তাঁহার নাবালেগ ছোট শিশু ইব্রাহীম ইবনে মোহাম্মদের (ছাঃ) ইন্তেকাল হয়, তখন হুজুর দুঃখে অশ্রু নির্গত করিয়া কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আউফ বলিয়া উঠিলেন–

'ইহা রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদিগকে মুছীমতে অধৈর্য হইয়া কাঁদিতে নিষেধ করেন নাই? তদুত্তরে হজুর বলেন– বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ বিলাপ করিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিয়াছি– এইরূপ কাঁদা হারাম। তবে মহব্বতে অধীর হইয়া অশ্রু নির্গত করিয়া কাঁদার বিধান আছে।

--o--

মুছীবতে ধৈর্যধারণ

রাসূল পাক (ছঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি ফরমাইয়াছেন, 'লাওহি মাহফুজে' আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিষয় লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। তম্মধ্যে প্রথম লিখিতে বলিয়াছেন– 'আমি এমন সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ বা মা'বুদ, যাঁহার দ্বিতীয় নাই। আমার ব্যতীত অন্যের জন্য ইবাদত–বন্দেগী গ্রহণযোগ্য বা কবুল হইবে না। মোহাম্মদ মোস্তফা আমার প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত মহাপুরুষ বা রসূল। আমার আদেশের বিপরীত কাহারও আদেশ থাকিতে পারে না। সমস্ত সৃষ্ট জীবের মত ও পথ

আমার নির্দেশিত পথের অনুসারী হইবে। যে ব্যক্তি আমার আদেশ অবনত মস্তকে শিরোধার্য করিবে; পরীক্ষামূলক ভাবে অবতীর্ণ বালা–মুছীবতে ধৈর্য্য ধারণ করিবে, আর যে আমার বিশাল দানরাশির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে, আমি তাহাদের নাম, 'লাওহি মাহফুজে' সত্যবাদী রূপে অঙ্কিত করিব। আর উহাদিগকে কিয়ামতের দিবস সত্যবাদী দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমার আদালতে হাজির করিব।

দুনিয়ার বুকে যেই আদম সন্তান,
হামেশা মানিয়া চলে খোদার ফর্মান।
বালা–মুছীবতে রহে করিয়া সবর,
আর করে আল্লাহর দানে শোকর
ছাদেক হিসাবে নাম নেক বান্দার,
লিখে রাখা হয় লোহে মা'ফুজে খোদার
আর দয়াময় খোদা তাহাকে হাশরে,
উঠাবেন ছাদেকীন দল ভুক্ত করে।

'যে ব্যক্তি আমার আদেশ অমান্য করিবে অথবা অবহেলা করিবে, আমার পরীক্ষামূলক বালা–মছীবতে অধৈর্য হইয়া শরীয়ত বিরোধী কার্য–কলাপে লিপ্ত হইবে, মস্তকে করাঘাত করিবে, ঘরে কাল রেখা আঁকিবে ও কাল বস্ত্র পরিধান করিবে এবং যে ব্যক্তি আমার বিশাল দানরাশির অকৃতজ্ঞ হইবে, সে যেন আমার বিশাল ভূমণ্ডল হইতে বাহির হইয়া যায়। আর আমার ভাল–মন্দ আদেশ ও কার্যাদি তাহার মনঃপুত না হয়, তবে যেন সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী অন্য একজন (প্রতিপালক) খুঁজিয়া লয়।'

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, ধৈর্যধারণ তিন প্রকার। যথা–(১) ইবাদত–বন্দেগীতে ধৈর্যধারণ করা, অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহর ইবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাকা এবং আল্লাহর ধ্যানে কোন সময় বীতশ্রদ্ধ না হওয়া। (২) গোনাহর কাজ হইতে ধৈর্যধারণ করা, অর্থাৎ সর্বদা নিজের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে গোনাহর কার্য হইতে এবং অসৎ প্রবৃত্তি হইতে বিরত রাখা। (৩) কষ্ট–মুছীবতে ধৈর্যধারণ করা।

--o--

তৃতীয় অধ্যায়
মৃত্যু ও কবর আজাব
মৃত্যুকালীন অবস্থা

হাদীস শরীফে আছে-যখন মানুষের অন্তিমকাল উপস্থিত হয় এবং আত্মা বাহির হইবার সময় ঘনাইয়া আসে, তখন চারিজন ফেরেশতা তাহার নিকট উপস্থিত হয়। সর্বপ্রথম একজন ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া বলে-আচ্ছালামু আলাইকুম' হে অমুক! আমি তোমার খাদ্য-খাদকের সুব্যবস্থা করার নিমিত্ত আদিষ্ট ছিলাম; কিন্তু আফসোস! অদ্য পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, ও দক্ষিণ; মোটকথা, সমস্ত ভূ-ভাগ তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু তোমার কিসমতের একটি দানাপানি পাইলাম না। কাজেই বুঝিলাম, অদ্য তোমার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে, হয়ত এখনই মরণ-সুরা পান করিতে হইবে, দুনিয়ায় আর বেশীক্ষণ থাকিবে না।

আবার অন্য একজন ফেরেশতা প্রথম ফেরেশতার ন্যায় আসিয়া সালাম করিয়া বলিবে-'হে অমুক! আমি সর্বদা তোমার পানি সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম; কিন্তু অদ্য ত্রিভুবন খুঁজিয়াও তোমার জন্য এক ফোটা পানির ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না; তাই বুঝিতে পারিলাম, মৃত্যুদূত তোমার পার্শ্বেই হাজির, এখনই হয়ত গলদেশ টিপিয়া ধরিবে।'

তৎপর আর একজন ফেরেশতা উক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের ন্যায় সালাম করিয়া বলিবে-'হে অমুক! আমি তোমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ আঞ্জামের জন্য নির্দিষ্ট ছিলাম, কিন্তু অদ্য দুনিয়ার এমন কোন স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না সেখানে গিয়া এক পলক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি।'

অনুরূপ চতুর্থ ফেরেশতা আসিয়া সালাম করিয়া বলিবে-'হে আদম সন্তান! আমি তোমার সময় কার্যের সুবন্দোবস্ত করার নিমিত্ত নিয়োজিত ছিলাম। অদ্য সমস্ত ভূ-মণ্ডল ঘুরিয়াও তোমার একটি সেকেণ্ড সময় ও কোন কার্য তালাশ করিয়া পাইলাম না। তাই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম যে, আর তুমি জিন্দা থাকিয়া নশ্বর ধরা সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পরিবে না। অদ্যই তোমাকে মরিতে হইবে।'

এই চারিজন ফেরেশতার পরে কেরামন ও কাতেবীন নামক দুইজন ফেরেশতা আচ্ছালামু আলাইকুম বলিয়া উপস্থিত হইয়া বলিবে-'হে আদম সন্তান? তোমাদের ভালমন্দ যাবতীয় কার্যাবলী লিখার জন্য আমরা আদিষ্ট ছিলাম। অদ্য আমাদের ভালমন্দ কার্যাবলী লেখা রহিত হইয়া গেল।'

এই বলিয়া ফেরেশতাদ্বয় এক টুকরা কাল লিপি বাহির করিয়া দিবে ও বলিবে, 'এই তোমার কার্যের ফলাফল, ইহা পড়িয়া দেখ।' আদম সন্তান. উক্ত লিপি দেখা মাত্র ভয়ে অস্থির হইয়া ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিবে এবং উহা পাঠ করিবার ভয়ে মুখমণ্ডল এদিক ওদিক ঘুরাইতে থাকিবে। কিন্তু উপায় কি! সময় যে শেষ, আর যে বেশী সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

একে একে সব ফেরেশতা যাবে বিদায় হয়ে,
হাজির হবেন আজরাঈল মরণ সমন লয়ে।

অতঃপর ডানে বামে দুইজন সহচর ফেরেশতাসহ যমদূত ফেরেশতা উক্ত ব্যক্তির জান কবজ করিবার জন্য উপস্থিত হইবে। ডানে যে ফেরেশতা থাকিবে তাহাকে বলা হয় রহমতের ফেরেশতা। আর বামে যে ফেরেশতা থাকিবে, তাহাকে বলা হয় আজাবের ফেরেশতা। যদি মৃত্যুবরণকারী নেককার হইয়া থাকে, তবে তাহার আত্মা অতি সহজে দুগ্ধপায়ী শিশুর মাতার স্নেহ-প্রচাপণ যন্ত্রণার ন্যায় আরামে বাহির করিবে। অন্যথা অত্যন্ত করুণ অবস্থায় আত্মা বাহির করা হইবে। মৃত্যুবরণকারীর আত্মা যখন গলদেশ পর্যন্ত পৌছিবে, তখনই মৃত্যুদূত আজরাঈল তাহার গলা টিপিয়া আত্মা বাহির করিয়া লইবে।

আত্মা বাহির করা হইলে মৃত্যুবরণকারী যদি নেককার হইয়া থাকে তবে আজরাঈল রহমতের ফেরেশতার নিকট তাহার আত্মা সোপর্দ করিয়া বলিবেন-'যাও, উহাকে নিয়া আসমানের পবিত্র শান্তিময় স্থানে রাখ।'

আর যদি মৃত্যুবরণকারী বদকার হইয়া থাকে, তবে তাহার আত্মা আজাবের ফেরেশতার নিকট দিয়া বলিবেন-'যাও, উহাকে আসমানের অশান্তিময় স্থানে নিয়া রাখ।'

নেককার মো'মেন ব্যক্তির আত্মা নিয়া রহমতের ফেরেশতা আসমানে উঠিলেই আল্লাহ্ পাকের দরবার হইতে আওয়াজ আসিবে-'হে ফেরেশতাগণ! তোমরা উহাকে তাহার মৃতদেহের নিকট অবস্থা পর্য-

বেক্ষণের নিমিত্ত লইয়া যাও।' তখন ফেরেশতাগণ আত্মাকে নিয়া মৃত-দেহের ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিবে। আত্মা ঘরের মধ্যে থাকিয়া তাহার জন্য কে-কি করিতেছে সমস্ত দেখিতে থাকিবে এমন কি মৃতদেহের জানাজার নামাজ পড়িয়া যখন কবরের দিকে লইয়া যাইবে, তখনও আত্মা মৃত-দেহের পিছনে পিছনে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করিতে থাকে।

কবরে সাওয়াল ঃ মৃতদেহকে যখন তাহার আত্মীয়-স্বজন দাফন করিয়া চলিয়া আসে, তখনই তাহার রূহকে প্রশ্ন করার সময় উপস্থিত হয়।

গোর বা কবরে সাওয়ালের স্বরূপ বিভিন্নরূপ। কাহারও মতে মৃত ব্যক্তি দুনিয়ায় যেরূপ জীবিত ছিল, কবরে পুনর্বার অনুরূপ জীবন দান করিয়া মৃতদেহের রূহের নিকট মনকির নকীর নামে দুই ফেরেশতা প্রশ্ন করিবে। আবার কেহ কেহ বলেন, দুনিয়ার ন্যায় জীবন দান করা হইবে না, বরং রূহকে দেহের বক্ষ পর্যন্ত প্রবেশ করাইবে। অতঃপর রূহের নিকট প্রশ্ন করা হইবে। কেহ কেহ ইহাও বলেন, রূহকে মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করান হইবে না বরং রূহকে মৃতদেহ ও কাফনের কাপড়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হইবে। অতঃপর মুনকির নকীর রূহকে প্রশ্ন করিবে। অতএব, সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মৃতদেহের প্রতি কবর আজাব অবশ্যই হইবে। ইহার অবিশ্বাসী প্রকৃত মো'মেনরূপে গণ্য হইতে পারিবে না।

ফিকাহ শাস্ত্রের পণ্ডিত আবুল লাইস (রহঃ) বলিয়াছেন-'যে ব্যক্তি কবরের ভীষণ আজাব হইতে রক্ষা পাইতে চাহে, তাহাকে সর্বদা চারিটি নেক কাজ করিতে হইবে এবং চারিটি গোনাহর কার্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। নেক কাজগুলি যথা-(১) যথারীতি নামাজ আদায় করা, যেন কোন সময়ই নামাজ তরক না হয়। (২) খালেছ নিয়তে দান-ছদকা করা। (৩) সর্বদা 'সোবহানাল্লাহ' বেশী পরিমাণে পড়া। (৪) সর্বদা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। এই চারি প্রকার নেক কার্য করিতে থাকিলে আশা করা যায় তাহার কবরের আজাব হইবে না। শুধু তাই নহে, আল্লাহ পাক তাহার পবিত্র নূর দ্বারা উক্ত ব্যক্তির অন্ধকার কবরকে আলোকিত করিয়া দিবেন।

যে চারিটি গোনাহর কাজ হইতে বিরত থাকিতে হইবে, তাহা এই যে- (১) মিথ্যা বলা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা হইতে সম্পূর্নরূপে বিরত থাকা। (২) কাহারও গচ্ছিত মাল আত্মসাৎ না করা। (৩) দস্যুবৃত্তি না করা। (৪) পেশাব ও পায়খানার পর টিলা-কুলুক ব্যবহার করিয়া উত্তমরূপে পবিত্র হওয়া। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন-'তোমরা পেশাব হইতে পরিস্কার থাক, কেননা কবরের অধিকাংশ আজাব পেশাব হইতে পবিত্র না থাকার দরুন হইয়া থাকে।' কবির ভাষায় শুনুন-

মোর্দাকে কবরে রেখে আত্মীয় স্বজন,
চল্লিশ কদম দূরে যায়গো যখন।
মুনকার নকীর দুই ফেরেশতা আল্লার,
তখনি হাজির হয় কবর মাঝার।
কবরে পুঁছিয়া তারা কাছেতে মুর্দার,
তিনটি ছোয়াল করে চাহেন উত্তর।

দাফনকারীগণ মৃতদেহ কবরে রাখিয়া কিছু দুর আসা মাত্র মুনকার ও নকীর নামক দুই ফেরেশতা অসামান্য শক্তি দেখাইয়া আভ্যন্তরীণ ভূ-ভাগ বিদীর্ণ করিতে করিতে কবরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তাহারা কবরে প্রবেশ করিয়াই মৃতদেহকে বসাইয়া তিনটি প্রশ্ন করিবে। প্রথমবারে জিজ্ঞাসা করিবে-'তোমার রব্ব (প্রতিপালক) কে?' দ্বিতীয়বারে প্রশ্ন করিবে-'তোমার নবী কে? তুমি কোন নবীর উম্মত?' তৃতীয়বারে প্রশ্ন করিবে-'তোমার ধর্ম কি? তুমি কোন ধর্মাবলম্বী ছিলে?'

যদি মৃতব্যক্তি নেককার হইয়া থাকে, তবে প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিয়া ফেলিবে-'আমার প্রতিপালক আল্লাহ; যাঁহার কোন শরীক বা অংশীদার নাই।' তৎপর বলিবে-'আমার নবী সায়্যেদুল মোরসালীন খাতেমুল আম্বিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)। আমি তাঁহারই একান্ত বিশ্বাসী উম্মত।' তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিবে-'আল্লাহর মনোনিত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম, আমি সেই ধর্মে একান্ত বিশ্বাসী।'

মৃতদেহের রূহ যখন মুনকীর ও নকীরের প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দিয়া দিবে, তখন আল্লাহ পাক অনতিদুর হইতে ফেরেশতাদ্বয়কে নির্দেশ দিবেন-'হে ফেরেশতাদ্বয়! উহাকে তোমাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে

হইবে না। আমি উহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা উহাকে নুতন বরের ফুলশয্যা বিছাইয়া তাহার উপরে অতি সমাদর ও সম্মানের সহিত শোয়াইয়া রাখ আর উহার কবর হইতে বেহেশত পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ করিয়া দাও, যেন সে যথাস্থানে শুইয়া বেহেশতের সুগন্ধি অনুভব করিতে পারে। আল্লাহ পাকের এই আদেশ পাওয়া মাত্র ফেরেশতাদ্বয় তাহার কবর হইতে বেহেশত পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ করিয়া দিবে। শেষ বিচারের আগে কেয়ামতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি যথাস্থানে শুইয়া বেহেশতের শান্তি পাইতে থাকিবে।

অতঃপর ফেরেশতাদ্বয় তাহার আত্মাকে লইয়া আসমানে চলিয়া যাইবে। এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র আরশের নিম্নে ঝাড়বাতির ন্যায় একরূপ নূরের দ্বারা তৈরী বাতির মধ্যে রাখিয়া দিবে। উক্ত পবিত্র আত্মা বা রূহ কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত নূরের বাতির মধ্যে অবস্থান করিতে থাকিবে।

হজরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন–(আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন) 'আমি যদি কোন বান্দাকে রহমত ও মাগফেরাত করিতে ইচ্ছা করি তবে তাহাকে শারীরিক পীড়া, দারিদ্র্যতা অথবা পারিবারিক বিষয়ে চিন্তাযুক্ত রাখি। উহাতে যদি তাহার গোনাহর ক্ষতিপূরণ না হয় তবে মৃত্যুকালে অতীব কষ্টে তাহার রূহ বাহির করিয়া থাকি, যেন গোনাহ হইতে সম্পূর্ণ পুত পবিত্র হইয়া আমার সাথে মুলাকাত করিতে পারে।

আর যদি আমি কোন বান্দাকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা না করি, তবে তাহাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েশে মশগুল রাখি এবং তাহার সামান্য নেকের বিনিময় অজস্র টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত দান করিয়া নশ্বর দুনিয়ার মোহে তাহাকে ঘুরাইয়া থাকি। যদি উহাতেও তাহার সামান্য নেকীর প্রতিদান না হয়, তবে মৃত্যুকালে তাহার রূহ অতি সহজে বাহির করিয়া দুনিয়াতেই তাহার সামান্য নেকের বদলা দিয়া আমার সমীপে নেকহীন জাহান্নামীরূপে হাজির করি।'

হাদীছ শরীফে আছে, 'যদি কোন মো'মেন ব্যক্তির পদযুগলে কিম্বা অনত্র কোথাও একটি কাঁটাও বিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ পাক উক্ত মো'মেন ব্যক্তির এই সামান্য কষ্টের বিনিময়ে তাহার আমলনামা হইতে

একটি গোনাহ মিটাইয়া তদস্থলে একটি নেকী লিখিয়া দিবেন। কাজেই কোন কোন বুযুর্গ আলেম বলেন–'যাহার শারীরিক কোন পীড়া বা অন্য কোন অশান্তি নাই, তাহার ভবিষ্যৎ তত ভাল হইতে পারে না।

এক।। মোমেনের অবস্থা ঃ হাদীছ শরীফে আছে, যখন কোন মো'মেন ব্যক্তির মৃত্যু অতি সন্নিকট হয়, তখন একদল স্বর্গীয় ফেরেশতা আসমান হইতে সূর্যের ন্যায় আলোকদীপ্ত চেহারা লইয়া জমীনে অবতীর্ণ হন। এ ছাড়া তাঁহার বেহেশতে সুঘ্রাণযুক্ত কাফনের কাপড়ও নিয়া আসেন। উহারাই আজরাঈল এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ।

তৎপর মালাকুল-মউত (আজরাঈল) মৃত্যুবরণকারীর মস্তকের কাছে উপস্থিত হইয়া বলেন–'হে পবিত্র রূহ! তোমাকে খোশ-খবরী দিতেছি, চল, আল্লাহর অসীম রহমত ও দয়ার নিকটে, তিনি তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। তোমার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন।' মালাকুল-মউতের এই কথা শুনামাত্র রূহ নীরবে নশ্বর দেহ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। রূহ বাহির হওয়া মাত্র মালাকুল-মউত উহাকে লইয়া উর্ধ্বাকাশে উঠিয়া যাইবেন। তিনি রূহ লইয়া প্রথম আসমান শেষ করিয়া দ্বিতীয় আসমানে উঠিতে না উঠিতেই তাহাদের আগমন অপেক্ষায় সপ্তম আসমানের দরজা খুলিয়া রাখা হইবে। বস্তুত, উক্ত মো'মেন ব্যক্তির নাম ইল্লিয়ীন নামক পবিত্র স্থানে ইতি পূর্বেই লেখা হইয়া থাকিবে। অতঃপর আজরাঈল তাহার রূহ লইয়া খোদার দরবারে হাজির হইবেন। আল্লাহ পাক তখনই আদেশ করিবেন–'হে আজরাঈল? মৃত ব্যক্তির রূহ মাটির নিম্নে রক্ষিত তাহার দেহের নিকট লইয়া যাও। কেননা আমি উহাদিগকে মাটি হইতে পয়দা করিয়াছি, আবার মাটি হইতে উঠাইয়া লইব।' এ মর্মে আল্লাহ বলেন–

'আমি তোমাদিগকে এই মাটি দ্বারাই পয়দা করিয়াছি, দ্বিতীয়বার এই মাটিতেই প্রত্যাবর্তন করাইব এবং সর্বশেষ এই মাটি হইতে পুনরুত্থান করিয়া হাশরের ময়দানে দণ্ডায়মান করিব।'

বান্দাহে, এই মাটির দ্বারা গড়ছি কায়া তোর,
এই মাটিতেই মরণ পরে হইবে তব গোর।
এইনা মাটি হইতে পুনঃ করিয়া উত্থান,
হাজির আমি করব তোমায় হাশর ময়দান।

আল্লাহ পাকের এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র আজারাঈল উক্ত ব্যক্তির রূহ লইয়া পুনঃ কবরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। তৎপরে মুনকার ও নকীর নামে দুই ফেরেশতা আসিয়া তাহার রূহের নিকট প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিবে। রূহ যখন ফেরেশতাদ্বয়কে সরল-সঠিক জবাবে সন্তুষ্ট করিয়া দিবেন তখন আল্লাহ পাক অনতিদুর হইতে আওয়াজ দিয়া বলিবেন ঃ

'হে ফেরেশতাদ্বয়! আমার প্রিয় বান্দা ঠিকই বলিয়াছে, উহাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে হইবে না। তোমরা বেহেশত হইতে বিছানা আনিয়া আমার বান্দার কবরে বিছাইয়া দাও, যেন তাহাকে কবরে থাকিয়া কোন প্রকার কষ্ট পোহাইতে না হয়। আর বেহেশত হইতে অতি উত্তম পরিধানীর বস্ত্র আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দাও এবং তাহার কবর হইতে বেহেশত পর্যন্ত একটা দরজা খুলিয়া দাও যেন আমার বান্দা কবরে থাকিয়া বেহেশতের খোশবু প্রাপ্ত হইয়া বেহেশতী অনুপম সুখ অনুভব করিতে পারে।

ঈমানদারের কবর যেন টুকরা বেহেশতের,
আরাম ছাড়া সেথায় কোন লেশ নাহি দুঃখের।
খোদার নূরে সেই যে কবর হবে গো রৌশন,
জান্নাতেরি সঙ্গে তাহার হবে সুড়ঙ্গ তোরণ।
জান্নাতেরি ফরাশ বিছান দিবে সেথায় পাতি,
রইবে মুমিন সেই খানেতে মন হরষে মাতি।

আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে আরও হুকুম করিবেন-'হে ফেরেশতা-গণ! আমি আমার বান্দার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, কাজেই আমার বান্দার সীমার চতুর্দিক পর্যন্ত তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দাও যেন সে কবরে কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করে।'

ফেরেশতাগণ উক্ত মো'মেন ব্যক্তির যাবতীয় সুখ-শান্তির জন্য এই সকল কাজ করিয়া শেষ করিলে ইত্যবসরে একজন অপূর্ব লাবণ্যময়ী চেহারার আকৃতি বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের সুগন্ধিযুক্ত পোষাক পরিধান করিয়া উক্ত মো'মেন ব্যক্তিকে সুসংবাদ প্রদান করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। মৃত মো'মেন ব্যক্তি এইরূপ অপূর্ব সন্দর চেহারাযুক্ত লোকটিকে দেখিয়া বলিবে-'আপনি কে? আপনার ন্যায় এইরূপ অপূর্ব সৌন্দর্যময়

শ্রীমান জীবনে আর একজনও ত দেখি নাই। বলুন, আপনি কে?' তদুত্তরে উক্ত ব্যক্তি বলিবে-'আমি আপনার নেক আমল।'

দুই।। কাফেরের অবস্থা ঃ মৃত্যুবরণকারী কাফের বা পাপী হইলে তাহার মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আসমান হইতে একদল ফেরেশতা আজাবজনিত বস্ত্রাদি লইয়া জমীনে অবতীর্ণ হইবে এবং উক্ত পাপী মৃত্যু বরণকারীকে উহা পরিধান করাইবে, ফলে মৃত্যুবরণকারীর মৃত্যু যন্ত্রণা ইহাতে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। অতঃপর মালাকুল-মউত উক্ত ব্যক্তির মস্তকের নিকট বসিয়া কলে ইক্ষু পিষিবার ন্যায় অসহনীয় কষ্ট সহকারে তাহার রূহ বাহির করিবে। রূহ বাহির করিবার সময় উক্ত ব্যক্তি এরূপ নির্মম আর্তনাদ আরম্ভ করিবে যে, তাহা মানব-দানব ব্যতীত অন্যান্য সকল সৃষ্টজীব শুনিতে পাইবে। এতদ্ব্যতীত তাহার রূহ বাহির করা হইলে আল্লাহ এবং তাঁহার যাবতীয় সৃষ্টজীব তাহার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকিবে। এমন কি, ফেরেশতাগণ তাহার রূহ লইয়া আসমানে পৌছিবার পূর্বে আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করিবেন-

'হে ফেরেশতাগণ! উক্ত পাপীর অপবিত্র রূহ লইয়া আসমানে আসিও না বরং উহাকে কবরে তাহার মৃতদেহের কাছে নিয়া রাখ।'

ফেরেশতাগণ তখন উক্ত ব্যক্তির রূহ কবরে তাহার মৃতদেহের নিকট পৌছাইয়া দিবে। অতঃপর মুনকার-নকীর দুই ফেরেশতা মেঘের ন্যায় তীব্র গর্জন সহকারে সূর্যের ন্যায় দীপ্ত চক্ষুদ্বয় রাঙ্গাইতে রাঙ্গাইতে ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করিয়া উক্ত ব্যক্তির সম্মুখে হাজির হইবে। মুনকার নকীর দুই ফেরেশতা ঐ ভয়ঙ্কর আকৃতিতে উক্ত ব্যক্তিকে বসাইয়া দাঁত কাটিতে কাটিতে জিজ্ঞাসা করিবে-'তোমার রবব (প্রভু) কে? তদুত্তরে উক্ত ব্যক্তি বলিবে-'আমি জানি না।' এইরূপ উত্তরে ফেরেশতাদ্বয় রাগান্বিত হইয়া মস্ত বড় একটা গুরুজ দ্বারা তাহাকে এমন জোরে আঘাত করিবে যে, আঘাতে ফলে চূর্ণ হইয়া তাহার এক পাশের হাড় অন্য পাশে চলিয়া যাইবে।

ইহার পরে নাক ফ্যাটা, সরু গ্রীবা, হাড়ির ন্যায় বড় পেট ও কঞ্চির ন্যায় সরু হাঁটু বিশিষ্ট একজন কুশ্রী ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিবে 'আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন'। তুমি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করিতে অত্যন্ত অসল ও ভীরু ছিলে, কিন্তু

গোনাহর কার্য করিতে ছিলে অত্যন্ত চালাক ও পটু। একটা করিতে গিয়া আরও একটা বেশি করিয়া ফেলিতে। দেখ, আজ হইতে তোমার কি দুরবস্থা ঘটে! পাপী মৃত্যুবরণকারী ইহা শুনামাত্র বলিবে-'ভাই, তুমি কে?' জীবনে তোমার ন্যায় এমনতর কুশ্রী মানুষত আর একটিও দেখি নাই, একবার বল তুমি কে?' তদুত্তরে উক্ত ব্যক্তি বলিবে-'হে পাপীষ্ঠ। শুনিয়া আর লাভ কি? আমি যে তোমার কৃত পাপ কার্য-'বদ আমল'।

অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের আদেশ মত উক্ত পাপী ব্যক্তির কবর হইতে দোজখের দ্বার পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ করিয়া দিবে। পাপী মৃত ব্যক্তি তাহার সংকীর্ণ অন্ধকারময় কবরে থাকিয়া দোজখ দর্শন করিতে থাকিবে এবং সেখানে থাকিয়া দোজখের আজাব কেয়ামত পর্যন্ত অনুভব করিতে থাকিবে।

হাদীছ শরীফে আছে-যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবার কিংবা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে ইন্তিকাল করে তবে আল্লাহ পাক তাহাকে কবরের ফেৎনা আজাব হইতে রক্ষা করিবেন।

ইমাম বাহিলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-যখন মৃত পাপী ব্যক্তিকে কবরে রাখিয়া লোকজন কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পড়ে, তখন একজন আজাবের ফেরেশতা উক্ত ব্যক্তির মাথার দিক হইতে এমন জোরে গুরজ মারিবে যে, তাহাতে তাহার সমস্ত অন্ত-প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িবে। অতঃপর তাহার কবরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বলিবে-'হে অমুক! আল্লাহর আদেশে উঠিয়া বস।' মৃত ব্যক্তি ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিয়া বসিবে ও ফেরেশতার অদ্ভুত আকৃতি এবং আজাবের প্রস্তুতি দেখিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে থাকিবে। মৃত ব্যক্তির এইরূপ চীৎকার মানব-দানব ব্যতীত আর সমস্ত সৃষ্টজীব নিঃসন্দেহে শুনিতে পাইবে।

ফেরেশতার এইরূপ আজাব দেখিয়া উক্ত ব্যক্তি বলিবে-'হে ভাই ফেরেশতা! আপনি আমাকে কেন এইরূপ কষ্ট ও আজাব প্রদান করিতেছেন? আমি দুনিয়ায় থাকিয়া আল্লাহর আদেশানুযায়ী যথারীতি নামাজ আদায় করিয়াছি, যাকাত দিয়াছি ও রমজান মাসে ত্রিশটি রোজা রাখিয়াছি, কেন তবু আমার উপর এইরূপ নির্মম ব্যবহার করিতেছেন?' ফেরেশতা তদুত্তরে বলিবে-'রে পাপীষ্ঠ! তোমার কি মনে নাই যে, একদা

একজন মজলুম বা অত্যাচারিত অসহায় ব্যক্তি তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু সাহায্যে শক্তি থাকা সত্তেও তুমি তাহাকে সাহায্য কর নাই। আর তুমি নামাজ পড়িতে সত্য কিন্তু অমুক নামাজ পড়িবার পূর্বে পেশাব হইতে উত্তমরূপে পরিষ্কার না হইয়াই নামাজ পড়িয়াছিলে। তাই অদ্য তোমার উপর এই শাস্তি হইতেছে।'

হাদীছ শরীফে আছে-যদি কোন ব্যক্তি কোন মজলুম অসহায়কে শক্তি থাকা সত্তেও সাহায্য না করে তবে কবরের মধ্যে তাহাকে অগ্নি নির্মিত কোড়া দ্বারা প্রহার করা হইবে।' হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করিয়াছেন-চারি শ্রেণীর লোককে আল্লাহ পাক তাঁহার অসীম রহমতের ছায়াতলে স্থান দিবেন এবং অতি সৌন্দর্যময় নূরের আসনে উপবেশন করাইবেন। ছাহাবাগণ হজরতের সমীপে আরজ করিলেন-'ইহা রাসূলাল্লাহ! উহারা কোন লোক?' হজরত (ছঃ) উত্তর করিলেন-'যাহারা ক্ষুধার্তকে অন্নদান করিয়াছে, মোজাহিদগণে (ইসলাম প্রতিষ্ঠাকারী যোদ্ধাগণে) সম্মানের চক্ষে দেখিয়াছে, অসহায় গরীব লোককে সাহায্য করিয়াছে ও যাহারা মজলুমদের সাহায্যার্থে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, উহারাই এইরূপ সম্মানের অধিকারী হইবে।'

হজরত আনাস ইবনে মালিকের বর্ণিত হাদীছ মারফত জানা যায়, কোন পাপী মৃত ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়-স্বজন মাটি দিয়া কিছু দূর চলিয়া আসার সাথে সাথে আজাবের ফেরেশতা তাহাকে আজাব দিতে আরম্ভ করে। আর যদি তাহার আত্মীয়-স্বজনগণ বিলাপ করিয়া এইরূপ কাঁদাকাটি করে-'হায়! আমাদের সর্ব সম্মানিত শ্রেষ্ঠ লোক; হায়! আমাদের শরীফ ব্যক্তি' তখন আজাবের ফেরেশতা তাহাকে কোড়ার দ্বারা দ্বিগুণ প্রহার করিতে থাকিবে এবং বলিবে—'হে পাপীষ্ঠ" উহারা কি বলিতেছে? তুমি নাকি তাদের মধ্যে শরীফ (সম্মানিত) ব্যক্তি ছিলে?' উত্তরে সে ব্যক্তি করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিবে, 'হে ভাই ফেরেশতা-আমি তাহাদের মধ্যে কখনই শরীফ ছিলাম না বরং উহারা আমাকে শরীফ বলিয়া ডাকিত।' আজাবের ফেরেশতা অতঃপর অত্যধিক কঠিনভাবে আজাব দিতে আরম্ভ করিবে-আজাবের মাত্রা দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে এবং বলিতে থাকিবে, দেখ, আজাবের মজা কেমন

নির্মম।' ইহাতে সে পাপী ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে- 'হায় আফসোস! কিভাবে হাড্ডি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিতেছে; হায় দুঃখ! ইহা কিরূপ দুঃখ-কষ্টের স্থান; হায় সর্বনাশ! কিভাবে কঠিন প্রশ্ন করিতেছে?

হাদীছ শরীফে আছে-যে ব্যক্তি রজব চান্দের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত-বন্দেগী করিবে, আল্লাহ পাক এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ফেরেশতাগণকে আওয়াজ দিয়া বলিবেন-'হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষ্য থাক, আমি ঐ লোকের ছোট বড় সকল প্রকার গোনহ মাফ করিয়া দিলাম।'

--০--

মুনকার—নকীরের আগে একজন ফেরেশতার কবরে প্রবেশ

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে একদা রাসূলে পাক (ছাঃ) সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন-'হে ইবনে সালাম! মুনকার-নকীরের পূর্বে 'রুমাত' নামে সূর্যের ন্যায় দীপ্ত আলোকময় চেহারা বিশিষ্ট একজন ফেরেশতা মুর্দারের নিকট কবরে প্রবেশ করিবে। উক্ত ফেরেশতা কবরে প্রবেশ করিবামাত্র শবদেহকে বসাইয়া বলিবে-'তোমার কৃত পাপ-পুণ্যের যাবতীয় কার্যাবলী লিপিবদ্ধ কর।' মুর্দার তখন বলিবে-'আমার নিকট কাগজ-কলম-কালি বলিতে কিছুই নাই; কিরূপে লিখিব?' ফেরেশতা বলিবে-'তোমার মুখের থু থু দ্বারা কালি, অঙ্গুলী দ্বারা কলম এবং কাফনের কাপড় দ্বারা কাগজ বানাইয়া তদ্বারা লিখ।

ফেরেশতার আদেশে উক্ত মৃত ব্যক্তি তাহার কৃত যাবতীয় আমল লিখিতে আরম্ভ করিবে। লিখিতে লিখিতে যখন তাহার পুণ্যের যাবতীয় কার্যাবলী লিখিয়া শেষ করিবে, তখন আর কিছু লিখতে অগ্রসর হইবে না। ফেরেশতা তখন বলিবে-'তোমার কৃত পাপ কার্যাবলীও লিপিবদ্ধ কর!' ইহাতে উক্ত ব্যক্তি খুব লজ্জিত হইবে। ফেরেশতা পুনরায় বলিবে-'দুনিয়ায় থাকিয়া আল্লাহ পাকের সমীপে গোনাহের কাজ করিতে মোটেও লজ্জা পাও নাই, এখন লিখিতে লজ্জা কর কেন?' ইহা বলিয়াই ফেরেশতা

একটি প্রকাণ্ড গুরজু উঠাইয়া তাহার প্রতি আঘাত করিতে থাকিবে। বাধ্য হইয়া উক্ত মুর্দার তাহার কৃত যাবতীয় পাপ কার্যাদিও লিখিয়া দিবে।

অতঃপর সেই ফেরেশতা বলিবে 'হে পাপীষ্ঠ! তোমার লিখিত লিপি-খানা উত্তমরূপে গুটাইয়া উহাতে তোমার নিজ নখের দ্বারা সীলমোহর কর।' ফেরেশতার আদেশ মতে সে তাহাই করিবে। তৎপর ফেরেশতা সিলমোহরকৃত লিপিকার তাবিজখানা সেই লোকের গলায় লটকাইয়া চলিয়া যাইবে এবং শেষ বিচারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপ অবস্থায় ঝুলানো থাকিবে। ইহার প্রমাণ কোরআন শরীফে আছে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

'সমস্ত মানুষের গলায় আমি তাহার কিসমৎ ঝুলাইয়া দিয়াছি।'

রুমাত ফেরেশতা মুর্দার লিখিত আমলনামা কবজ করিয়া তাহার গলায় ঝুলাইয়া যাওয়ার কিছু পরেই মুনকার-নকীর নামে দুই ফেরেশতা কবরে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিবস এই শ্রেণীর লোককে বলিবে-'হে অমুখ! অদ্য তোমার আমলনামাখানা পড়িয়া শুনাও।' অমনি বান্দা তাহার যাবতীয় নেক আমলসমূহ পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু যখন সে তাহার বদ আমলের নিকট আসিবে, তখনই পড়া বন্ধ করিয়া চুপ করিবে। আল্লাহ বলিবেন-'হে অমুক! এখন পড়িতেছ না কেন!' বান্দা উত্তর করিবে-'হে রাব্বুল আ'লামীন! অশ্লিল বাক্য আপনার সমীপে উচ্চারণ করিতে বড়ই লজ্জা হয়।' আল্লাহ বলিবেন-'হে পাপীষ্ঠ! দুনিয়ায় থাকিয়া আমার সমীপে ঐরূপ অশ্লিল কার্য করিতে লজ্জা ও ভয় পাও নাই, অদ্য লজ্জার কারণ কি?' বান্দা তখন লজ্জায় জড়ষড় হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দাঁড়াইবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন-

'ওহে ফেরেশতারা! তোমরা উহাকে ধর এবং উহার গ্রীবায় বেড়ি পড়াইয়া দোজখে নিক্ষেপ কর।'

মুনকার—নকীরের কথা

রুমাত ফেরেশতা তাহার দায়িত্বে অর্পিত কাজ শেষ করিয়া মুর্দার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পর পরই কবরে মুনকার-নকীর নামক

ফেরেশতার আগমন হইবে। এই সম্পর্কে হাদীছের তথ্যে জানা যায়, 'মো'মেন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখিয়া লোকজন চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে দুইজন ফেরেশতা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া কবরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তাহাদের গর্জন মেঘের গর্জনের ন্যায় বিকট এবং চক্ষুদ্বয় দেখিতে নীল বর্ণ। উহাদিগকে বলা হয় মুনকার-নকীর ফেরেশতা ফেরেশতাদ্বয় ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করিয়া ভীষণ গর্জন করিতে করিতে মৃতদেহের শিয়রের দ্বার দিয়া কবরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। নামাজ তখনই রুদ্ধদ্বারের ন্যায় প্রতিবন্ধকরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিবে-'হে ফেরেশতাদ্বয়। তোমরা কখনও এই পবিত্র মস্তকের দিক হইতে কবরে প্রবেশ করিয়া রূহকে প্রশ্ন করিতে পারিবে না। যেহেতু এই মো'মেন ব্যক্তি দুনিয়ায় থাকিয়া এইরূপ কঠিন প্রশ্নের ভয় ও ভয়ঙ্কর সময়ের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কষ্টকে কষ্ট মনে না করিয়া দিবারাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনীত সেজদায় পড়িয়া থাকিত। কাজেই তোমরা এই দিক হইতে কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ফেরেশতাদ্বয় উপায় না দেখিয়া দক্ষিণ হস্তের দিক হইতে কবরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। এইবারে মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে যে সকল দান-ছদকা করিয়াছিল, সেই দান-ছদকা প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রুক্ষ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিবে-'হে ফেরেশতাদ্বয়! তোমাদের মতলব বুঝিতে পারিয়াছি, হুশিয়ার! এদিক হইতেও কবরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যেহেতু মো'মেন ব্যক্তি এইরূপ ভয়াবহ সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় কবরের আজাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সর্বদা মুক্ত-হস্তে দান-ছদকা করিত! কাজেই উহাকে প্রশ্ন করিতে এই পথে কোনক্রমেই প্রবেশ করিতে দিব না। দরকার হয় অন্য উপায় তালাশ কর।'

তৎপর মুনকার-নকীর ফেরেশতাদ্বয় আবার মুর্দারের বাম হাতের দিক হইতে কবরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। রোজা তখন তাহাদের সম্মুখে প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে-'রে মুনকার-নকীর। এদিক হইতেও আসিতে পারিবে না। যেহেতু এই ব্যক্তি জীবিতকালে আল্লাহর এবং কবরের আজাবের ভয়ে অস্থির হইয়া কাঠফাটা রৌদ্রে সারাদিন রোজা রাখিয়া পানাহার করিতে না পারায় একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল,

তাই অদ্য তোমাকে এই রাস্তা দিয়া কখনই কবরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।'

ফেরেশতাদ্বয় এইরূপে ডান ও বাম দিক হইতে বিমুখ হইয়া শেষ বারের মত মুর্দারের পদদ্বয়ের দিক হইতে তাহাকে প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে কবরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। এইবারও জুমুআর নামাজ তাহাদেরকে বাধা দিয়া বলিবে-'এই পথ দিয়াও তোমরা প্রশ্ন করিবার জন্য কবরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যেহেতু এই মো'মেন ব্যক্তি এইরূপ সংকীর্ণ অন্ধকারময় কবরের আজাবের ভয়ে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে পদব্রজে জুমুআর নামাজ পড়িবার জন্য যাতায়াত করিত। কাজেই এই পথ দিয়াও কবরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।'

সর্বশেষে মুনকার-নকীর ফেরেশতাদ্বয় বিফল হইয়া গোরবাসী মো'মেন ব্যক্তির নেক আমলসমূহ-নামাজ, দান-ছদকা, রোজা ও জুমাআ ইত্যাদির কাছে করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিবে-'হে শবদেহ রক্ষীগণ! আমরাও উহার প্রতি অত্যন্ত সদয় ও দয়াশীল। আমরা আল্লাহর আদেশে সরল ও সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া চলিয়া যাইব।' ফেরেশতাদ্বয়ের এই প্রকার অনুরোধে জুমুআ শবদেহের পদদ্বয়ের দিক হইতে কবরে প্রবেশ করিবার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিবে। তাহারা মো'মেন ব্যক্তির কবরে প্রবেশ করিবামাত্র মৃতদেহের রূহকে জিজ্ঞাসা করিবে-'আপনি জীবিতকালে আল্লাহ ও হজরত মোহাম্মদের (ছঃ) প্রতি কিরূপ মনোভাব রাখিতেন?' তদুত্তরে মো'মেন শবদেহ রূহ বলিয়া উঠিবে—

'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ অরাসূলুহূ'—

'আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় মা'বুদ কেহ নাই; আর নিঃসন্দেহে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) আল্লাহর অনুগত বান্দা ও তাঁহার রাসূল।'

ফেরেশতাদ্বয় উক্ত ব্যক্তির এই প্রকার প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাইয়া তাহাকে সসম্মানে অতিশয় আদরের সহিত ফুল বিছানার শোয়াইয়া চলিয়া যাইবে।

তথ্য–কথা ঃ

মুনকার–নকীরের প্রশ্নের রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন যে— আল্লাহ পাক আদমকে (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাগণকে একত্রিত করিয়া আদম সৃষ্টির অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়াছিলেন। ফেরেশতাগণ আদম সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া আল্লাহর দরগাহে আরজ করিয়াছিল-'হে মা'বুদ! কেন আবার এইরূপ রক্ত-মাংস বিশিষ্ট আহার গ্রহণকারী জীব সৃষ্টি করিতে চাহেন? আমরাই তো সর্বদা আপনার গুণকীর্তন, তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকি।' আল্লাহ পাক ফেরেশতা-গণকে বুঝাইয়া বলিলেন—

'আমি আদম সৃষ্টির রহস্য যাহা জানি, তাহা তোমরা জান না।'— তোমাদের তা জানারও কথা নয়।

আল্লাহ পাক আদম সন্তানের মরণের পর মুনকার–নকীর নামে দুইজন ফেরেশতাকে তাহাদের কলেমা এবং ঈমানের আদর্শসমূহ শ্রবণ করতঃ অন্যান্য ফেরেশতাগণের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত কবরে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ পাকের দুইজন ফেরেশতাকে একত্রে কবরে প্রেরণের কারণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে যে, ইসলামী বিধানানুযায়ী দুইজনের সাক্ষ্য ব্যতীত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। মোটকথা, ফেরেশতাদ্বয় মৃত মো'মেন ব্যক্তির প্রশ্নের সঠিক জবাব পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আসিয়া তাহার ঈমানের দৃঢ়তা এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে অটল বিশ্বাসী বলিয়া আল্লাহ পাকের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

ইহাতে আল্লাহ পাক আদম সৃষ্টির গৌরব বর্ধনকল্পে ফেরেশতাগণকে সাদরে ডাকিয়া বলিলেন—

'হে ফেরেশতাগণ! আমি আমার প্রিয় বান্দাকে মৃত্যু সুরা পান করাইয়া তাহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি অন্যের মধ্যে বিতরণ করিয়াছি, তাহার স্ত্রীকে বিধবা করিয়াছি, শিশু-সন্তানকে ইয়াতীম করিয়াছি এবং তাহার দাস-দাসীকে হস্তান্তর করিয়াছি। এমন কি, কবরের সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানেও অত্যধিক যাতনা ও ক্লেশে রাখিয়াছি; তাহা সত্তেও আমার বান্দা আমাকে ভুলে নাই। শুধু কি তাই। মুনকার–নকীরের কঠিন প্রশ্নের কালেও আমার প্রিয় বান্দা করুণ কণ্ঠে আমারই নাম স্মরণ করিয়াছে এবং আমার

একত্ববাদ কলেমা তাহাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছে। তাই বলি, হে ফেরেশতাগণ! এখন চিন্তা কর, কেন আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং কেনই বা বলিয়াছিলাম-'আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা জান না।'

ফেরেশতাগণ তখন লজ্জায় সংকীর্ণ হইয়া যাইবে-অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং তাহাদের ভ্রান্ত উক্তির স্মরণ করিবে।

--০--

কিরামন—কাতিবীনের কথা

হাদীছ শরীফে আছে-মানুষের সাথে সর্বদা দুইজন ফেরেশতা বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যে একজন মানুষের ডান পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মানু-ষের কৃত যাবতীয় নেক কার্যাদি সাক্ষ্যহীন লিপিবদ্ধ করিতে থাকে। আর অন্য একজন বাম পার্শ্বে অবস্থান করিয়া ডান পার্শ্বের ফেরেশতাকে সাক্ষী রাখিয়া বান্দার কৃত যাবতীয় পাপ কার্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে। এই দুই ফেরেশতাকেই বলা হয় কিরামান কাতিবীন।

কেরামন, কাতেবীন ফেরেশতা দু'জন,
মানুষের সঙ্গে রহে সদা সর্বক্ষণ।
পাপ–পূর্ণ ভাল-মন্দ যা করে বান্দায়,
সবি লিখে রাখে তারা আমলনামায়।

যখন মানুষ অনড় উপবেষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তখন কিরামন কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় মানুষের ডান ও বাম পার্শ্বে অবস্থান করে; আর যখন যাতায়াত ও চলাফেরা করিতে থাকে, তখন ফেরেশতাদ্বয় সামনে ও পিছনে অবস্থান করিয়া থাকে। আর যখন মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের একজন নিদ্রিত ব্যক্তির মস্তকের নিকটে, অপরজন পায়ের নিকটে অবস্থান করিয়া তাহাকে রক্ষাণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

অন্য এক হাদীছে আছে-দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা মানুষের দেহরক্ষী পাঁচজন ফেরেশতা মওজুদ আছে, তন্মধ্যে দুইজন দিবাভাগে, রাত্রে দুই জন এবং একজন দিবারাত্র সকল সময় অবস্থান করিয়া থাকে। এই মর্মে আল্লাহ পাক বলেন-

'মানুষের সম্মুখে এবং পশ্চাতে আল্লাহ পাকের কতক ফেরেশতা আছে, উহারা মানুষকে তাহাদের ধ্বংসকারী শত্রু-জিন-শয়তান ও মানুষ হইতে আল্লাহর হুকুমে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

আল্লাহর রাসূল বলেন-মানুষের ডান পার্শ্বে যে ফেরেশতা অবস্থান করিয়া থাকে, মানুষ যখন কোন নেক কার্য করিতে দৃঢ় সংকল্প করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা একটি নেক কার্যের পরিবর্তে এক বা একাধিক ছওয়াব তাহার আমল-নামায় লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে। আর যখন মানুষ গোনাহর কার্য করিয়া বসে, তখন বাম পার্শ্বের ফেরেশতা তাহার আমলনামায় উক্ত গোনাহর কার্য লিখিবার জন্য উদ্যত হয়। এতদ্দর্শনে ডান পার্শ্বের ফেরেশতা বাধা দিয়া বলে-একটু অপেক্ষা করুন, দেখুন উক্ত ব্যক্তির স্বীয় পাপমোচন কল্পে তওবা করে কি না। বাম পার্শ্বের ফেরেশতা উক্ত ব্যক্তির তওবার প্রতিক্ষায় ৭ ঘন্টা অপেক্ষা করিতে থাকে। বান্দা এই সময়ের মধ্যে পাপমোচন কল্পে তওবা করিলে তাহার আমলনামায় আর গোনাহ লিখে না। অন্যথায় একটি গোনাহের পরিবর্তে মাত্র একটি গোনাহ তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে।

মানুষ যখন তাহার আয়ুর শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং লোক জন মৃতদেহ কবরে রাখিয়া চলিয়া আসে, তখন উক্ত কিরামান-কাতিবীন নামক ফেরেশতাদ্বয় আল্লাহ পাকের সমীপে করজোর মিনতি করিয়া বলে-'হে রাববুল আ'লামীন! আপনি আমাদিগকে উক্ত ব্যক্তির পাপ পুণ্যের আমল লিখিবার জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; কাজেই আমরা তাহার নিকট থাকিয়া আর কি করিব? আজ হইতে তাহার আমল লেখার কার্য শেষ হইয়াছে এখন আমাদিগকে আসমানে উঠিতে আদেশ করুন।'

এদতশ্রবণে আল্লাহ পাক উত্তর করিবেন-'না, এখনও তোমাদের কার্য শেষ হয় নাই। আসমানে আসিয়া কি করিবে? তোমাদের থাকার মত স্থান আসমানে নাই, আসমান ফেরেশতায় একেবারে পরিপূর্ণ, তাহারা সর্বদা আমার জিকের-আজকার, তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল আছে। তোমরা বরং আমার প্রিয় বান্দার নিকট অবস্থান কর, যতদিন না আমার বান্দাকে রোজ হাশরে হিসাব-নিকাশের জন্য উঠাই। তথায় তোমরা অবস্থান

করিয়া তাহাদের মাগফেরাতের জন্য আমার নিকট সবর্দা তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদি পড়িতে থাক এবং আমার বান্দার জন্য মাগফেরাত কামনা করিতে থাক।'

কিরামান-কাতিবীন আল্লাহর এই নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা উক্ত ব্যক্তির জন্য দোয়া মাগফেরাত করিতে থাকে।

কিরামান-কাতিবীন ফেরেশতাদ্বয়কে এজন্য কিরামান-কতিবীন বলা হয়, বান্দা যখন নেকীর কার্য করে তখন উক্ত ফেরেশতাদ্বয় আল্লাহর দরবারে বান্দার নেক কার্যের খোশখবরী বহন করিয়া সানন্দে উপস্থিত হয় এবং বান্দার নেক কার্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। আর যখর বান্দা ভুলক্রমে গোনাহর কার্য করিয়া বসে, তখন তাহারা অতিশয় দুঃখিত ও অনুতপ্ত ভাবে আল্লাহর দরবারে মুখ মলিন করিয়া হাজির হয়। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে কিরামন-কাতিবীন' তোমাদের এইরূপ মলিন মুখ কেন? আমার বান্দা কি কোন গোনাহের কার্য করিয়াছে? তখন. তাহারা কোন প্রকার উত্তর না করিয়া ইলাহির দরবারে অধঃমুখে দাঁড়াইয়া থাকে।

এই প্রকারে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে একবার দুইবার জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তাহারা কোন প্রকার উত্তর না করিয়া মলিনমুখে কাঠের পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে। আল্লাহ পাক যখন তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করেন-'হে ফেরেশতাদ্বয়! তোমাদের কি হইয়াছে? কেন এইরূপ মলিন মুখে চুপ-চাপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছ?' তখন ফেরেশতাদ্বয় করুণ কণ্ঠে উত্তর করে-'হে খোদা! আপনার এক নাম সাত্তার বা অন্যায় গোপনকারী, আপনি আপনার বান্দাদিগকে নির্দেশ করিয়াছেন একের অন্যায় ও অপরাধ অন্যের নিকট গোপন করিতে, তাই আমারও আজ উক্ত বান্দার অন্যায় প্রকাশ করিতে শরম বোধ করিতেছি।'

'এতদ্ব্যতীত উহারা প্রত্যহ তোমার বাণী কোরআন মজিদ পাঠ করিয়া আমাদের প্রশংসা করিতেছে এবং আমাদের কিরামন-কাতিবীন বলিয়া সম্বোধন করিতেছে; তাই আমরা কামনা করি, আপনার বান্দার গোনাহ কার্যসমুহ গোপন করিয়া রাখুন। যেহেতু আপনিই একমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বময় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আপনি নিজেই বলিয়াছেন-

'অইন্না আলাইকুম লাহা-ফিজীনা কিরামান কাতেবীন'-আমি কিরামন কাতেবীন দুই ফেরেশতা তোমাদের হিফাজতের জন্য নিদিষ্ট রাখিয়াছি।'

মানুষের দুঃখ দুদর্শা আছে যতেক মুছীবত,
কেরামান-কাতেবীন ফেরেশতা করে হেফাজত।

--০--

রূহের নিজ বাড়ি ও কবরে প্রত্যাবর্তন

হাদীছ শরীফে আছে-মানুষের মরণের তিন দিন পরে তাহার রূহ আল্লাহর সমীপে আরজ করে-'হে খোদা! আমার মৃতদেহকে পর্যবেক্ষণ করিতে ইজাজত দিন!' দয়াময় খোদা তাহাকে তাহার মৃতদেহ দর্শন করিবার জন্য ইজাজত করিবেন। আত্মা এইরূপ ইজাজত পাইয়া কবর মৃতদেহের নিকট প্রবেশ করিয়া দেখিবে ঃ তাহার নাকের ছিদ্র ও মুখ হইতে রক্ত-মাংস পঁচা পানি প্রবাহিত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। ইহাতে রূহ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে ঃ

হে আমার বাসস্থান শরীর! হে আমার প্রিয় বন্ধু শরীর! এইরূপ ভয়ংকর অন্ধকারময় মছীবতের ঘরে থাকিয়া, চিন্তা দুঃখের ঘরে বসবাস করিয়া,এইরূপ লজ্জাকর তাকলীফের ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া; তোমার কি সেই দুনিয়ার সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েশের কালযাপনের কথা মনে পড়ে না? হায়! কেন আজ তোমার এ দুর্দশা?' আত্মা এইভাবে কয়েকবার বিলাপ করিয়া নিজ স্থানে চলিয়া যাইবে।

আবার আত্মা মৃত্যুর পঞ্চম দিবসে আল্লাহ নিকট হইতে আদেশ লইয়া কবর হইতে অনতিদুরে দাঁড়াইয়া মৃতদেহের অবস্থা দেখিবে ঃ তাহার নাকের ছিদ্র, মুখ কানের রাস্তা হইতে রক্ত-মাংস পঁচিয়া গলিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছে এবং মৃতদেহের শরীর এখন আর পূর্বের শরীর নাই-শরীর ফাটিয়া গিয়াছে। রূহ দুর হইতে এই দুরবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে-

'হে আমার বাসস্থান শরীর! এই দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-তাকলীফ ও সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে থাকিয়া, দংশনকারী পোকা ও বিচ্ছুর ঘরে থাকিয়া তোমার কি দুনিয়ার সেই আরাম-আয়েশ ও সুখভোগের কথা মনে পড়ে না? আজ যে তোমার সেই সুন্দর কান্তিময় শরীর কীট-পতংগের আহার্য দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়াছে? আজ তোমার দেহের সুন্দর লাবণ্যময় চামড়া ফাটিয়া রক্ত-পূঁজ গড়াইয়া মাটিতে পড়িতেছে। আজ যে তোমার সেই সুন্দর সুন্দর অঙ্গসমূহ মাটিতে পড়িতেছে।' অতঃপর রূহ মাথায় করাঘাত করিয়া বলিবে, 'হায়রে আমার সোনার শরীর! হায়! হায়! আমার সুন্দর দিব্বির কান্তিময় শরীর'-এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রূহ নিজ বাসস্থানে প্রস্থান করিবে।

আবার রূহ সপ্তম দিবসে আল্লাহর নিকট ইজাজত চাহিয়া মৃতদেহকে দর্শন করিতে আসিবে। অদ্য রূহ কবরের নিকট আর আসিবে না, বহু দুর হইতে দেখিবে যে, মৃতদেহে পোকা পড়িয়াছে এবং দেহ পোকায় খাইয়া প্রায় শেষ করিয়াছে। উহা দেখিয়া রূহ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে-

'হে আমার প্রিয় শরীর! তোমার কি দুনিয়ায় সেই সুখ ভোগের কথা মনে পড়ে না? তোমার সেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদিগণের কথা কি মনে পড়ে না? তোমার কি সেই বিশাল ধন-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, মাল-দৌলত ইত্যাদির কথা মনে পড়ে না? কোথায় গেল তোমার সেই ভাই-বন্ধু, কোথায় গেল তোমার সেই আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, কোথায় গেল তোমার পাড়া-প্রতিবেশী, কোথায় গেল তোমার সাধের সেই ধন-দৌলত, সকলই যে তুমি হারাইয়াছ, এখন তোমার কি দুরবস্থা? কে তোমার এই দুঃখ মোচনের জন্য আত্মোৎসর্গ হইবে? সবই যে কালে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে।' রূহ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে চিরদিনের মত চলিয়া যাইবে-কেয়ামত পর্যন্ত আর আসিবে না।

ছাহাবী আবু হুরাইরা ফরমান-যখন কোন মো'মেন ব্যক্তি পরলোক গমন করে, তখন তাহার রূহ একমাস যাবৎ তাহার ঘরের চতুপার্শে ঘুরাফিরা করে এবং দেখিয়া বেড়ায় যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল-দৌলত তাহার উত্তরাধিকারীগণ কিরূপ বন্টন করিয়া নেয় আর দেখিয়া বেড়ায় যে, তাহার কর্জাদি কিরূপে পরিশোধ করে।

এই প্রকার আত্মা প্রায় একমাস পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির ঘরের চতুষ্পার্শে ঘুরাফিরা করিয়া অবশেষে রূহ আবার মৃত ব্যক্তির কবরের চতুষ্পার্শে ঘুরাফিরা করিয়া দেখিতে থাকে যে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধুরা কে তাহার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করে এবং কে তাহার বিয়োগে ভগ্ন হৃদয়ে তাহার মঙ্গল কামনা করে।

রূহ এ প্রকার এক বছর মৃতদেহের পর্যবেক্ষণ শেষ করিলে ফেরেশতারা উহাকে সমস্ত রূহ রাখিবার স্থানে লইয়া যাইবে। শেষ বিচারের পূর্বে সিংগার ফুৎকারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করিতে থাকিবে।

--০--

আত্মা বা রূহের অবস্থান

মৃত্যুর পরে আল্লাহ পাক মানবাত্মা কোথায় রাখিবেন, সে সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ঃ প্রাণীমাত্র-মানব-দানব, পশুপক্ষী (যাবতীয় জীবের) আত্মাই ইস্রাফীলের (আঃ) সিংগার মধ্যে থাকিবে। আল্লাহতা'আলা এই বিশ্বজগতে যত প্রাণী পয়দা করিয়াছেন বা করিবেন, উহাদের প্রত্যেকটির রূহের সংখ্যায় সিংগার মধ্যে এক একটি ছিদ্র তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন; কাজেই এক সম্প্রদায়ের আলেমগণ বলেন যে, মৃত্যুর পরে পাপী-তাপী সকলের আত্মাই সিংগার নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে রাখা হইবে।

আর একদল আলেম বলেন ঃ 'যদি মৃত ব্যক্তি মো'মেন মুসলমান হইয়া থাকে, তবে তাহার রূহ আল্লাহ পাক সবুজ পাখীর আকৃতি রূপ পয়দা করিয়া ফেরেশতাগণকে বেহেশতের ইল্লিয়ীন নামক শান্তিময় পবিত্র স্থানে রাখিতে আদেশ করিবেন। সেখানে থাকিয়া সবুজ পাখীরূপ আত্মা এদিক ওদিক মহানন্দে উড়িয়া বেড়াইতে থাকিবে।'

আর মৃত ব্যক্তি যদি কাফের (বেদীন) হইয়া থাকে, তবে তাহার রূহ দোজখের মধ্যে সিজ্জীন নামক যন্ত্রণাদায়ক অপবিত্র স্থানে রাখিতে আদেশ করিবেন। রূহ সেখানে থাকিয়া দোজখের ভীষণ আজাব ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে।'

কথিত আছে, মোমে'ন ব্যক্তির রূহ যখন কবজ করা হয়, তখন রহমতের ফেরেশতাগণ আত্মা লইয়া অতি সম্মানের সহিত মিছিল সহসারে আসমানে গমন করে। এমন সময় আল্লাহতা'আলা অনতিদূর হইতে ফেরেশতাগণকে নির্দেশ করিবেন ঃ 'হে ফেরেশতাগণ। উহার আত্মা বেহেশতের ইল্লিয়ীন নামক শান্তিময় স্থানে নিয়া যাও এবং তথা হইতে পুনঃ আমার প্রিয় বান্দার শবদেহের নিকট কবরের মধ্যে নিয়া রাখ। আর আমার বান্দার কবর হইতে বেহেশত পর্যন্ত একটি সুরঙ্গ পথ খুলিয়া দাও যেন আমার বান্দা সেখানে থাকিয়া বেহেশতের শান্তি উপভোগ করিতে পারে।'

আর যদি কোন কাফের বা বেদীনের মৃত্যু হয়, তবে আজাবের ফেরেশতাগণ তাহার আত্মা লইয়া আসমানে উঠিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু কিছু দূর যাইতেই দেখিতে পাইবে আসমানে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ! অপর দিকে অনতিদূর হইতে আল্লাহ পাক প্রত্যাদেশ করিবেন-'হে ফেরেশতাগণ! উহার অপবিত্র আত্মার স্থান এখানে নাই, ইহা অতি পবিত্র স্থান; যাও উহার আত্মা কবরের মধ্যে শবদেহের নিকট নিয়া রাখ। ফেরেশতাগণ তাহাই করিবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ মত উক্ত কাফের বা বেদীন ব্যক্তির কবর অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দিবেন এবং উহার কবর হইতে দোজখ পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ পথ খুলিয়া দিবেন যেন কবরে থাকিয়া সে দোজখের ভীষণ আজাব ও যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, মানুষের মৃত্যুর পরে আত্মা কবরেই রাখা হইবে। এই মর্মে হাদীছ শরীফে আছে-মৃত ব্যক্তিরা কবরে থাকিয়া জুতার ধীর-পদক্ষেপের শব্দও শুনিয়া থাকে।' বহু বিজ্ঞ আলেম বলেন যে, যে সকল লোক ধর্মীয় যুদ্ধে শহীদ (প্রাণত্যাগ করিয়াছেন) হইয়াছেন আল্লাহ পাক তাহাদের আত্মা ফেরদাউস নামক সর্বোচ্চ বেহেশতে সবুজ বর্ণের পাখীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট করিয়া রাখেন। সেই সকল পাখী বেহেশতে যথা ইচ্ছা উড়িয়া বেড়ায় এবং বেহেশতের নানারূপ ফল-মূল আহার করিয়া থাকে। আর যখন বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করে, তখন আরশের নিম্নে ঝুলানো 'বাসীরুল ইয়াত' নামক কিনদীল বা ঝাড়বাতির মধ্যে বিশ্রাম নিয়া থাকে।

খোদার রাহে শহীদ যারা উচ্চ তাদের শান,
মহান খোদা করেন তাদের বিশেষ জীবন দান।
আত্মা তাদের বানাইয়া সবুজ বরণ পাখী,
জান্নাতুল ফিরদৌস মাঝে দেন যতনে রাখি।
সেথায় থাকি খায় তাহারা জান্নাতী ফল মূল,
উড়ে বেড়ায়, রয় হামেশা আনন্দে মশগুল।

নাবালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ নিষ্পাপ। এই কারণে তাহাদের উপর ধর্মীয় বিধান তখনো আরোপিত হয় না। এই শ্রেণীর শিশু বা কিশোর মারা গেলে তাহাদের আত্মা কোথায় রাখা হইবে, এ নিয়া আলেমদের মধ্যে বিতর্ক রহিয়াছে! অনেকের মতেই মুসলমানের নাবালেগ সন্তানের রূহ বা আত্মা কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত চড়ুই পাখীর রূপ ধারণ করিয়া বেহেশের এদিক সেদিকে উড়িয়া বেড়াইবে।

পক্ষান্তের কাফেরদের শিশু সন্তান মারা গেলে উহাদের আত্মা বেহেশতের চতুষ্পার্শ্বের ঘুরিতে থাকিবে। বেহেশতে তাহাদের কোন স্থান হইবে না। শেষ বিচারের পরে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে বেহেশতীদের খাদেম (চাকর) সাজাইয়া বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।

আর যে সকল মোমেন মুসলমান ঋণী হইয়া কিংবা অপরের ন্যায়সঙ্গত দাবী পরিশোধ না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদের আত্মা জমীন ও আসমানের মধ্যভাগে শূন্যে ঝুলিয়া থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে তাহার ঋণ বা অপরের ন্যায়সঙ্গত দাবী পরিশোধ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহাদের আত্মা লইয়া জমীনেও থাকে না এবং আসমানেও যাইতে পারে না বরং জমীন ও আসমানের মধ্য ভাগে অবস্থান করিতে থাকে।

আর ফাসেক মুসলমানের (গোনাগার) মৃত্যু হইলে তাহার আত্মা কবরে থাকিয়া দোজখের আজাব ভোগ করিতে থাকে। কাফের (বেদীন) ও মোনাফেকদের মৃত্যু হইলে তাহাদের আত্মা দোজখের সিজ্জীন নামক কষ্টপূর্ণ স্থানে রাখা হয়। সেখানে থাকিয়া আত্মা কেয়ামত পর্যন্ত দোজখের আজাব ভোগ করিয়া থাকে।

--০--

চতুর্থ অধ্যায়

হাশর ময়দান ও হিসাব-নিকাশ

কেয়ামত ও আখেরাত

এই বিশ্ব-জগত আমাদের বাসস্থান। আমরা জীবনে বহু লোক জন্ম নিতে দেখিয়াছি এবং বহু লোককে মরিতেও দেখিয়াছি। এই নশ্বর দুনিয়ায় একব্যর মহা প্রলয় আসিবে এ কথাও সত্য। সকল শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, নশ্বর ধরায় একবার মহা প্রলয় সংঘটিত হইবে এবং উহা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত ও লয় হইয়া যাইবে।

এতদ্ব্যতীত কোরআন ও হাদীছ পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নশ্বর বিশ্ব-জগতে একবার মহাপ্রলয় অবশ্যই সাধিত হইবে। উহাকেই বলে কেয়ামত। প্রাণীমাত্র মহাপ্রলয়ের পরে পুনরুত্থান হইয়া ইলাহীর আদালতে হিসাব-নিকাশের জন্য দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ইহাকেই বলে কেয়ামত বা হাশর ময়দান।

আল্লাহ পাক বলেন-

'ধর্মভীরুগণ কেয়ামতের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।'

কেয়ামতের দিবস আল্লাহ পাক মানব-দানবের নেকী-বদীর যাবতীয় কার্যের তন্নতন্ন হিসাব লইয়া সুষ্ঠু বিচার করিবেন। হিসাবান্তে প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করিবে অথবা পুরস্কৃত হইবে।

মুসলমানগণের কেয়ামত ও পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস আনিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, উহারা ভীতি অন্তরে আনয়ন করতঃ যাবতীয় গোনাহরু কার্য বর্জন করা এবং নেক কার্যে উৎসাহিত হওয়া। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের চলা-ফেরা কার্যকলাপ তাহার একেবারে বিপরীত। মনে হয়, না জানি কেয়ামত হইবে না! নিঃসন্দেহে কেয়ামত সংঘটিত হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, প্রকৃত পক্ষে কেয়ামতের দিবস এত ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক যে, উহার কথা মনে পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

আল্লাহ পাক বলেন–

'কেয়ামত দিবস ভূ-কম্পন বাস্তবিকই ভীষণ বিভীষিকাময়।'

মানব জাতির বিশেষ করিয়া মুসলমান নর-নারীর একান্ত কর্তব্য এই যে, কেয়ামতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভয় রাখিয়া গাফলতি বর্জন করতঃ নিজ আমলের প্রতি বিশেষ ভাবে সতর্ক ও সাবধান হওয়া।

মো'মেন মুসলমানদের সতর্কের জন্য আল্লাহ রাসূলুল্লাহ্‌কে কেয়ামতের লক্ষণসমূহ জ্ঞাত করাইয়া দিয়াছেন, যেন মো'মেন মুসলমান-গণ পূর্বেই কেয়ামতের লক্ষণ দেখিয়া হুশিয়ার ও সাবধান হইতে পারে।

কেয়ামতের পূর্বে যে সকল লক্ষণসমূহ প্রতীয়মান হইবে তাহা দুই প্রকার; যথা–আলামতে ছোগরা বা সাধারণ লক্ষণ ও আলামতে কোবরা বা বিশেষ লক্ষণ।

রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) মৃত্যুর পরবর্তী সময় হইতে হজরত ইমাম মাহদীর আত্ম প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল আলামত বা লক্ষণ প্রকাশিত হইবে, তাহাকে বলা হয় আলামতে ছোগরা।

আর হজরত ইমাম মাহদী (রাঃ) হইতে কেয়ামতের পূর্বে হজরত ইস্রাফীলের সিংগায় ফুৎকারের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল আলামত পরিলক্ষিত হইবে, উহাকে বলা হয় আলামতের কোবরা।

আলামতে ছোগরা ঃ হাদীছ শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাই-য়াছেন (আলামতে ছোগরা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এই সকল আলামত পরিলক্ষিত হইবে) ঃ (১) কেয়ামতের পূর্বে লোকেরা সমবায় জাতীয় সম্পদকে (জনসাধারণের ফাণ্ড) নিজস্ব সম্পত্তি মনে করিয়া অবাধে খরচ করিবে। (২) এই রূপে কেয়ামতের পূর্বে লোকেরা আনামত-গচ্ছিত মালকে গণীমতের মালের ন্যায় হালাল ধারণা করিয়া অপহরণ করিবে। (৩) জাকাত আদায় করাকে জরিমানার ন্যায় ঘৃণিত কষ্টকর মনে করিবে। (৪) দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করিবে। (৫) স্বামী তাহার স্ত্রীর বাধ্যগত হইবে। (৬) কিন্তু তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করিবে। (৭) দূর সম্পর্কীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্ব করিবে। (৮) কিন্তু পিতার সহিত অপব্যবহার করিবে। (৯) মসজিদে দুনিয়াদারির বিষয় লইয়া অধিক পরিমাণে গোলযোগ হইবে। (১০)

ফাসেকগণ সমাজের নেতা হইবে। (১১) এই রূপে দুশ্চরিত্রবান ও নীচু বংশের লোকগণ নেতৃস্থান অধিকার করিবে। (১২) শত্রুর শত্রুতার ভয়ে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে। (১৩) অভিনেত্রী ও গায়িকা বৃদ্ধি পাইবে এবং গান বাজনার বিভিন্ন উপকরণ আবিষ্কৃত হইবে। (১৪) জন-সমাজে প্রকাশ্য মদ্যপান হইবে। (১৫) পূর্বের লোকদিগকে বর্তমান লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও ভর্ৎসনা করিবে।

উপরি উক্ত হাদীছটি কবিতায়ও অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। ইহাতে পাঠকবৃন্দ এবং ওয়ায়েজীন বন্ধুদের স্মরণ রাখিতে সুবিধা হইবে।

রাসূল বলেন, মানুষেরা দুনিয়াতে যেই ক্ষণে,
আপনা ধন ও মালের মত গণবে 'পরের' ধনে;
আমানতের মাল ভাবিবে যেমন গণীমত,
জাতাক দেয়া করবে মনে জরিমানার মত;
শিখবেনাক ইলমে কালাম দ্বীনের লাগি আর,
শিখবে কেবল মর্যদা হাসিল করিতে দুনিয়ার;
খসম হবে নফর যেন-বিবির তাবেদার,
কবরে ছেলে বেয়াদবী নাফরমানী মা'র;
দোস্ত ইয়ার আপন হবে পিতা হবেন পর;
মসজিদেতে মাচাবে শোর-ধ্বনি উঁচুতর;
ফাছেক ফাজের মানুষ নেতা হইবে কওমের,
হীন লোকেরা পরিচালক হইবে সমাজের;
এই ভয়েতে করবে কারুর উজ্জত ও সম্মান,
নইলে কখন হারাতে হয় তাহার হাতে মান;
প্রকাশ পাবে যন্ত্র বহু বাদ্য ও বাজনার,
গান গাহিয়া বেড়াইবে জমাত গাহিকার;
চলবে জাগায় জাগায় সদা শরাব খোরী পাপ,
পরের মানুষ আগের লোকে দানবে অভিশাপ;
প্রকাশ পাবে যখন ধরায় এ সব আলামত,
কঠিন বিপদ আসবে তখন জানিও আলবত;
ভীষণ ঝড়ো হাওয়া তখন বহিবে শন শন,
ধ্বসবে জমীন হইবে শুরু মহা ভূ-কম্পন;

ছুরাত যাবে বদল হয়ে কতক মানুষের,
আকাশ হতে হইবে তখন বৃষ্টি পাথরের;
দানা যেমন ঝরতে থাকে ছিড়লে পলিতার,
আসবে তেমন বিপদ কেবল একের পরে আর;

হাদীছে আরও আছে-(১৬) অত্যাচার ও ব্যভিচার (জেনা) অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। (১৭) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবে। (১৮) শরম-লজ্জা সমূলে উঠিয়া যাইবে। (১৯) পুংমৈথুনের অশ্লীল অভ্যাস বৃদ্ধি পাইবে। (২০) মিথ্যাবাদীতা চতুরতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। (২১) অত্যাচার অধিক/মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে। (২২) বিধর্মীগণ মুসলমানের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।

এতদ্ব্যতীর হাদীছ হইতে আরও বহু লক্ষণ প্রমাণিত হয়, কিন্তু পুস্তকের কলেবর অতিমাত্রায় প্রবৃদ্ধির শংকায় উহা পাঠকের খেদমতে পেশ করা হইল না।

আলামতে কোবরা ঃ হজরত ইমাম মাহদী (রাঃ) হইতে হজরত ইস্রাফীলের (আঃ) সিংগায় ফুৎকারের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইবে, উহাকে 'আলামতে কোবরা' বলা হয়। নিম্নে তাহার মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ

কবিতাকারে দেওয়া হইল-

পৌঁছবে যখন নিকট এসে ভীষণ কিয়ামত,
প্রকাশ পাইবে তখন বিশেষ কয়টি আলামতঃ
জাহির হবেন মাহদী ইমাম-খলিফা আল্লার,
বাহির হবে সেই দাজ্জাল কাফের দুরাচার।
ঈছা নবী আকাশ হতে নাজিল হবেন ফের,
ফিতনা শুরু করবে কওম ইয়াজুজ মাজুজের।
ভূমিকম্প হইবে ভীষণ ধ্বসবে জমিন তায়,
পশ্চিম গগন হইতে রবি হইবেগো উদয়।
দাব্বাতুল আরদ নামক আজব জানোয়ার,
বাহির হবে সাফা ফেটে মধ্য হতে তার।

(১) হজরত ইমাম মাহদী (রাঃ) আত্মপ্রকাশ করিবেন। (২) অভিশপ্ত দাজ্জাল বাহির হইবে। (৩) হজরত ঈসা (আঃ) নাজিল হইবেন।

(৪) ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় বাহির হইবে। (৫) ভূমিকম্প হইবে। (৬) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবে। (৭) দাব্বাতুল আরদ আত্মপ্রকাশ করিবে।

--o--

আলামতে কোবরার বিবরণ

এক।। ইমাম মাহদী ঃ ইমাম মাহদী রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) বংশধর এবং হজরত ফাতেমার (রাঃ) সন্তানের মধ্যে হইতে হইবেন। তাঁহার মাতা-পিতার নাম রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) মাতা-পিতার নাম অনুযায়ী আবদুল্লাহ ও আমিনা থাকিবে। তাঁহার স্বভাব চরিত্র রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) স্বভাব চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বিশ্বজগতে মহাপ্রলয়ের দেড় শতাব্দী পূর্বে যখন দেশময় অশান্তি ও মুসলমানদের দুরবস্থা ঘটিবে, তখন তিনি ইমামরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবেন।

পৃথিবীর শেষ শতাব্দীর পূর্বে মুসলমান খৃষ্টানদের সহিত নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া মুসলমানগণ তাহাদের সহিত একত্রিত শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবে এবং যুদ্ধে উভয় দল জয়লাভ করতঃ নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবে। এ সময় একজন খৃষ্টান তাহাদের ধর্মের 'সলীব' (ক্রুশ) উত্তোলন করিয়া বলিবে 'সলীব' (খৃষ্টান ধর্মের) জয় হইয়াছে। ইহাতে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান রাগের মাথায় তাহাদের 'সলীব' ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ফলে খৃষ্টানগণ মুসলমানদের সহিত পূর্বের নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ করিবে এবং উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এই যুদ্ধে অধিকাংশ মুসলমান শহীদ হইবেন। অবশিষ্ট মুসলমানগণ মদীনা শরীফে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিবেন। এই সময় খৃষ্টানদের রাজত্ব মদীনার নিকটবর্তী খায়বর প্রান্তর পর্যন্ত প্রশারিত হইয়া পড়িবে। ফলে মুসলমানগণ মদীনার চতুর্দেওয়ালের সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িবে।

এই দুরবস্থার সময় মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহদীর (আঃ) তালাশে বাহির হইবে। এদিকে মুসল-মানদের খলীফার ইন্তিকাল হইলে ইমাম মাহদীর (রাঃ) উপর খেলাফতের মহান দায়িত্বভার অর্পিত হয় না-কি, এই ভাবিয়া তিনি মদীনা শরীফ ত্যাগ করিয়া মক্কা শরীফে গমন করিবেন। এতদসত্ত্বেও মক্কা

শরীফের কিছু সংখ্যক মুসলমান তাঁহার সন্ধান পাইয়া অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাঁহাকে খেলাফতের বয়াত করিতে বাধ্য করিবেন। মকামে ইব্রাহীম এবং রোকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে তাহারা তাঁহার হাতে সর্বপ্রথম বয়াত করিবেন। তখন গাইবী আওয়াজে বলা হইবে–

।। হাজা খলীফাতুল্লাহিল মাহদী। ফাসমাউ লাহূ অ–আতীউ ।।

'এই ব্যক্তিই আল্লাহর মনোনীত খলীফা মাহদী; কাজেই তোমরা তাঁহার কথা শ্রবণ কর এবং তাঁহার নির্দেশানুযায়ী কাজ কর।'

এই মাহদী, ইনি হলেন খলিফা আল্লার,
অনুগত হওগো সবাই হুকুম মান তার।

এই ঘটনার প্রাক্কালে ঘটনাচক্রে রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ একই সাথে হইয়া পড়িবে।

ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এই সংবাদ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের সংবাদ পাইয়া নানা দেশের মুসলমানগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিতে শুরু করিবে। এমন কি, শাম ও ইরাকের আউলিয়া–উল্লাহ ও আব্দালগণও তাঁহার হাতে বয়াত হইতে আরম্ভ করিবেন। খৃষ্টানগণ ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সংবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবে। তাহাদের সর্বমোট আট লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্য সম্মিলিত ৭০টি ঝাণ্ডা থাকিবে। খৃষ্টানগণ এই অসংখ্য সশস্ত্র বাহিনী লইয়া বিপুল বেগে অগ্রসর হইতে থাকিবে!

ওদিকে হারেস নামে এক ব্যক্তি 'মা–ওয়ারাই নহর' হইতে বিপুল সেনাবাহিনী লইয়া ইমাম–মাহদীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাহারা পথিমধ্যে কাফেরদেরকে হত্যা করিতে করিতে বিদ্যুৎ বেগে অগ্রসর হইবে।

এদিকে ইমাম মাহদীও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিমিত্ত মক্কা শরীফ হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনা শরীফে পৌঁছিবেন। তথায় তিনি রাসূলুল্লাহর (ছঃ) মাজার শরীফ জিয়ারত করতঃ সিরিয়ার (শাম) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। দামেস্কের নিকটবর্তী স্থানে পুনরায় খৃষ্টানদের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। সর্বশেষে মুস–লমানদের বীরত্বের নিকট তাহারা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইয়া এদিক

সেদিক পলায়ন করিবে। অতঃপর ইমাম মাহদী খৃষ্টানদের কর্তৃক বিশৃঙ্খলিত দেশসমূহে পুনঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িবেন। তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে দেশের নানা স্থানে পাঠাইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন।

দুই।। দাজ্জাল ঃ ইমাম মাহদীর (আঃ) আবির্ভাবের অনুমান ছয় কি সাত বৎসর পরে অভিশপ্ত দাজ্জাল বাহির হইবে। হাদীছ শরীফের মতে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল ইয়াহুদী বংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। দাজ্জাল সাধারণ লোকের মধ্যে 'মাসীহ' নামে খ্যাতি লাভ করিবে। মহা প্রলয়ের পূর্বে দাজ্জালের উৎপীড়নের ন্যায় ভীষণ বিপদ আর একটিও হইবে না। তাহার এক চক্ষু অর্ধ কানা বা ফলি পড়া থাকিবে। মাথার কেশ অত্যন্ত কোঁকড়ান হইবে। তাহার কপালে অদৃশ্যমান 'কাফ–ফা–রা' অর্থাৎ কাফের লেখা থাকিবে। প্রকৃত মো'মেন মুসলমান ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত লেখা দেখিয়া অনুমান করিতে পারিবে না।

এক চোখেতে আন্ধা আধেক দাজ্জাল বদকার,
মাথার যে চুল হাবশী সম কোঁকড়া অতি তার।
'কাফ–ফা–রা' কাফের তাহার কপাল 'পরে লেখা,
কেবল মুমিন লোকের চোখে যাইবে ইহা দেখা।

দাজ্জাল প্রথমতঃ ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হইবে এবং সেখানে নবুয়তী দাবী করতঃ ভীষণ ধরণের ফেতনা ফাসাদ আরম্ভ করিবে। অতঃপর সেখান হইতে ইস্পাহান চলিয়া আসিবে। এখানে ইয়াহুদি সম্প্রদায় হইতে প্রায় সত্তর হাজার ইয়াহুদি তাহার দলভুক্ত হইবে। দাজ্জাল ইস্পাহান থাকিয়াই খোদায়ী দাবী করিয়া বসিবে। তৎপর পৃথিবী ব্যাপী তাহার ফেতনা ছড়াইয়া পড়িবে।

আল্লাহ পাক মানব জাতিকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে এমন অলৌকিক শক্তি দান করিবেন যে, সে মূর্দাকে জিন্দা করিতে সমর্থ হইবে। সুলাইমান নবীর তখতের ন্যায় বিদ্যুৎ বেগে সে বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া নিমিষের মধ্যে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবে।

এতদ্ব্যতীত তাহার সংগে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড থাকিবে, সে উহাকে দোজখ বলিয়া আখ্যা দিবে এবং একটি অতীব সুন্দর ফুলের বাগানও

থাকিবে, তাহাকে সে বেহেশত বলিয়া লোকদিগকে প্রবঞ্চনা দিবে। প্রকৃতপক্ষে তাহার অগ্নিকুণ্ড বেহেশতের শান্তির নমুনা হইবে এবং ফুল বাগিচা হইবে অগ্নির ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক। তাহার কথা যে শিরোধার্য করিবে, তাহাকে উক্ত কথিত শান্তিদায়ক ফুল বাগিচার নামে অগ্নিময় যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার কথা অমান্যকারীদের যন্ত্রণাদায়ক অগ্নিকুণ্ডের নামে বেহেশতময় শান্তিপূর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করিবে।

এক পাশে তার ফুলের বাগান শোভিবে সুন্দর,
আরেক ধারে অনল কুণ্ড জ্বলবে ভয়ঙ্কর।
ফুল বাগানে বলবে বেহেশত দাজ্জাল কাফের;
সেইযে বেহশত দান করিবে তাহার মুরিদদের।
কিন্তু মহান আল্লা পাকের কি কুদ্রতের ধারা,
এই বেহেস্তে দোজখ সম আজাব পাবে তারা।
এই অনল কুণ্ডে মুমিনদের ফেলবে কাফের হায়,
কিন্তু তারা জান্নাতী সুখ লাভ করিবে তায়।

দাজ্জালের সবচেয়ে বড় ফেতনা হইল–সে মাঝে–মাঝে মানুষের নিকট উপস্থিত হইবে–'আমি যদি তোমাদের মৃত জানোয়ার সমূহকে পুনঃ জিন্দা করিয়া দিতে পারি, তবে কি তোমারা আমাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে?' তখন দুর্বল ঈমানদার মুসলমানগণ বলিয়া উঠিবে, 'অবশ্যই'। তখনই তাহার অনুচর ভূত–প্রেত শয়তানেরা জানোয়ারের আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে হাজির হইবে।

অনুরূপ, দাজ্জাল কতক লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে–তোমাদের মৃত মাতা–পিতাকে যদি জীবিত করিয়া দেখাইতে পারি, তবে আমাকে খোদা বলিয়া মানিবে তো?' তখন তাহারা উত্তর করিবে, 'আলবত'। দাজ্জালের অনুসরণকারী শয়তানেরা তখনই তাহাদের মাতা–পিতার আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে। দাজ্জালের এইরূপ দুষ্ট প্রকৃতির ক্রিয়া–কলাপ দেখিয়া অধিকাংশ দুর্বল ঈমানদারগণ তাহাদের পবিত্র ঈমান হারাইয়া ফেলিবে।

দাজ্জাল এই ভাবে নানা দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া ফেতনা ফাসাদ করিতে থাকিবে। অবশেষে মক্কা শরীফেও হানা দিতে আসিবে। কিন্তু মক্কা

শরীফের রক্ষক ফেরেশতাগণ কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ায় সেখান হইতে সে মদীনা শরীফের দিক রওয়ানা হইবে। মদীনা শরীফে যাইয়া তথায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া মদীনার নিকটবর্তী ওহোদ পাহাড়ের পশ্চাৎ ভূমিতে অবতরণ করিবে। এই সংবাদ পাইয়া মদীনা শরীফের তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ ঈমানদার ব্যক্তি দাজ্জালের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন ঃ রাসূল–ল্লাহর (ছঃ) ভবিষ্যৎ ঘোষণা অনুযায়ী আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি সেই দুরাচার পাপী দাজ্জাল।'

ইহা শুনা মাত্র দাজ্জাল তাহার অনুচরবৃন্দকে বলিবে–যদি আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া পুনঃ জিন্দা করিতে পারি, তবে কি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিবে যে, 'আমি খোদা নই?' তাহারা বলিবে–'নিশ্চয় না।' তৎপর সে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতঃ পুনঃ জীবিত করিবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে–'বলতো, আমি খোদা কিনা?' তখন মো'মেন ব্যক্তি বলিবেন–'কখনই না, তুমি যে দাজ্জাল ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।' আবার দাজ্জাল তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু শত চেষ্টার পরও তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না। অতঃপর দাজ্জাল সিরিয়া দেশের অন্তর্গত দামেস্কের দিকে রওয়ানা হইবে।

তিন।। ঈসা নবীর নাজিল ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) খৃষ্টান কর্তৃক বিশৃঙ্খলিত দেশসমূহে শান্তি–শৃঙ্খলার কার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। অভিশপ্ত দাজ্জাল মদীনা হইতে দামেস্কের দিকে রওয়ানা হইয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া মাহদী কুস্তুন্তুনিয়া হইতে দামেস্কের পথে রওয়ানা হইবেন। মাহদী দাজ্জালের পূর্বেই দামেস্কে পৌছাইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করিবেন।

একদা দামেস্কের বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদে আছরের আজান হইলে সকলে নামাজের জন্যে প্রস্তুত হইতে থাকিবে। এমনি এক সময়ে হজরত ঈসা নবী দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করিয়া দুইখানা জাফ্রানী রং–এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদের পূর্বদিকের মিনারায় নাজিল হইবেন।

ঈসা নবী নাজিল হইলে মাহদী (আঃ) তাঁহাকে আছরের নামাজের ইমামতীর জন্য অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়া বলিবেন–

'না, আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে সকল উম্মতের উপর বিশেষ সম্মান দান করিয়াছেন, কাজেই আপনাদের মধ্য হইতেই একজন ইমাম হইবেন—আমি হইব তাহার মুক্তাদী।'

ঈসাকে ক'বেন মাহদী ইমাম হইবার,
নবী ঈসা এই ভাবেতে জবাব দিবেন তার ঃ
আপনাদেরি হইতে কেহ ইমাম হতে যান,
সব উম্মতের শ্রেষ্ঠতম উম্মা' মুসলমান।

হযরত ঈসা নবী মোক্তাদি হইয়া ইমাম মাহদীর পিছনে আসরের নামাজ আদায় করিবেন। নামাজান্তে ইমাম মাহদী তাঁহাকে মুসলিম-সেনার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইবেন। এইবারেও তিনি অস্বীকার করিয়া বলিবেন—'আমি কেবল অভিশপ্ত দাজ্জালকে হত্যা করিতে নাজিল হইয়াছি, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই আমার।'

অতঃপর ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী এবং হযরত ঈসা নবী যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করিবেন। মুসলিম সেনাবাহিনী এবং হযরত ঈসা নবীর ভয়ে দাজ্জাল পলায়ন করিবে।

হযরত ঈসা নবীকে আল্লাহ্ পাক এত অলৌকিক ক্ষমতা দান করিবেন যে, চক্ষের দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তাঁহার নিঃশ্বাসের ঘ্রাণে সমস্ত কাফের নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এইভাবে তিনি অধিকাংশ কাফেরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন, অবশিষ্ট কাফেররা ছত্রভঙ্গ হইয়া এদিক সেদিক পলায়ন করিবে।

তৎপর হযরত ঈসা নবী দাজ্জালের তালাশে বাহির হইবেন। তালাশ করিতে করিতে 'লুদ্দ' নামক স্থানে দাজ্জালকে পাইয়া তিনি তাহাকে হত্যা করিবেন।

রুহু উল্লা খোদার প্রিয় ঈসা পয়গাম্বর,
আল্লা তারে রাখছেন তুলে চৌথা আকাশ পর।
কিয়ামতের পূর্বে তিনি নাজিল হবেন ফের,
তার হাতেই খতম হবে জীবন দাজ্জালের।

দাজ্জালকে হত্যা করিয়া হযরত ঈসা নবী ও হযরত ইমাম মাহদী দাজ্জাল কর্তৃক লুণ্ঠিত ও বিশৃঙ্খলিত দেশসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া দেশময় লোকদিগকে সান্ত্বনা ও আল্লাহর অনুগ্রহের দিকে আহ্বান করিবেন এবং সকল স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

হযরত ইমাম মাহদী চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং সাত কি নয় বৎসর সুষ্ঠুরূপে খেলাফত আঞ্জাম দিয়া অবশেষে সাতচল্লিশ কি উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিবেন। মাহদীর মৃত্যুর পরে হজরত ঈসা নবী সমস্ত মুসলমান জাহানের খেলাফতের মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন এবং সুষ্ঠুরূপে রাজ্য পরিচালনা করিবেন।

চার॥ ইয়াজুজ মাজুজ ঃ ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর সমস্ত মুসলমান হযরত ঈসা নবীর নেতৃত্বাধীনে মহাসুখে কাল যাপন করিতে থাকিবে। এমন সময় ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় বাহির হইবে। উহারা হযরত নূহ নবীর পুত্র ইয়াফেসের বংশধর। তাহারা বর্তমানে সপ্ত মহাদেশের বাহিরে পৃথিবীর উত্তর-পূর্ব কোণে মহাসাগর ও চতুর্দিকে বেষ্টিত পর্বতমালার মধ্যে বসবাস করিতেছে। উক্ত পর্বতমালার মধ্যে দুইটি বিশাল পর্বত পশ্চিম ও পূর্বদিক হইতে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। বহুকাল পূর্বে এই দুই পর্বতের মধ্যভাগে মাত্র দুইটি গিরিপথ ছিল। ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় সেই গিরিপথ দিয়া বাহিরে আসিত এবং নিকটস্থ লোকদের উপর ভীষণ অত্যাচার, মারপিট ও লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত। তৎকালীন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ 'জুলকারনাইন' যখন সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া সেই স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন তিনি সেই দেশের অধিবাসীদের অনুরোধে উক্ত দুই পর্বতের মধ্যস্থ গিরিপথ পর্বতের চূড়া পর্যন্ত উচ্চ এবং ৬০ গজ প্রস্থাকার লৌহ নির্মিত প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই হইতে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় আর লোকালয়ে আসিয়া অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে পারে না।

দাজ্জালকে হত্যা করার পর হযরত ঈসা নবী মানুষদিগকে লইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতে থাকিবেন। এমন সময় আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা নবীর প্রতি অহী নাজিল করিবেন—'হে ঈসা! অমিতবিক্রম শক্তিশালী বিপুল সংখ্যার একটি সম্প্রদায়কে বাহির করিয়াছি। যাহাদিগকে বাধা দিবার শক্তি কোন মানুষের নাই; কাজেই তুর পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ কর।

এতদশ্রবণে হযরত ঈসা নবী তাঁহার প্রজাবৃন্দ ও অনুচরসহ পাহাড়ে চলিয়া যাইবেন।

হিংস্রজাতি ইয়াজুজ-মাজুজ দুষ্ট অতিশয়,
ভেঙ্গে দেয়াল সিকান্দারের ঢুকবে লোকালয়।
লোকালয়ে ঢুকেই ভীষণ করবে জুলুম তারা,
সেই জুলুমে সকল মানুষ হইবে দিশেহারা।

এদিকে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় ভীষণবেগে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং মানুষের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে। এ সংকটময় মুহূর্তে হযরত ঈসা নবী তাঁহার অনুচরবৃন্দসহ বহুদিন পর্যন্ত উক্ত পাহাড়ে অবরুদ্ধভাবে অন্নকষ্টে কালযাপন করিতে থাকিবেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া আপন অনুচরসহ তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসের জন্যে খোদার দরবারে দোয়া ও মোনাজাত করিবেন। ইহাতে আল্লাহ্ পাকের হুকুমে ইয়াজুজ-মাজুজগণ 'নগফ' নামক এক প্রকার ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া একরাত্রির মধ্যেই কুকুর ছানার ন্যায় মরিয়া নির্মূল হইবে।

অতঃপর ঈসা নবী তাঁহার অনুচরসহ পাহাড় হইতে নিম্নে অবতরণ করিবেন। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের শবদেহের দুর্গন্ধে তাহাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এইবারে তিনি পুনঃ আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মোনাজাত করিবেন-'ইয়া ইলাহী! ইহাদের দুর্গন্ধে জীবনধারণ অসম্ভব।' ইহাতে আল্লাহ্ পাকের হুকুমে এক প্রকার বড় বড় পাখী আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ লইয়া যাইবে। অতঃপর চল্লিশ দিন যাবৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকিবে এবং সমস্ত স্থান পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহার কিছুকাল পর পর্যন্ত দেশময় শস্য বাড়িয়া যাইবে। কষ্ট বলিতে আর কিছু থাকিবে না। ধন-সম্পত্তি এত বৃদ্ধি পাইবে যে, যাকাত, দান-ছদকা লওয়ার মত কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এসময় প্রজাগণও হইবে খুবই খোদাভীরু-সকলেই আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে থাকিবে মশগুল।

হযরত ঈসা নবী নাজিল হইয়া পূর্ণ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। এই সময় তিনি শাদী বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততিও পয়দা হইবে। অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করিবেন। রাসূলুল্লাহর (সঃ) রওজা মোবারকে তাঁহার দাফন করা হইবে। হযরত ঈসা নবীর পর হইতে আবার লোকেরা বিলাসিতায় মগ্ন হইয়া পড়িবে। অবশ্য তাঁহার

মৃত্যুর পরেও একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা হইবেন। উক্ত খলিফার মৃত্যুর পরে দেশময় পুনঃ শিরক বিদায়াৎ আরম্ভ হইয়া যাইবে।

পাঁচ।। ভূ-কম্পন ঃ হযরত ঈসা নবীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পরবর্তী মানুষগণ পুনঃ অত্যধিক পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। ফলে আল্লাহর হুকুমে ভূ-কম্পনে প্রাচ্য পাশ্চাত্য এবং আরবদেশ এই তিনটি স্থান ধ্বসিয়া যাইবে। ইহাতে কাফের এবং আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকার-কারীগণ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অতঃপর এক প্রকার দুর্গন্ধময় ধূয়া বাহির হইয়া চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। এই ধূয়া চল্লিশ দিবস ব্যাপী স্থায়ী হইবে। ইহাতে মুসলমানগণ কেবল সর্দি-কাশি ইতাদি অনুভব করিবে, কিন্তু কাফেরগণ বেহুশ হইয়া জমীনে পড়িয়া থাকিবে। চল্লিশ দিবস পরে ধূয়া বিলীন হইয়া যাইবে।

ছয়।। পশ্চিমে সূর্যোদয় ঃ ভূ-কম্পন শেষ হইতে না হইতেই আবার মানুষের উপর নূতন এক মুছীবত আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। নাবালেগ শিশু-সন্তানের ক্রন্দনের রোলে চতুর্দিকে উঠিবে হাহাকার ধ্বনি। সকলেই ব্যস্ত হইয়া হায় হায় করিতে থাকিবে। এইরূপে ৪৮/৫০ ঘন্টা রাত্রি অবসানের পরে পশ্চিমাকাশ হইতে ক্ষীণ জ্যোতি লইয়া সূর্যোদয় ঘটিবে। সকলেই এই অবস্থা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া তওবা করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু আফসোস! তখন আর তওবা কবুল হইবার সময় থাকিবে না। তওবার দরজা ইতিপূর্বেই বন্ধ হইয়া যাইবে। অতঃপর আবার যথারীতি দিবারাত্র চলিতে থাকিবে।

পশ্চিম হইতে রবি উদিবে যখন,
তওবার দরজা বন্ধ হইবে তখন।

সাত।। দাব্বাতুল আরদ ঃ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়ের কিছুদিন পরে ভীষণ ধরনের ভূমিকম্প আরম্ভ হইবে। ইহাতে 'সাফা' নামক পাহাড় ফাটিয়া মাটি হইতে হঠাৎ 'দাব্বাতুল আরদ' নামক এক অদ্ভুত জন্তু আত্মপ্রকাশ করিবে। দাব্বাতুল আরদের অন্যান্য জন্তুর সাথে কোনরূপ একক সামঞ্জস্য থাকিবে না, উহার মুখমণ্ডল মানুষের ন্যায়, পদদ্বয় উটের ন্যায়, গ্রীবা ঘোড়ার ন্যায়, লেজ গরুর লেজের ন্যায়, পাছা এবং শিং

হরিণের পাছা শিং-এর ন্যায় এবং হাত বানরের হাতের ন্যায় থাকিবে। এই অদ্ভুত জন্তুটি মানুষের ন্যায় কথাবার্তা বলিতে পারিবে। মানুষের সাথে মধুর ভাষায় কথা বলিবে। তাহার এক হাতে হযরত মূসা নবীর লাঠি এবং অন্য হাতে হযরত সুলাইমান নবীর আংটি থাকিবে। তাহার গতি হইবে অত্যন্ত দ্রুত। কেহ তাহাকে দৌড়াইয়াও অনুসরণ করিতে পারিবে না। আর কেহ তাহার হইতে পালাইতেও পারিবে না। সে ঈমানদার ব্যক্তিদিগের কপালে হযরত মূসা নবীর আছা দ্বারা রেখা টানিয়া যাইবে ফলে তাহাদের চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইবে। অপরদিকে বেঈমানদের নাকে হযরত সুলাইমানের (আঃ) আংটি ছোয়াইয়া যাইবে, এতে তাহাদের চেহারা কাল বিবর্ণ হইয়া যাইবে। অতঃপর দাব্বাতুল আরব হইয়া যাইবে অদৃশ্য।

ভূমিকম্পে ফেটে গিয়ে সাফার পাহাড়,
বের হবে আবজ এক জানোয়ার।
হইল তাহার নাম দাব্বাতুল আরদ,
ফরক করিবে সেই নেক আর বদ।

ইহার পরে আল্লাহ পাক উত্তর পান্ত হইতে শান্তি শীতল মলয় হাওয় প্রবাহিত করিবেন। এই হাওয়া প্রবাহে মো'মেনদের কাঁধের নিম্নাংশে একপ্রকার বেদনার সৃষ্টি হইবে। তাহাতে তাহাদের মৃত্যু হইবে। মোমেনদিগের মৃত্যু হইলে কাফ্রী কাফেরদের প্রাধান্য হইবে। তখন সকলেই আল্লাহকে ভুলিয়া যাইবে। এমন কি, পৃথিবীতে 'আল্লাহ্' বলার মত একটি লোকও জিন্দা থাকিবে না। অতঃপর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে একখণ্ড অগ্নি উত্তোলিত হইয়া মানুষদিগে তাড়াইতে থাকিবে। মানুষগণ অগ্নির ভয়ে সিরিয়া (শাম) দেশের দিকে পলায়ন করিতে থাকিবে। আগুন মানুষদিগকে শাম দেশে পৌছাইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা কেয়ামতের পূর্বেকার সর্বশেষ আলামত।

পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের পর হইতে আগুন উঠিবার পূর্ব পুর্যন্ত মোট ১২০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। ইহার তিন-চারি বৎসর পরে আল্লাহর হুকুমে ইস্রাফিল ফেরেশতা সিংগায় ফুৎকার দিবেন-পরকাল বা কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে।

--০--

ইস্রাফীলের সিংগার ফুৎকার

পূর্বে বলা হইয়াছে, হজরত ইস্রাফীলের (আঃ) চারিখানা ডানা আছে। ডানা চারিখানা এত বড় যে, উহার একখানা পৃথিবীর পশ্চিম আর অপর-খানা পূর্ব প্রান্ত জুড়িয়া বিস্তৃত; আর অন্য দুইখানার মধ্যে একখানা বিছাইয়া অপরখানার দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে এত সম্মান ও শক্তির অধিকারী করিয়াছেন যে, তিনি সর্বদা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র আরশ বহন করিয়া থাকেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহকে এত বেশী ভয় করেন যে, তাঁহার ভয়ে তিনি জড়সড় হইয়া একেবারে ক্ষুদ্র চড়ই পাখির ন্যায় হইয়া যান।

হজরত ইস্রাফীল (আঃ) আল্লাহর পবিত্র আরশের এত নিকটে অবস্থান করিয়া থাকেন যে, অন্য কোন ফেরেশতা আরশের এতটা নিকটবর্তী হইতে সাহস পান না; তাহা সত্তেও হজরত ইস্রাফীল ও আরশের মধ্যে সপ্ত পর্দা দ্বারা আবৃত। প্রত্যেকটি পর্দার মধ্যে আবার বহু শত মাইল রাস্তার ব্যবধান রহিয়াছে।

জিব্রাঈল ফেরেশতা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনিও হজরত ইস্রাফীলের (আঃ) ন্যায় আরশের এতটা টিকটবর্তী হইতে পারেন নাই। হজরত জিব্রাঈল (আঃ) এবং ইস্রাফীলের (আঃ) মধ্যে বহু সংখ্যক পর্দার দূরত্ব রহিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হজরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের আরশ হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

লাউহে মাহফুজ ঃ লাউহে মাহফুজ নামে আল্লাহ পাকের একখানা তকদীর নামা' (মানব জাতির অতীত', বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় কার্য লিখিত বস্ত) আছে। লাউহে মাহফুজকে আল্লাহ পাক শ্বেত বর্ণের অমূল্য পরশমণি দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। এই লাউহে মাহফুজ সপ্ত আসমান ও জমীন হইতেও বৃহৎ। উহা আল্লাহর পবিত্র আরশের সংগে ঝুলান রহিয়াছে। উহাতে পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ব হইতে শেষ বিচারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্ট জীবের যাবতীয় মঙ্গল কার্যাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সিংগা ঃ মহররম চাঁদের দশই তারিখে শুক্রবার সকল মানুষ নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত থাকিবে, হঠাৎ আল্লাহর নির্দেশে ইস্রাফীল (আঃ) সিংগায় ফুক দিবেন। প্রথমতঃ সিংগার ফুৎকার মৃদুস্বরে বাজিয়া উঠিবে, কিন্তু

এক সংগে সর্বস্থানের মানুষ তাহা শুনিতে পাইবে। তৎপর আস্তে আস্তে সিংগার ধ্বনি বজ্র ও বিকট রূপ ধারণ করিবে। এই সিংগার ফুৎকারে আসমান-জমীন এক কথায় যাবতীয় মাখলুকাত ধ্বংস হইয়া যাইবে। আল্লাহ এই সিংগার ফুৎকারের অধিকার একমাত্র ইস্রাফীলকেই দান করিয়াছেন। তিনি নিজের দক্ষিণ উরুর উপর সিংগা রাখিয়া এবং সিংগার মুখে তাহার মুখ লাগাইয়া অবনত মস্তকে কান পাতিয়া সর্বদা অপেক্ষায় আছেন আল্লাহর আদেশ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায়। যখনই আল্লাহর নির্দেশ আসিবে, তখই সিংগার ফুৎকারে সমস্ত সৃষ্ট-জীব ও যাবতীয় পদার্থ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন-'আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, যে দিন ইস্রাফীল আল্লাহর নির্দেশ মতে সিংগার ফুৎকার হাঁকিবেন, সেই দিন নিঃসন্দেহে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইয়া যাইবে।'

ইহা এত তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হইবে যে, মানুষ আহারকালীন যে লোকমা মুখে পুড়িয়াছে, সেই লোকমা (গ্রাস) গিলিতে পর্যন্ত সময় পাইবে না। এমনি ভাবে কাপড় পরিধানকারী কাপড় পরিধান আরম্ভ করিলে তাহাও পরিধান করিতে সময় পাইবে না। শুধু কি তাই, পানি পান করার নিমিত্ত পানি মুখে লইয়া থাকিলেও তাহা পান করিতে সুযোগ পাইবে না।

হজরত ইস্রাফীল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে তিনবার সিংগায় ফুৎকার দিবেন। প্রথম ফুৎকারকে 'নাফখায়ে ফাজা' দ্বিতীয় ফুৎকারকে 'নাফখায়ে সায়েকা' ও তৃতীয় ফুৎকারকে 'নাফখায়ে বায়াস' বলা হয়। যখন এই নশ্বর বিশ্ব-জগতের আয়ু শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইবে, তখন হজরত আজাঈল (মালাকুল-মউত) তাঁহার বিশাল হস্তদ্বয় সপ্ত আকাশ-ভূমিতে বিস্তৃত করিয়া যাবতীয় জীব-জন্তুর রূহ কবজ করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্ব পর্যন্ত ইবলীস (শয়তান) এবং প্রধান চারিজন ফেরেশতার রূহ কবজ করিবেন না।

আল্লাহ পাক বলেন-

'যেদিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন আসমান-জমীনের কোন জীব-জন্তুর চৈতন্য থাকিবে না, তবে আল্লাহ যাহাদের চৈতন্য রাখিতে ইচ্ছা করেন।'

ছাহাবী আবু হুরাইরা বলেন, সিংগার মোট চারটি শাখা থাকিবে। তম্মধ্যে দুইটি শাখা পূর্ব ও পশ্চিমদিক জুড়িয়া বিস্তৃত। অন্য দুইটির মধ্যে একটি জমীনের নীচে এবং অপরটি সপ্ত আসমানের উপর রহিয়াছে। যাবতীয় আত্মার সংখ্যানুযায়ী সিংগার মধ্যে এক একটি ছিদ্র রহিয়াছে। এই সকল ছিদ্রের মধ্যে চারি শ্রেণীর আত্মা রাখিবার জন্য আবার চারটি স্তর আছে, একটি স্তর শুধু নবী ও রাসুলগণের আত্মা রাখিবার জন্য এবং অন্য তিনটির মধ্যে একটিতে মানুষের, একটিতে জিনের ও অপর একটিতে জানোয়ারের আত্মা রাখিবার জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে।

--o--

নাফখা বা সিংগায় ফুৎকার

প্রথম।। নাফখায়ে ফাজা ঃ দুনিয়ার আয়ু যেদিন শেষ হইয়া আসিবে এবং নাফখায়ে ফাজা বা সিংগা বাজিয়া উঠিবে, সেদিন আসমান-জমীনের যাবতীয় সৃষ্ট জীবের মধ্য এক ভীষণ রকমের আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে। সমস্ত শিলাযুক্ত পাহাড়-পর্বত ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া ধুনিত তুলার ন্যায় বায়ুমণ্ডলে উড়িতে থাকিবে। সেদিন আসমান সমূহ ফাটিয়া পড়িতে আরম্ভ করিবে এবং পানির উপর নৌকা যেরূপ তরংগের আঘাতে দুলিতে থাকে, অনুরূপ মাটিরও সেই দিন কম্পন আরম্ভ হইবে। এভাবে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভের সন্তান মাটিতে পড়িয়া যাইবে এবং বন্য পশুরা ভয়ে আসিয়া মানুষের মধ্যে জড় হইবে। সেদিন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ ঝরিয়া মাটিতে পরিতে আরম্ভ করিবে। প্রথম সিংগার ফুৎকার শুনিয়াই শয়তান পলায়ন করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিবে। চন্দ্র-সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, উহাতে আলো বলিতে কিছুই থাকিবে না।

কেয়ামতের ভূ-কম্পন হৃদয় বিদায়ক,
হইয়া যাইবে সকল অস্থির ভয়ানক।
সিঙ্গা হাতে ইস্রাফিল আছেন অপেক্ষায়,
কোন সময়ে ফুকতে খোদা হুকুম দিবেন তায়।
সময় হইলেই হইবে তখন নির্দেশ আল্লাহর ঃ
'হে ইস্রাফিল, দাওগো এবার সিঙ্গাতে ফুৎকার!

আদেশ পেয়ে ফুৎকারিবেন সিঙ্গা ভয়ঙ্কর,
ক্রমেই ধ্বনি ভীষণ হতে হবে ভীষণতর।
সেই দাঁপটে ভাংবে আকাশ টুটবে তারা যত,
পাহাড়গুলো উড়বে তাতে ধুনা তুলার মত।
মানব-দানব, জীব-জানোয়ার কেউ রবেনা আর,
এ পৃথিবীর গ্রহ-রবি সব হবে মিছমার।
ধ্বংস হবে বিশ্ব জাহান সৃষ্টি হবে লয়,
রবেন শুধু একা খোদা অনন্ত অব্যয়।

নাফখায়ে ফাজা বা প্রথম সিংগার ফুৎকার দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ অবিরাম বাজিতে থাকিবে। প্রথম নাফখা শেষ হইলে পৃথিবীর অবস্থা এইরূপ চল্লিশ বৎসর থাকিবে। অতঃপর দ্বিতীয় নাফখা শুরু হইবে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

'হে মানুষ! তোমরা আপন রব্বকে ভয় কর। মনে রাখিও কেয়ামতের কম্পন বড়ই ভীষণতর ব্যাপার।

'ওহে মানবজাত তোমাদের রব্বকে কর ভয়,
অবশ্যই রোজ কিয়ামত ভীষণ অতিশয়!

হাদীছে আছে, উপরিউক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করিয়া হুজুর (ছাঃ) ফরমান-'হে ছাহাবাগণ! তোমরা কি জান যে, এইরূপ ভূ-কম্পন কখন, কোন দিন শুরু হইবে? ছাহাবাগণ উত্তর করিলেনঃ 'আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল ভালরূপে জানেন।' হজরত (ছঃ) বলিলেন, 'তবে জানিয়া রাখ, উহা ঐ দিন হইবে, যে দিন আল্লাহ পাক বলিলেনঃ হে আদম! তোমার সন্তানদিগকে দোজখে নিক্ষেপ কর।' তখন আদম (আঃ) আল্লাহর সমীপে করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিলেনঃ 'হে মহান প্রতিপালক! আমার সন্তানদের মধ্য হইতে কতজনকে দোজখে নিক্ষেপ করিব?' আল্লাহ উত্তর করিবেন, 'তোমার এক হাজার সন্তানদের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জনকে দোজকে নিক্ষেপ কর এবং মাত্র একজনকে বেহেশতে পাঠাইয়া দাও।' ছাহাবাগণ রাসূলে পাকের (ছঃ) এইরূপ ভয়াবহ কথা শুনিয়া ভয়ে ও আতঙ্কে সকলে একযোগে কাঁদিয়া উঠিল। ছাহাবাগণের এইরূপ ক্রন্দন দর্শনে রাসূলে খোদার দয়া হইল। তিনি বলিলেন-

'হে ছাহাবাগণ তোমরা ভয় পাইও না। আমি আশা করি, সকল নবী ও রাসূলগণের উম্মতের মধ্যে যত লোক বেহেশতবাসী হইবে, তন্মধ্যে তোমরা এক তৃতীয়াংশ লোক বেহেশতী হইবে।' অতঃপর রাসূলে পাক (ছঃ) ছাহাবাগণকে শান্ত্বনা দিয়া আরও বলিলেন-'হইতে পারে। তোমাদের মধ্যে অর্দ্ধাংশ লোক এবং অন্য সকল উম্মতের অর্দ্ধাংশ লোক বেহেশতে গমন করিবে।' ছাহাবাগণ রাসূলুল্লাহর (ছঃ) এই শুভ ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা শ্রবণ করতঃ সকলেই খোদার নিকটে শুকরিয়া আদায় করিলেন।

অতঃপর রাসূল (ছঃ) বলিলেন-'হে ছাহাবাগণ! তোমরা অন্যান্য নবীগণের উম্মতের তুলনায় এত অল্প সংখ্যক, যেমন মেষপালের তুলনায় উষ্ট্রের পাল! অর্থাৎ উষ্ট্রের পাল যেমন মেষ পালের তুলনায় অতি সামান্য সংখ্যক, তেমনি উম্মতে মোহাম্মদিয়াও অন্যান্য উম্মতের তুলনায় অতি সামান্য সংখ্যক।' রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আরও বলিলেন যে, তোমরা অন্যান্য উম্মতের মধ্যে সংখ্যায় একহাজারের মধ্যে মাত্র একজন।'

হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ পাকের একশত রহমতের মধ্যে মাত্র একটি রহমত আঠার হাজার মাখলুকাতকে দান করিয়াছেন যাহার কারণে মানব-দানব, পশু-পক্ষী একে অন্যকে মহব্বত করিয়া থাকে। আর বাকী নিরানব্বই ভাগ রহমত কেয়ামতের দিবস তাঁহার নেক বান্দাগণের প্রতি, বিশেষ করিয়া উম্মতে মোহাম্মাদিয়ার প্রতি বর্ষণ করিবেন।

দ্বিতীয়।। নাফখায়ে ছায়েকা ঃ হাদীছ শরীফে আছে, আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত সৃষ্ট জীবকে পুনর্জীবন দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন তিনি সর্ব প্রথম প্রধান চারিজন ফেরেশতা-জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজ্রাঈলকে জিন্দা করিবেন। ইহাদের মধ্যে আবার সর্ব প্রথম জীবিত করিবেন ইস্রাফীলকে। ইস্রাফীল (আঃ) জীবিত হইয়া-আরশ হইতে সিংগা লইয়া বেহেশতে গমন করিবেন এবং বেহেশতের খাদেম ফেরেশতাগণকে বলিবেন-'হে বেহেশতের খাদেমগণ! হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (ছাঃ) এবং তাঁহার উম্মতগণের জন্য তাড়াতাড়ি বেহেশত

সাজাইয়া গুছাইয়া সুসজ্জিত কর।'

রাসূলুল্লাহকে (ছাঃ) অভিনন্দন করিয়া আনয়ন করিবার জন্য আল্লাহ পাক ইতিপূর্বেই তদীয় সওয়ারী 'বোরাক' পয়দা করিয়া রাখিবেন। হজরত ইস্রাফীল, জিব্রাঈল, মীকাঈল আজ্রাঈল (আঃ) বেহেশতের পোশাক পরিচ্ছদ ও তাঁহাকে অভিনন্দনের বোরাক ও 'লেয়াউল হামদ' নামের ঝান্ডা লইয়া রাসূলুল্লাহকে (ছাঃ) তাঁহার মারকাদ (কবর) মোবারক হইতে অভিনন্দনের নিমিত্ত গমন করিবেন।

এই সময় জমীনের যাবতীয় পাহাড়-পর্বত, বন-বাঁদাড় ও উচু-নিচু স্থানসমুহ সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া থাকিবে, এজন্য তাহারা প্রথমে রাসূলুল্লাহর মারকাদ (কবর) শরীফ সহজে চিনিতে পারিবেন না । হঠাৎ তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, রাসুলুল্লাহর (ছঃ) মারকাদ মোবারক হইতে অপূর্ব সৌন্দর্যময় জ্যোতিঃ (আলো) বড় এক খন্ড স্তম্ভের ন্যায় ধীরে ধীরে আসমানের দিকে উঠিতেছে-ইহাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মারকাদ মোবারক বা কবর শরীফ।'

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) ইস্রাফীলকে (আঃ) বলিবেন-'হে ভাই ইস্রাফীল! হাশর-নশরের অধিকাংশ কার্যাদি আপনার উপর ন্যস্ত এবং সমস্ত সৃষ্টজীব একমাত্র আপনার সিংগার ফুৎকারেই হাশর প্রান্তরে ইল-াহীর আদালতে দন্ডায়মান হইবে, কাজেই এখন আপনিই রাসূলুল্লাহকে (ছাঃ) তাঁহার শয়নগাহ হইতে গাত্রোত্থান করিতে আরজ করুন।' হজরত ইস্রাফীল জিব্রাঈলের (আঃ) এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন। অতঃপর হজরত ইস্রাফীল মীকাঈলকে (আঃ) বলিবেন-'হে ভাই মীকা-ঈল! রাসূলুল্লাহকে (ছাঃ) তাঁহার মারকাদ মোবারক হইতে হাশর ময়দানে চলিতে আরজ করুন।

হজরত মীকাঈল (আঃ) ইহাতে সম্মত হইয়া প্রথমবারে নবী করীমের (ছাঃ) রূহ পাককে সালাম করিয়া বলিবেন-হে রূহে পাক! আপনি আপনার পবিত্র শরীরে প্রবেশ করুন।' মীকাঈলের প্রথমবারে এইরূপ বলার পর কবরে পাক হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিবে না। অতঃপর তিনি আবার

বলিবেন-'হে রূহে পাক! কেয়ামত কায়েম হইয়াছে; উঠুন, হাশরের ময়দানে ইলাহির আদালতে স্বীয় উম্মতের শাফায়াতের জন্য চলুন। তাহারা আপনার উপস্থিতির জন্য অসহায় ভাবে তাকাইয়া রহিয়াছে।'

হজরত মীকাঈলের এইরূপ সম্বোধনে হুজুর পাকের (ছঃ) আত্মা তাঁহার পবিত্র শরীরে পবেশ করিবে এবং কবর ফাটিয়া যাইবে। নবী করীমের (ছঃ) মারকাদ মোবারক ফাটামাত্র তাঁহারা হজরতকে (ছঃ) দেখিতে পাইবেন যে, তিনি মস্তক হইতে ধুলা বালু ঝাড়িতেছেন।

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহকে (ছঃ) তাঁতার জন্য বেহেশ হইতে আনীত পরিধানীর বস্ত্র এবং বোরাক দান করিবেন। ইহার পর নবী করীম (ছঃ) হজরত জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিবেন-'হে জিব্রাঈল! ইহা কোন দিবস?'

ফেরেশতা জিব্রাঈল উত্তর করিলেন-'আল্লাহ পাক আপনার সাথে যে দিবসের ওয়াদা করিয়াছেন, ইহা সেই দিবস; এই দিবস পাপীদের জন্য দুঃখময় যন্ত্রণা ও লজ্জার দিবস; সন্তানগণ মাতা-পিতার পরিচয় দিবে না, ইহা সেই দিবস; ইহা হিসাব-নিকাশের পর বেহেশত বাসিগণ তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া বেহেশতে চলিয়া যাইবে, ইহা সেই দিবস; আপনাকে আল্লাহ পাকের নির্দেশে বোরাক নামের আরোহী দ্বারা অভিনন্দন করিয়া হাশর ময়দানে তাহাদের দরগাহে উপস্থিত করিবেন, ইহা সেই দিবস!'

জিব্রাঈলে জিজ্ঞাসিবেন নবী আল-আমীন,
আমার কাছে দাও বলে ভাই আজ হল কোন দিন।
জবাব দিবেন জিব্রাঈল ফেরেশতা আল্লাহর,
এইতো নবী ভীষণ হাশর দিবস ওয়াদার!
লজ্জা-দুঃখ ভয়ের দিবস আজকে কাফিরের,
এইতো রোজে জাজা-দিবস হিসাব নিকাশের।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবার বলিবে-'হে জিব্রাঈল! আমাকে কোন আনন্দের শুভ সংবাদ দাও।' তদুত্তরে জিব্রাঈল বলিবেন-'ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিবস 'লেওয়াউল হামদ' বা প্রশংসিত পতাকা নামে ঝাণ্ডা দ্বারা আপনাকে সম্মানিত করিবেন, সেই ঝাণ্ডা নিয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি! ইহা শুনিয়া রাসূলে খোদা (ছাঃ) বলিবেন–'হে জিব্রাইল! আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, বরং বলুন যে, আমার গোনাহগার উম্মতের কি সংবাদ? তাহাদিগকে কি পুলসেরাতের উপর রাখিয়া আসিয়াছেন?'

এতদশ্রবণে হজরত ইস্রাফীল (আঃ) উত্তর করিবেন–'হে উম্মত দরদী বন্ধু মোহাম্মদ! কোন চিন্তা করিবেন না, আমি এখন পর্যন্ত পুনরুত্থান এবং হিসাব–নিকাশের জন্য সিংগা বাজাই নাই। কেয়ামতের হিসাব–নিকাশ এখনও শুরু হয় নাই। চলুন! আপনি ইলাহির আদালতে উপস্থিত হইলেই হিসাব–নিকাশ আরম্ভ হইবে।' এইবারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন–'হে সঙ্গিগণ! আমার অন্তঃকরণ এতক্ষণে সন্তুষ্ট হইল; চলুন। এই বলিয়া রাসূলে খোদা বেহেশেতী পোশাক এবং টুপি পরিধান করতঃ বোরাকে আরোহণ করিয়া ফেরেশতাগণের সঙ্গে হাশরের ময়দানে উম্মতের শাফায়াতের জন্য রওয়ানা হইবেন।

বোরাকেরে সৃষ্টি কৌশল ঃ বোরাক আরবী শব্দের বাংলা বিদ্যুৎ বা বিজলি। বোরাককে বোরাক এজন্যই বলা হয়। উহা দ্রুতগামী চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ যানবহন! আকৃতি পুরাপুরি জন্তুরও নহে, উহার সৃষ্টি রহস্য ভিন্ন আকার।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে বোরাকে আরোহণ করিয়া আল্লাহর পবিত্র দর্শনে মে'রাজে গমন করিয়াছিলেন, সেই রোরাকেই তিনি আবার আরোহণ করিয়া রোজ হাশরে খোদার দরবারে হাজির হইবেন। উহার দুইখানা অতি শক্তিশালী ডানা আছে, যদ্দারা সে বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ডে উড়িয়া বেড়ায়। উহার মুখমণ্ডলী মানুষের মুখণ্ডলীর আকার এবং কপাল লাল পরশমণির। কর্ণদ্বয় পাতার ন্যায় পাতলা সবুজ রং–এর জমরূদ পাথরের নির্মিত এবং চক্ষুদ্বয় নক্ষত্ররাজির ন্যায় স্নিগ্ধ মধুর আলোয় ঝলমলো। লেজ গরুর লেজের ন্যায়

স্বর্ণ নির্মিত; শরীরের গঠনাকৃতি উট পাখীর ন্যায়; আকারে গাধা হইতে কিছু নীচু এবং খচ্চর হইতে ছোট।

মুখের সুরাত আদম জাতের আছে দুখান ডানা,
পরশমণি সুনির্মিত রাঙ্গা কপাল খানা।
সবুজ বরণ জমরূদে তার গঠিত দুই কান,
নয়ন দুইটি তারার মত নূরেতে রৌশন।
চলন তাহার দ্রুত অতি বিজলী সম তেজ,
গরুর লেজের মত উজ্জ্বল স্বর্ণে গড়া লেজ।
নামটি 'বোরাক' রূপ ও গুণের নাই তুলনা তার,
খাছ বাহন এ খোদার প্রিয় নবী মোস্তফার।
খচ্চর হতে একটু ছোট নীচু গাধার থাকি,
বানায়ে এ আজব বাহন দিছেন খোদা রাখি।

ফেরেশতা জিব্রাঈলের পরামর্শ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই এই বোরাকে আরোহণ করিতে যাইবেন, অমনি বোরাক আতঙ্কিত ভাবে লাফাইয়া উঠিয়া বলিবে–'খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার উপর হাশেমী বংশীর হাশর প্রান্তরে ঝাণ্ডাবাহি আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ খাতেমুল আম্বিয়া ব্যতীত অন্য কেহই আরোহণ করিতে পারিবেন না। রাসূলুল্লাহ বলিবেন–'আমি হাশর প্রান্তরে ঝাণ্ডাবাহি খাতেমুল আম্বিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হাশেমী কোরাইশী' বলিয়া তিনি বোরাকে আরোহণ করিয়া বেহেশতে চলিয়া যাইবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বিদ্যুৎ গতি বাহন বোরাকে বেহেশতে প্রবেশ করা মাত্র গোনাহগার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সেজদায় পড়িয়া যাইবেন। তখন আল্লাহ্ পাকের দরবার হইতে আওয়াজ আসিবে–

'হে মোহাম্মদ! অদ্য মস্তক অবনত ও সেজদা করিবার দিবস নহে–হিস্যাব–নিকাশের দিবস। তাই বলিতেছি শুনুন, 'আপনার কোন অভিপ্রায় থাকিলে চাহিতে পারেন। অদ্য আমি আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিব।' ইহা

শুনা মাত্র দয়াল নবী বলিয়া উঠিবেন; 'হে দয়াময় খোদা! আমি একমাত্র আমার গোনাহগার উম্মতের পরিত্রাণ ব্যতীত আর কিছুই চাহি না।' তখন আল্লাহ্ পাক হযরতকে (ছঃ) তাঁহার গোনাহগার উম্মতের শাফায়াতের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন এবং আরও বলিবেন, 'হে মোহাম্মদ! আপনি যাহাতে সন্তুষ্ট আছেন, আমিও তাহাতে খুশী আছি। কেননা আমিই বলিয়াছি–

'অচিরেই আপনার প্রভু আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবেন।'

পুনরুত্থানের স্বরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ (ছঃ) রোজ হাশরে আল্লাহর দরগাহে হাজির হইলে চল্লিশ দিবস মুষলধারে বারিপাত হইতে আরম্ভ হইবে। এইরূপে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে পড়িতে হাশর প্রান্তর একেবারে প্লাবিত হইয়া প্রায় বার গজ উঁচু পানি জমিয়া যাইবে। এই পানির ক্রিয়া বীর্যের ক্রিয়ার ন্যায়। ইহাতে প্রত্যেক সৃষ্টজীবের পুনর্বার শরীর গঠন হইয়া জীবিত হইয়া উঠিবে! অতঃপর আল্লাহ্ পাক পুনরায় আসমান জমীন সৃষ্টি করিবেন।

সৃষ্টজীব, আসমান ও জমীন পুনঃ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যখন শুধু একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ্ অবশিষ্ট থাকিবেন, তখন আল্লাহ্ পাক জলদগম্ভীর স্বরে বলিবেন–

।। লিমানিল মুলকুল ইয়াওম ।।

'অদ্যকার রাজত্ব ও বাদশাহীর মালিক দাবীদারগণ কোথায়?' অদ্য এই নিখিল বিশ্ব-জগতের মালিক কে?' ইহাতে কোন উত্তর না পাইয়া আল্লাহ্ নিজেই বলিবেন–

।। লিল্লা–হিল ওয়াহিদিল কাহহার ।।

নিখিল বিশ্বের অধিপতি এবং বাদশাহীর মালিক একমাত্র আল্লাহই যিনি অদ্বিতীয় ও মহাপরাক্রমশালী। কবির ভাষায়–

সকল হইলে ধ্বংস বলবেন রব,
শক্তি মদে মত্ত যারা কোথায় তারা সব?

ক্ষমতার পূজারী যে যুবরাজগণ,
কেউতো নাহিক তারা কোথায় এখন?
আমার খাইয়া অন্যে পুজিত যাহারা,
আজিকার এই দিনে কোথায় তাহারা?
কোন শক্তি আর আর বাকী নাহি আছে,
পরাজিত, পর্যুদস্ত সব মম কাছে।

অতঃপর আল্লাহ্ আরো বলিবেন–

কোথায় গেল সেই শক্তির প্রসংশাকারী যুবরাজগণ? কোথায় গেল আমার খাদ্য খাইয়া অপরের প্রশংসা ও ইবাদতকারীগণ! কোন শক্তি অদ্য আর বাকী নাই, সকল শক্তিই অদ্য মহাশক্তিশালী আল্লাহর নিকট পরাজিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক পাহাড়–পর্বতসমূহের বিশাল বিশাল উচ্চ–শৃঙ্গগুলি চূর্ণ–বিচূর্ণ করিয়া সমতল ভূমিতে পরিণত করিবেন এবং যেস্থানে অতিমাত্রায় গোনাহের কার্য হইত, সে স্থানে আল্লাহর নির্দেশে দোজখ কায়েম করা হইবে। আর যে স্থানে তাঁহার ইবাদত–বন্দেগী বেশী মাত্রায় হইত সে স্থানে মাটি সুবাসিত শ্বেত বর্ণের রৌপ্য দ্বারা তৈয়ার হইবে এবং সে স্থানে কায়েম হইবে বেহেশত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যখন আল্লাহ্ পাক মাটি পরিবর্তন করিবেন, তখন লোকজন কোথায় অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর করিলেন, 'হে আয়েশা! তুমি ইহা অত্যন্ত জরুরী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তবে ভালভাবে শোন–সে সময় লোকগণ পোলসেরাতের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে।'

তৃতীয় ।। নাফখায়ে বায়াস ঃ বায়াস মানে পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন। সৃষ্ট জীব ধ্বংস হইয়া গেলে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কবর হইতে

উঠিয়া বোরাকে আরোহণপূর্বক বেহেশতে গমন করিলে আল্লাহ্ পাক হযরত ইস্রাফীলকে (আঃ) তৃতীয়বারের মত সমস্ত প্রাণী পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া হাশর প্রান্তরে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়ার জন্য সিংগা বাজাইতে বলিবেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন-

'আমি যে রূপে/প্রথমবারে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, অনরূপ নূতনভাবে আবার পুনর্জীবিত করিব।'

ইহাকেই বলে 'নাফখায়ে বায়াস।'

আল্লাহ্ পাক হযরত ইস্রাফীলকে (আঃ) লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, 'হে ইস্রাফীল! উঠ এবং সমস্ত মুর্দারকে জীবন প্রাপ্ত হইয়া হাশরের ময়দানের হাজির হইবার জন্য সিংগা বাজাও।

ইস্রাফীল আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র সিংগায় ফুৎকার দিবেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে থাকিবেন-

'হে শরীর হইতে বহিষ্কৃত আত্মা! হে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাড়-মাংস! হে দেহ হইতে খসিয়া মাটিতে পড়া গলিত চামড়া! হে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন লোমসমূহ! আল্লাহর হুকুমে একত্রিত হও এবং কেয়ামতের ময়দানে ইলাহীর আদালতে হিসাবের জন্য হাজির হইয়া যাও।

হযরত ইস্রাফীলের এইরূপ নির্দেশ শুনিয়া খোদার হুজুরে সকল সৃষ্ট জীবের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংগ-প্রত্যংগ একত্রিত হইয়া দিব্বি সুষ্ঠু শরীর গঠন হইয়া উলঙ্গভাবে হাশরের ময়দানে হাজির হইবে। সকল সৃষ্ট-জীব হাশরের ময়দানে উঠিয়া আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড, চন্দ্র-সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নক্ষত্ররাজিকে ভূ-তলে পতিত দেখিতে পাইবে। মানুষ আরও দেখিতে পাইবে ঃ পূর্বের মাটি এখন আর সেইরূপ নাই। সপ্ত সমুদ্রের পানি শুকাইয়া গিয়াছে। সপ্ত দোজখ হইতে আজাব ও নির্যাতনের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনা যাইতে থাকিবে।

অন্যদিকে আবার তারা দেখিতে পাইবে যে, ফেরেশতাগণ মীজান আমল ওজন করিবার নিমিত্ত ব্যস্তভাবে প্রস্তুত করিতেছে। ইহা দেখিয়া

তারা নিঃসহায় ভাবে সেদিকে তাকাইয়া থাকিবে। আরও দেখিতে পাইবে, সকল বেহেশত বেহেশতীদের সুখ ভোগের জন্য নানা রকম ফলফলাদি, হুর-গেলমান দ্বারা সুসজ্জিত করিতেছে। ইহা দেখিয়া তারা দুঃখ ভরে নয়ন মুদিত করিয়া বলিবে-

'হায়রে! কে আমাদিগকে এই সুখ-স্বপন নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিল? হায়। যদি আমরা এইভাবে চিরকাল নিদ্রিত থাকিতে পারিতাম? সামান্য সময়ের জন্যও আমাদের চেতনা ফিরিয়া না আসিত।

এতদশ্রবণে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অনতিদূর হইতে নির্দেশ বাণী জারী করিবেন-

'ইহা সেই দিবস যেই দিবসের কথা আল্লাহ্ পাক পূর্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁর পয়গাম্বরগণ সঠিক সংবাদ দিয়াছিলেন।

--০--

কেয়ামতের ময়দানে বারটি ঝাণ্ডা

হাদীছ শরীফে আছে, ছাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমীপে নিম্নের এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

ঃ ইয়াওমা ইউনফাখু ফিচ্ছুরে------

'যেদিন ইস্রাফীল কর্তৃক সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে; সেদিন লোক দলে দলে হাশর প্রান্তরে হাজির হইতে থাকিবে।

ছাহাবাগণ যখন উক্ত আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুনীরে প্লাবিত করিয়া দিলেন। তাঁর রুমাল অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজিরীনদের বলিলেন—

'হে ছাহাবাগণ। তোমরা অদ্য আমার নিকট এক কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। জানিয়া রাখ, কেয়ামতের দিবস আমার উম্মতগণ ১২টি ঝাণ্ডার নীচে দণ্ডায়মান হইবে।

১। একদল লোক যারা একের কথা অন্যের নিকট মিথ্যা রটাইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করিত এবং তাদের ভিতর সংঘর্ষ বাঁধাইয়া দিত।

ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

'বিবাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ড হইতে মারাত্মক।'

হত্যায় যেরূপ পাপ, দুই দলের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করাও অনুরূপ মহাপাপ।

২। আর এক সম্প্রদায়ের লোক যারা সর্বদা সুদ-ঘুষ খাইয়া থাকিত, কেয়ামতের দিবস হাশরের ময়দানে তারা শূকরের চেহারার আকৃতি রূপ লইয়া উঠিবে।

৩। আর একদল লোক যারা বাদশা কর্তৃক কাজী ও বিচারক বা মুফতী ও ফতোয়া দানকারী নির্বাচিত হইয়া ন্যায় বিচারের পরিবর্তে মুফতী বিপরীত ফতোয়া দিয়া এবং কাজী অন্যায় বিচারের রায় জারী করিয়া পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে; কেয়ামতের দিবস আল্লাহ পাক এই প্রকার কাজী ও মুফতিগণকে অন্ধ করিয়া তাঁর পবিত্র দরবারে উপস্থিত করিবেন।

কোরআন শরীফে আছে—

'তোমরা সমাজের বিচারপতি-নিযুক্ত হইলে তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করিবে।'

নির্বাচিত হইবে যখন তোমরা বিচারপতি,
করবে তখন সূক্ষ্ম বিচার সঠিকভাবে অতি।

৪। আর যে সকল লোক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করিয়া নিজেকে অতি বড় সম্মানিত ও গৌরবান্বিত মনে করিবে এবং আরও মনে করিবে যে, আল্লাহর দরবারে তাদের ন্যায় নিকটবর্তী দ্বিতীয় আর কেহই নাই। আল্লাহ পাক এইরূপ লোকদিগকে কেয়ামতের দিবস হাশর প্রান্তরে মূক বা বোবা করিয়া উঠাইবেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক আত্ম-গৌরবী লোকদিগকে ভালবাসেন না।'

৫। আর যে সকল আলেম, পীর ও মুরশিদ নামে মাত্র লোকদিগকে সৎপথ দেখাইয়া নেক কার্য করিতে আদেশ এবং বদকাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করে অথচ নিজেদের বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীত; আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিবস এই শ্রেণীর ভেল্কিবাজ পীর-পাট্টাদিগের অবস্থা এইরূপ করিবেন যে, তারা নিজেদের জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া নিজেরাই অগ্নি নির্মিত কাঁচি দ্বারা উহা কাটিতে থাকিবে। তাদের মুখ হইতে দুর্গন্ধময় পুঁজ-রক্ত গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে।

কোরআন শরীফে আছে, আল্লাহ বলেন ঃ

'তোমরা লোকদিগকে সৎকার্যের প্রেরণা দাও অথচ নিজেদের বেলায় তা ভুলিয়া থাক?

৬। আর এক ধরণের লোক যারা দেখিয়া বা না দেখিয়া সর্বদা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বেড়ায়, কেয়ামতের দিবস আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে এইরূপ লোকদিগকে অগ্নির কোড়া দ্বারা প্রহার করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

আল্লাহ পাক বলেন—

'অলা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহী ইলম—'যে বিষয়ে তোমার জানা নাই সে বিষয়ে নীরব থাকিও।'

৭। আর একদল লোক যারা সর্বদা আত্মার তাড়নায় সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে নিমগ্ন থাকে এবং সদা-সর্বদা আল্লাহর ইবাদত ও নেককার্য হইতে নিজেকে এড়াইয়া আত্মাকে শান্তিতে রাখিতে চেষ্টা

করে; আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিবস এই শ্রেণীর লোকদিগের শরীর দুর্গন্ধযুক্ত ও হস্ত-পদ জিঞ্জিরাবদ্ধভাবে উঠাইবেন।

আল্লাহ পাক বলেন—

'এই সকল লোক আখেরাতের (পরকালের) বিনিময়ে ক্ষণিকের বিলাস ক্রয় করিয়া থাকে।'

৮। আর এক শ্রেণীর লোক যারা নিজেদের মান-ইজ্জত ও গৌরবার্জনের নিমিত্ত মাল-দৌলত খরচ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মাল-দৌলতের হক আদায় করার নামও লয় না; এই শ্রেণীর লোকদিগকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিবস এইরূপে উঠাইবেন যে, যখন তারা দাঁড়াইতে চেষ্টা করিবে, তখনই মদ্য-মাতাল লোকদের ন্যায় ডানে বামে হেলিয়া-দুলিয়া পড়িতে থাকিবে।

কোরআন শরীফে আছে, আল্লাহ বলেন—

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপার্জিত মাল-দৌলত হইতে পবিত্র মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর।

৯। আর একদল লোক যারা একে অন্যের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কলুষ বিষয় মন্তব্য (গীবৎ) করিয়া থাকিত, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিবস এইরূপ লোকদিগকে দুর্গন্ধময় কাপড় পরিধান করাইবেন। তারা যখন উক্ত কাপড় পরিধান করিয়া চলিতে থাকিবে তখন তাদের শরীর হইতে এত দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইতে থাকিবে যে, মানুষ তাদের নিকটবর্তী হইতে ঘৃণা বোধ করিবে।

আল্লাহ পাক বলেন—

'তোমরা একে অন্যের সম্পর্কে নিন্দা বা খারাপ মন্তব্য করিও না।'

১০। আর এক সম্প্রদায়ের লোক যারা সকল সময় একের কথা অন্যের নিকট মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া তাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই প্রকার লোকদের জিহ্বা আল্লাহ কেয়ামতের দিবস তার মস্তক-পৃষ্ঠের গ্রীবাদেশ হইতে বাহির করিবেন।

১১। আর এক শ্রেণীর লোক যারা মসজিদে ইবাদতের পরিবর্তে কেবল দুনিয়ারী কথাবার্তা বলিয়া থাকে, আল্লাহ পাক এই শ্রেণীর লোকদিগকে পিছনের দিক হইতে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করাইবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

'মসজিদ একান্তই আল্লাহর ইবাদত গৃহ, অতএব সেখানে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও ডাকিও না।'

১২। আর যে সকল লোক দুনিয়ায় থাকিয়া সুদের ব্যবসা করিত এবং সর্বদা সুদ গ্রহণ করিয়া থাকিত; আল্লাহ পাক এই শ্রেণীর লোকের বিষয় কেয়ামতের দিবস ফেরেশতাদিগকে বলিবেন—'হে ফেরেশতাগণ! তোমরা উহার মাথা নীচে ও পা উপরের দিকে রাখিয়া মুর্দাটানার মত টানিতে থাক।' ফেরেশতাগণ সেরূপ টানিতে থাকিবে। অবশেষে উহাদিগকে ঐ অবস্থায় দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

--০--

হাশর ময়দানে বার সারি

অপর একখানা হাদীছে জানা যায়—হজরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)—বর্ণনা করয়াছেন—রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিবস অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার মধ্য দিয়া আমার উম্মতকে আল্লাহ পাক ১২ (বার) দলে বিভক্ত করিয়া ১২ সারিতে দাঁড় করাইবেন। যথা—

১। এক সারির লোক এইরূপ হইবে যে ইস্রাফীল (আঃ) সিংগায় ফুৎকারের পর তাদের হাত-পা কর্তিত অবস্থায় কবর হইতে উঠিয়া হাশর প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইবে। তখন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর নিকটবর্তী

ফেরেশতাগণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবেন—'এই সকল লোক সর্বদা তাদের প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে লিপ্ত থাকিত এবং এই অবস্থায় তারা তওবা না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাই ওদেরকে অদ্য কেয়ামতের ময়দানে এইরূপ দুরবস্থায় উঠান হইয়াছে। ইলাহীর আদালতে হিসাব-নিকাশের পরে ওদিগকে দোজখের ভীষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে।

পড়শীদের কষ্ট যারা দেয়গো দুনিয়ায়,
উঠবে তারা হাশর মাঠে 'মোছলা' অবস্থায়।
হাত-পা যাদের কর্তিত হয় মোছলা তার নাম,
বিচার শেষে এদের হবে কঠিন জাহান্নাম।

২। আরও এক সারির লোক এইরূপ হইবে, যারা কবর হইতে জানোয়ার (পশুর) আকৃতি ধারণ করিয়া হাশর প্রান্তরে উপস্থিত হইবে। তখন আবার খোদার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার বলিবে ঃ

'এই সকল লোক দুনিয়ায় থাকিয়া নামাজ পড়িবার কালে অলসতার সহিত নামাজ আদায় করিত। নামাজ পড়িবার কালে যথারীতি রুকু, সেজদা, কেয়াম ইত্যাদি করিত না এবং মৃত্যুর পূর্বে এইরূপ গোনাহ হইতে তওবা করিয়াও মরে নাই, তাই অদ্য ওদিগকে জানোয়ারের আকৃতি প্রদান করিয়া কবর হইতে উঠান হইয়াছে। হিসাব-নিকাশের পরে ওদিগকেও দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

আল্লাহ পাক বলেন—

'অলসতার আশ্রয়ে যে মুছল্লিরা নামাজ আদায় করে, তাদের জন্যে শত দুঃখ ও ধিক!'

অলসতার সাথে নামাজ আদায় করে যারা,
হাজির হবে জানোয়ারের সুরাত ধরে তারা।

৩। আর এক সারির লোক এইরূপ হইবে যে, যারা কবর হইতে পাহাড়-পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড দেহসহ কেয়ামতের ময়দানে ইলাহীর

আদালতে উপস্থিত হইবে। তাদের শরীর সর্প ও বিচ্ছু ইত্যাদিতে দংশন করিতে করিতে জর্জরিত করিয়া ফেলিবে। এইরূপ লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহর দরবার হইতে নির্দেশ আসিবে ঃ 'ঐ সকল লোক দুনিয়ায় থাকিয়া অজস্র ধন-দৌলত উপার্জন করিয়াছিল, কিন্তু তাদের মালের জাকাত কখনো আদায় করে নাই। জাকাতের কথা শুনিলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হইত। ওরা মৃত্যুকালে এইরূপ গোনাহ হইতে তওবা করিয়াও মরে নাই।

তাই তাদের অদ্য এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। হিসাবান্তে আবার তারা অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত হইবে। তাদের সঞ্চিত টাকা-পয়সা, আশ্রাফী গরম করিয়া, তা দ্বারা তাদের কপালে দাগ দেওয়া হইবে।

করছে কামাই দুনিয়াতে বিত্ত বেশুমার,
কিন্তু নাহি করিয়াছে যাকাত আদায় তার।
শরীর হবে বিশাল তাদের উঁচু পাহাড় যত,
সেই দেহকে বিচ্ছু ও সাপ কাটবে অবিরত।
এই হালতে পৌছবে তারা হাশর মাঠের পরে,
বিচার শেষে ফেলবে তাদের জাহান্নামে ধরে।
তাতাইয়া 'মোহর দেরেম দোজখী অগ্নিতে,
দিয়ে দিবে ছাপ তা দিয়ে পাঁজর পেশানীতে।

ওদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

'অল্লাজীনা ইয়াকনিযুনাজ্জাহবা অল-ফিদ্দ্বাতা----

'যে সকল লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া আল্লাহর রাস্তায় জাকাত বা ছদকা আদায় না করে; হে মোহাম্মদ! আপনি তাদিগকে ভীষণ আজাবের দুঃসংবাদ দিন। তাদের আজাব এই যে, যেদিন তাদের প্রতি দোজখের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইবে, সেদিন তাদের মুণ্ড, পার্শ্বদেশ ও পিঠ পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। আর এক সারির লোক এমন হইবে যে, যাদের মুখ হইতে দুর্গন্ধময় রক্ত নির্গত অবস্থায় কবর হইতে উঠিবে এবং তাদের নাড়িভুড়ি

সমূহ পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করা থাকিবে। উহার কষ্ট ও যন্ত্রণায় তারা মাটিতে লুটাইয়া গড়াগড়ি করিবে। আল্লাহ পাকের নিকটতম ফেরেশতাগণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে, 'অই সকল লোক ধোকাবাজ ব্যবসায়ী। এরা ঐরূপ ধোকাবাজী করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন মৃত্যুর পূর্বে তারা গোনাহ্ হইতে তওবা করে নাই। তাই অদ্য হাশরের ময়দানে এইরূপ কষ্টভোগ করিতেছে। বিচারের পর আবার ভীষণ দোজখের অগ্নিতে জ্বলিতে হইবে।

৫। আর এক সারির লোক কবর হইতে এইরূপ অবস্থায় উঠিবে যে, তাদের শরীর পচা মৃতদেহের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইবে। তাদের সংস্পর্শ হইতে লোকজন দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। ফেরেশতাগণ এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে ডাকিয়া বলিবে ঃ 'ওরা সে সব লোক যারা লোকের অদৃশ্যে চুপে চুপে গোনাহর কার্য করিত। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বলিতে কিছু ছিল না, মৃত্যুর আগে তারা এইরূপ গোপন পাপ হইতে তওবা করে নাই এবং সেই অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাজেই অদ্য তাদিগকে এরূপ ঘৃণিত দুর্গন্ধময় দেহে হাশরের ময়দানে উঠান হইয়াছে। এই আজাবই তাদের শেষ নহে বরং হিসাব-নিকাশের পর পুনঃ দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।'

৬। আর এক সারির লোক কবর হইতে তাদের গলদেশে বিষধর সাপ ঝুলন্ত অবস্থায় কবর হইতে উঠিবে। এই সকল সাপ তাদের গলায় ভীষণভাবে দংশন করিতে থাকিবে। ফেরেশতাগণ তাদের সম্পর্কে ডাকিয়া বলিবে, 'ঐ সকল লোক সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিল। তাই তাদের অদ্য এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। শুধু ইহাই তাদের শেষ নহে বরং পরিশেষে তাদিগকে দোজখে যাইতে হইবে।

৭। আর এক সারির লোক এমন হইবে, যারা কবর হইতে জিহ্বাবিহীন হইয়া হাশরের ময়দানে ইলাহীর আদালতে হাজির হইবে। ওদের মুখগহ্বর হইতে সর্বদা পুঁজ-রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে। আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ আওয়াজ দিয়া বলিবে ঃ এই সকল লোক সত্য সাক্ষ্য গোপন করিয়া থাকিত স্বার্থসিদ্ধির তাড়নায় তখন দর্শনীয় সত্যকেও প্রকাশ পাইতে দিত না। ওরা সমস্ত জীবন এইরূপ কুকার্য করিয়াই জীবন কাটাইয়াছে, মৃত্যুকালে তওবা করিয়াও মরে নাই। তাই অদ্য হাশরের ময়দানে তাদেরকে এইরূপ আজাব ভোগ করিতে হইতেছে। পরিশেষে পুনঃ দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আল্লাহ পাক বলেন—

'তোমরা সত্য সাক্ষ্য গোপন করিও না, যে ব্যক্তি সত্য গোপন করিল নিশ্চয় সে নিজের আত্মাকে গোনাহে লিপ্ত করিল।'

৮। আবার অন্য এক সারির লোক এরূপ হইবে, যাদিগকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে তাদের মস্তক নীচু এবং পা ঊর্ধ্ব অবস্থায় উঠাইবেন। এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাদিগকে হেঁচড়াইতে থাকিবে এবং তাদের লজ্জাস্থান হইতে পুঁজ-রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে। এমন সময় আল্লাহ পাকের নিকটতম ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলিবে ঃ 'ঐ সকল লোক দুনিয়ায় সর্বদা জেনার কার্যে লিপ্ত থাকিত। অথচ মরিবার কালেও তারা তওবা করিয়া মরে নাই। তাই অদ্য তাদিগকে এই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। শেষ পর্যন্ত আবার ওরা দোজখের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হইবে।'

হাশর মাঠে হাজির হবে কতক গুনাগার,
'কদম তাদের' উপর দিকে নীচের দিকে 'ছার'।
হেঁচড়াইয়া টানবে তাদের 'মালাইকার' দল,
পুঁজ ঝরিবে লজ্জার স্থান হইতে অবিরল।
ফেরেশতারা বলবে এরা করছে জিনার কাম,
বিচার শেষে এদের হবে কঠিন জাহান্নাম।

কোরআন শরীফে আছে, আল্লাহ বলেন—

'তোমরা জেনার কাছেও যাইও না, জেনা জঘন্য গুনাহ।'

৯। আর এক সারির লোক কাল কুৎসিত বিবর্ণ চেহারা লইয়া কবর হইতে উঠিবে। তাদের চক্ষুদ্বয় নীল বর্ণ এবং পাকস্থলী দোজখে প্রজ্জ্বলিত কাঠের টুকরায় পরিপূর্ণ থাকিবে। এই সকল লোকদের সম্পর্কে ফেরেশতাগণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে ঃ 'এ সকল লোক দুনিয়ায় থাকিয়া নাবালেগ এয়াতীম শিশু-সন্তানের ধন-সম্পত্তি লুটিয়া খাইয়াছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই দুরাচার তাদের নিকট হইতে দাবী না ছাড়াইয়া তওবাবিহীন অবস্থায় মরিয়াছে। তাই অদ্য তাদের এইরূপ শাস্তি হইতেছে। ইহাই শেষ নহে, বরং শেষ পর্যন্ত তারা জ্বলন্ত দোজখের ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

'তারা ইয়াতীমের ধন-সম্পত্তি লুটিয়া খাইল না যেন তাদের পেটে অগ্নিশিখা ধারণ করিল।'

দুনিয়াতে খাইল যারা বিত্ত ইয়াতীমের,
জ্বলবে তাদের পেটের মাঝে অগ্নি দোজখের।

১০। আর এক সারির লোক হাত, পা লেংড়া অবস্থায় কবর হইতে উঠিবে। ঐ সকল লোকের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের নিকটতম ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলিলঃ ঐ সকল পাপীষ্ঠরা সর্বদা মাতা-পিতাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়া থাকিত এবং এই পাপের বোঝা লইয়া ওরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাই অদ্য হাশরের ময়দানে ইলাহীর আদালতে ওদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। বিচারান্তে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

দুঃখ-ক্লেশ পিতা-মাতায় দানে যে সন্তান,
লেংড়া পৌছিবে সে হাশর ময়দান।

আল্লাহ পাক বলেন—

'তোমরা মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর।'

১১। আর একদল লোক অন্ধ হইয়া হাশরের ময়দানে ইলাহীর আদালতে হাজির হইবে। তাদের দন্ত এবং ওষ্ঠ এত বড় হইবে যে, প্রত্যেকটি দন্ত একটা গরুর শিং-এর ন্যায় হইবে এবং ওষ্ঠদ্বয় তাদের পেট পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িবে। ওরা এইরূপ ভয়াবহ দুরাকৃতি অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইলে আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাগণ চীৎকার করিয়া বলিবে ঃ 'ঐ সকল দুরাকৃতি পাপীষ্ঠেরা দুনিয়ায় থাকিয়া

সর্বদা মদ্য পানে লিপ্ত থাকিত এবং বন্ধু-বান্ধবগণকেও সেই পাপে লিপ্ত করাইত। তাই অদ্য তাদের এইরূপ দুরাকৃতি ভাবে হাশরের ময়দানে হাজির হইতে হইয়াছে। এতেই তাদের সাজা শেষ হইবে না; বরং শেষ বিচারের পর আল্লাহ পাকের নির্দেশে ওদিগকে অগ্নির জিঞ্জিরাবদ্ধ করিয়া অধঃমুখে দোজখের ভীষণ অগ্নির মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে।'

আল্লাহ পাক বলেন—

'ইন্নামাল খামরু অর মাইসিরু--

দুনিয়াতে যে সব পাপী করল সুরা পান,
অন্ধ হয়ে উঠবে তারা হাশর ময়দান।
দন্ত হবে গো-শিং সম বিকট অতিশয়,
পেট অবধি পড়বে ঝুলে তাহাদের অধরদ্বয়।
অগ্নিশিকল দিয়ে বেঁধে কইরা অধঃমুখ,
ফেলবে ভীষণ দোজখে, ভোগবে তথায় দুঃখ।

১২। আর এক শ্রেণীর লোক অতি সমাদরের সহিত কবর হইতে উঠিবে। যাদের চেহারা পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আলোকিত হইবে এবং বিজলীর ন্যায় নিমিষের মধ্যে পুলসিরাত পার হইয়া অতি সম্মানের সহিত বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ পাকের নির্দেশে উহাদের সম্পর্কে চতুর্দিকে হইতে দলে দলে ফেরেশতাগণ এককণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে থাকিবে—

'উহারা ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর ভয়ে সকল সময় তাঁর নির্দেশিত কার্যাবলী সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়াছে এবং অন্যকে পালন করিতে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়াছে; লোকদিগকে আল্লাহর ভয় দেখাইয়া গোনাহর কার্য হইতে বিরত রাখিয়াছে। শুধু তাই নহে, বরং তারা দিবারাত্রে অধিকাংশ সময় অতি মিনতির সহিত নামাজ আদায় করিত, ফরজ নামাজ জামাতে পড়িত ইত্যাদি। মোটকথা, আল্লাহ আদেশ-নিষেধের প্রতি সর্বদা সচেতন থাকিত। এমনকি মৃত্যুকালে তওবা করিয়া অতি পবিত্রতার সহিত আল্লাহর দরবারে হাজির হইতেও পারিয়াছে। তাই অদ্য আল্লাহ পাক তাদিগকে এইরূপ নেয়ামত দান করিয়াছেন। আল্লাহ তাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছেন এবং থাকিবেন। তাদের চির বাসস্থান জান্নাতুল-ফিরদাউস। সেখানে তারা হইবে চিরসুখী। দুঃখ বলিতে তাদের কিছু থাকিবে না।

এই দুনিয়ার মাঝে যে সব খাঁটি ঈমানদার,
ভয় করিয়া চলেন খোদার হুকুম মানেন তাঁর।
আপনি চলেন অপরকেও চালান খোদার পথে,
ফিরিয়ে রাখেন লোকদিগকে পাপের রাহা হতে।
নামাজ রোজা সব ইবাদাত সঠিক ভাবে করে,
মউত কালে ঈমান সহ পৌছিল কবর ঘরে।
'আল্লাহ পাকের এসব প্রিয় বান্দা আখেরাতে,
কবর হতে উঠবে মহা ইজ্জতেরি সাথে।
চারিদিকে থাকবে তাদের জমাত ফেরেশতার,
বদন হবে উজ্জ্বল যেন চন্দ্র পূর্ণিমার।
এদের প্রতি মহা খুশী আল্লাহ পাক জাত,
এদের তিনি দিবেন সুখের অনন্ত জান্নাত।

--০--

পুনরুত্থান ঃ কবর হইতে উঠা

কথিত আছে, হযরত ইস্রাফীলের (আঃ) সিংগার ফুৎকার সমস্ত সৃষ্টজীব নিজ নিজ কবর হইতে উঠিয়া যথাস্থানে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনাহারে দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাদের সবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বসিতে পারিবে না। বাকশক্তি তথা কথা বলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কথোপকথন করিতে পারিবে না।

হাদীছ শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামতের দিবস আপনার উম্মতদিগকে কি চিহ্ন দ্বারা চিনিতে পারিবেন?'

তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলিলেন, 'গায়রে মোহাজ্জিলীন' চিহ্ন দ্বারা অতি সহজে আমার উম্মতগণকে চিনতে পারিব। অর্থাৎ আমার উম্মতে মোহাম্মদিয়া অজু করিবার সময় যে সকল অঙ্গ-প্রত্যংগ ধৌত করিয়াছিল, সেই সকল স্থান কেয়ামতের দিবস পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হইবে। তিনি সেই আলোক চিহ্ন দেখিয়া তাঁর উম্মত বলিয়া চিনিতে পারিবেন।

কবির ভাষায়—

কিয়ামতে মুমিনগণের অজুর জাগা যত,
নূরে উজ্জ্বল হইবে সে সব দীপ্ত চাঁদের মত।

অন্য এক হাদীছে আছে, সমস্ত মানব জাতি যখন নিজ নিজ কবর হইতে উঠিয়া হাশরের ময়দানে ইলাহীর আদালতে দণ্ডায়মান হইবে, তখন ফেরেশতাগণ অতি সমাদরে মোমেন ব্যক্তিদের নিকটবর্তী হইয়া তাদের শরীর হইতে ধূলা-মাটি ঝাড়িতে থাকিবে। অবশ্য ফেরেশতাগণ তাদের শরীর হইতে ধূলা-মাটি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে পারিবে না। অতঃপর আরও কতেক ফেরেশতা একত্রিত হইয়া উহা ঝাড়িতে-মুছিতে শুরু করিলেও ব্যর্থ হইবে। ফলতঃ উহা মুছিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইবে।

এতদ্দর্শনে আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে সাদরে ডাকিয়া বলিবেন—'হে ফেরেশতাগণ! তোমরা ঐ ধূলা-মাটি যতবার যত ফন্দি করিয়াই ঝাড় না কেন, প্রত্যেক বারই বিফল মনোরথ হইবে। কেননা উহা প্রকৃত মাটি নহে, বরং উহা যে মসজিদ এবং মসজিদের মেহরাবের মাটি। তোমরা ঐ মাটি যথাভাবে রাখিয়া দাও যেন উহারা পুলসিরাত পার হইয়া জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করিলে পর অন্যান্য লোকগণ দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, উহারা আমার একান্ত অনুগত বান্দা বা গোলাম!

নামাজির নামাজকালে যে সকল অংগ মাটিতে স্পর্শ করে, সেই সকল অংগকে সেজদার স্থান বলা হয় এই সকল স্থান সাতটি; যথা—হস্তদ্বয়ের তালু, কপাল, হাঁটুদ্বয় ও পায়ের অঙ্গুলীসমূহ। কেহ কেহ নাককেও সেজদার স্থানের মধ্যে গণ্য করেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন—আল্লাহ কেয়ামতের দিবস যখন কবর হইতে সকল মুর্দারকে উঠাইবেন তখন তিনি বেহেশতের খাদেম তথা বেহেশতের দ্বার রক্ষক ফেরেশতাকে সংবাদ পাঠাইয়া বাণী দিবেন—

'ওহে বেহেশতের দ্বাররক্ষক ফেরেশতা! আমার বান্দাগণের মধ্যে রোজাদার বান্দাগণ অনাহার ও তৃষ্ণাতুর হইয়া কবর হইতে উঠিয়াছে, তাই তাদের পানাহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখ।'

বেহেশতের দ্বার রক্ষক ফেরেশতা আল্লাহ পাকের নির্দেশ পাওয়া মাত্র বেহেশতের খাদেম হুর-গেলমান দিগকে ডাকিয়া বলিবেন—'আল্লাহ পাকের নির্দেশ হইয়াছে, তাঁর প্রিয় রোজাদার বান্দাগণের জন্যে পানাহারীর সামগ্রী প্রস্তুত রাখিতে। তাই তোমরা তাড়াতাড়ি তাদের জন্য বেহেশতের খাদ্য-খাদক লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।'

অমনি বেহেশতের হুর-গোলমানেরা নানা রকমের বেহেশতের ফলমূলাদি, সুন্দর সুস্বাদু খাদ্য ও সুমধুর তৃষ্ণা নিবারণশীল শরবৎ বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যময় খাঞ্চা পরিপূর্ণ করিয়া বেহেশতের দ্বাররক্ষক ফেরেশতার নিকট উপস্থিত হইবে।

ইত্যবসরে রোজাদার মো'মেন বান্দাগণ বেহেশতের দ্বার পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবেন। এদিকে হুর-গেলমানেরাও সমস্ত খাদ্য-খাদক লইয়া বেহেশতের দ্বারে অপেক্ষা করিতে থাকিবে। রোজাদারগণ বেহেশতের দরজায় পৌছা মাত্র তাহারা তাহাদের সম্মুখে উক্ত খাদ্যাদি উপস্থিত করিয়া বলিবে—

কবির কথায়—

খোদার লাগি তোমরা ধরায় ছাড়ছ পানাহার,
যত খুশী আজ তোমরা খাও বিনিময়ে তার।

'দুনিয়ায় থাকিয়া নির্ধারিত কিছুদিন পানাহার না করার পরিবর্তে অদ্য এই সকল খাঞ্চা হইতে যাহা ইচ্ছা পানাহার করুন।

রোজাদারগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই এইরূপ সুস্বাদু খাদ্য খাদক খাইয়া দিব্বি আরামে বেহেশতে প্রবেশকালে হুর-গেলমানেরা এই বলিয়া অভিনন্দন জানাইবে—

কবির কথায়—

আমরা সুখের অনন্ত ধাম বেহেশত উদ্যান,
প্রবেশ কর ইহার মাঝে দিন কর গুজরান।

'আসুন। বেহেশত আপনাদের জন্য অতি শান্তিময় স্থান, ইহার মধ্যে চিরস্থায়ী ভাবে প্রবেশ করুন।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, মানবজাতি যখন কবর হইতে উঠিয়া হাশর প্রান্তরে উপস্থিত হইবে, তখন

ফেরেশতাগণ তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে করমর্দন করতঃ সাদর স্বাগতম জানাইবেন, তারা হইলেন—

১। যাঁহারা ধর্ম যুদ্ধে শহীদ (নিহত) হইয়াছেন,

২। রমজান মাসে যাঁহারা রোজাব্রত পালন করিয়াছেন এবং

৩। যে সকল লোক হজ্জের মৌসুমে আরফার দিবস রোজা রাখিয়াছেন।

হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন—'আল্লাহ পাকের নিকট সকল দিনের শ্রেষ্ঠ এবং অতি পবিত্র দিন—জুমুআ ও হজ্জের মৌসুমে আরফার দিন। আল্লাহতা'য়ালা—এই দুই দিন তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের প্রতি রহমতের বন্যা বহাইয়া থাকেন। অপর দিকে ইবলীস শয়তানের নিকট এই দুই দিন অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্টকর। অতঃপর হজরত (ছাঃ) আয়েশাকে (রাযিঃ) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'হে আয়েশা। যে ব্যক্তি আরাফার দিবস রোজা রাখে তাহার জন্য আল্লাহ পাক তাঁহার শান্তি ও রহমতের ত্রিশটি দরজা খুলিয়া দেন এবং ত্রিশটি দুঃখ ও কষ্টের দরজা বন্ধ করিয়া থাকেন।

আর যদি কোন ব্যক্তি আরফার দিবস রোজা রাখিয়া সন্ধ্যার পর পানিদ্বারা ইফতার করে তবে উক্ত ব্যক্তির জন্য শরীরের যাবতীয় শিরা-উপশিরা তাহার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে ভোর পর্যন্ত করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিতে থাকিবে ঃ 'হে খোদা। এই ব্যক্তির জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলিয়া দাও এবং উহাকে কবুল কর।'

হাদীছ শরীফে আছে, রোজাদারগণ যখন তাহাদের কবর হইতে উঠিবে, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদের পানাহারের জন্য উত্তম সুস্বাদু খাদ্যাদি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিবে—'হে রোজাদারগণ! দুনিয়ায় থাকিয়া আল্লাহর ভয়ে অতি কষ্ট স্বীকার করিয়া রোজা রাখিয়াছেন, তাই অদ্য আপনারা তৃপ্ত হইয়া পানাহার করুন।' রোজাদারগণ অতি আনন্দের সহিত পানাহার করিতে থাকিবে। এদিক অন্যান্য লোক ইলাহীর আদালতে কৃত কর্মের জবাবদিহিতে ব্যস্ত থাকিবে। তাহারা দুঃখ করিয়া বলিবে, হায়রে! দুনিয়ায় থাকিতে সামান্য কষ্টভোগ করিয়া কেন রোজা রাখিলাম না।

অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন, মানুষ মাতৃগর্ভ হইতে যে রূপ উলংগ এবং নগ্ন পদে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, অনুরূপ

কেয়ামতের দিবসও সকল মানুষ উলংগ এবং নগ্ন পদে হাশর প্রান্তরে উপস্থিত হইবে। হাশর প্রান্তরে আল্লাহর সমীপে হিসাব-নিকাশ দেওয়ার জন্য মানুষের অন্তরে এত ভীতির সৃষ্টি হইবে যে, সর্বদা তাহারা আল্লাহর কৃপাপানে আসমানের দিকে তাকাইয়া থাকিবে ঃ কোন সময় কাহার উপর কি হুকুম আসিয়া পড়ে। এইভাবে সমস্ত মানুষ অনাহারে চল্লিশ দিবস ব্যাপী দাঁড়াইয়া থাকিবে।'

হাশরের ময়দানে সূর্য এত নিকটবর্তী হইবে যে, প্রত্যেকের মস্তক হইতে সূর্য মাত্র অর্ধ হাত উপরে থাকিবে। সূর্য এত নিকটবর্তী হওয়ার দরুণ কাহারও মাথার মস্তক গলিয়া ঘর্মের আকারে কর্মফল অনুযায়ী হাঁটু, কোমার ইত্যাদি পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। এই ভয়াবহ সূর্যের তাপের সময় দয়াময় আল্লাহ তাঁহার প্রকৃত মো'মেন ব্যক্তিগণকে স্বীয় অসীম রহমতের ছয়াতলে স্থান দিবেন।

ঐ যে রবি আজকে যাহা অনেক দূরে আছে,
হাশর মাঠে পৌছবে তাহা আধ হাত কাছে।
এত নিকট পৌছবে বলে লাগবে ভীষণ তাপ,
পাইবে সাজা সেই তাপেতে যাহার যেমন পাপ।
গুনাগারের মাথার মগজ পড়বে গলে গলে,
কারুর হাঁটু কারুর মাজা ডুববে ঘামের জলে।
হাবুডুবু খাইবে ঘামে ডুববে কারুর কায়া,
কিন্তু মু'মিন বান্দা পাবে 'আরশ' তলে ছায়া।

হজরত আয়েশা (রাযিঃ) একদা হজরতের (ছঃ) সমীপে আরজ করেন—'ইহা রাসূলাল্লাহ (ছঃ)! কেয়ামতের দিবস আল্লাহর কোন শ্রেণীর বান্দা সোয়ার হইয়া কি হাশর প্রান্তরে হাজির হইবে?' রাসূলুল্লাহ হাসিয়া উত্তর করিলেন—, সকল নবী ও তাঁহাদের আহলে বায়েতগণ হাশর প্রান্তরে সোয়ার হইয়া আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে।' তিনি আরও বলিলেন—'অন্য এক শ্রেণীর লোকও হাশরের ময়দানে সোয়ার হইয়া উঠিবে, যাহারা রজব, শা'বান ও রমজান এই তিন মাস একাধারে রোজাব্রত পালন করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আরও বলিলেন—হাশরের ময়দানে সকল মানুষই অনাহারে কাতর হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। কিন্তু নবী ও তাঁহাদের আহলে বায়েত এবং যে সকল লোক

রজব, শাবান ও রমজান এই তিন মাস একাধারে রোজা রাখিত, তাহাদিগকে আল্লাহ পাক আপন অসীম রহমতে পানাহার করাইবেন।

-০-

হাশর ময়দান

হাশর আরবী শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া; অর্থাৎ কবর হইতে তামাম মুর্দেগান বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন মর্যাদায় উঠিয়া হিসাব-নিকাশের জন্য একস্থানে জামায়েত হওয়া।

এ সম্পর্কে হাদীছের মর্মে জানা যায়, কেয়ামতের ময়দানে ইলাহীর আদালতে সকল মানুষকে মোট একশত বিশ সারিতে দাঁড় করানো হইবে। প্রত্যেক সারিতে অসংখ্য মানুষ দণ্ডায়মান থাকিবে। এই একশত বিশ সারির মধ্যে তিন সারি সকল নবীর উম্মতের মো'মেন মুসলমানগণের হইবে। আর বাকী একশত সতর সারি কাফেরগণের হইবে।' অন্য এক হাদীছে আছে, কিয়ামতের ময়দানে উম্মতে মোহাম্মদিই মোট একশত বিশ সারিতে দণ্ডায়মান হইবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম-গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, কেয়ামতের ময়দানে একশত বিশ সারি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার হইবে। এই মতই সর্ববিদিত। ইমাম ছায়ুতী (রহঃ) বলেন, হাশরের ময়দানে সকল বেহশতবাসীদের মোট একশত সারি হইবে, তন্মধ্যে আশি সারি উম্মতে মোহম্মদিয়ার এবং বাকী চল্লিশ সারি অন্যান্য নবীগণের উম্মতের হইবে। মোটকথা, উম্মতে মোহাম্মদিয়াই বেশী সংখ্যক বেহেশতবাসী হইবে।

সকল নবীর উম্মা' সকল মানব জাতি জুড়ি,
হাশর মাঠে কাতার হবে একশত এক কুড়ি।
ইহার মাঝে মোদের প্রিয় নবী মোস্তফার,
আশি কাতার উম্মা' হবে রহমতে আল্লাহর।

--০--

হাশর প্রান্তরে মানুষ তিন দলে বিভক্ত

হাদীছ শরীফে আছে-কেয়ামতের দিবস সূর্য যখন মানুষের মাথা হইতে অর্ধ হাত উপরে থাকিবে এবং সূর্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইয়া

উঠিবে, তখন অগ্নির একখণ্ড মেঘ আসিয়া হাশরবাসী মানুষগণের মাথার উপর দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে ছায়া ধরিবে। অতঃপর উপর হইতে একটি নির্দেশ আসিবে–'হে হাশরবাসীগণ! তোমরা উক্ত ছায়াতলে চল।' এই নির্দেশ শুনামাত্র সকল মানুষ তিন দলে বিভক্ত হইয়া উক্ত অগ্নি নির্মিত মেঘের ছায়ার দিকে রওয়ানা হইবে। এক দলে মো'মেন মুসলমানগণ থাকিবে। অন্যদলে থাকিবে মোনাফেকগণ আর এক দলে থাকিবে কাট্টা কাফেরগণ।

উক্ত তিন দল যখন মেঘের ছায়াতলে গিয়া দাঁড়াইবে তখনই মেঘখণ্ড তিন অংশে বিভক্ত হইয়া যাইবে। মেঘের এক অংশ অধিক মাত্রায় গরম, দ্বিতীয়াংশ ধুয়ার ন্যায় অন্ধকার এবং তৃতীয়াংশ শান্তিদায়ক আলোকের ন্যায় হইয়া যাইবে।

এই মর্মে আল্লাহ পাক বলেন–

'তোমরা তিনগুণ বিশিষ্ট ছায়ার দিকে চল।'

মোনাফেকগণ মেঘের যে অংশে পৌছিবে, সেই অংশ অত্যধিক গরম হইবে। কেননা, তাহারা দুনিয়ায় থাকিয়া এইরূপ গরম হইতে নিজেদের আত্মাকে যুদ্ধ হইতে বাঁচাইয়া রাখিত এবং বলিত, আমরা সূর্যের তাপের দরুণ রাসূলুল্লাহর সাথে ধর্ম যুদ্ধে যোগদান করিতে পারি নাই। আল্লাহ পাক তাহাদের এই চক্রান্তের দরুণ তাহাদিগকে হাশরের ময়দানে শাস্তি প্রদান করিবেন।

আল্লাহ পাক বলেন–

'বলুন, জাহান্নামের অগ্নি উহা হইতেও সমধিক গরম।'

কাফেরগণ মেঘের যে অংশে পৌছিবে, সেই অংশ ধুঁয়ার ন্যায় অন্ধকার হইবে! কেননা কাফেরগণ দুনিয়ায় থাকিয়া ইসলামের জ্যোতি হইতে অন্ধ ছিল, তাহারা আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) ও জগত সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই আল্লাহ পাক তাহাদিগকে হাশর প্রান্তরে এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন মুছীবতের ঘোর অন্ধকারে স্থান দিবেন।

কোরআন শরীফে আছে, আল্লাহ বলেন–

'কাফেরদের বন্ধু শয়তান; শয়তান তাহাদিগকে ইসলামের আলো হইতে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করিয়া থাকে।'

যাহারা খোদার শত্রু বে-দ্বীন কাফের।
শয়তান লায়ীন হল ইয়ার তাদের।
তাদের সে আলোকিত সত্য পথ হতে
নিয়ে যায় গোমরাহির অন্ধকার পথে।

আর প্রকৃত মো'মেন মুসলমানগণ দুনিয়ায় থাকিয়া ইসলামের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান ছিল, তাই আল্লাহ পাক তাহাদিগকে কেয়ামতের ময়দানে ইলাহীর আদালতে আলোযুক্ত মেঘখণ্ডের মধ্যে স্থান দিবেন। তাহারা উক্ত স্থানে থাকিয়া কেয়ামতের বিভীষিকা বলিতে কিছুই অনুমান করিতে পারিবে না।

আল্লাহ পাক ফর্মান–

'যাহারা আল্লাহর উপর একান্ত বিশ্বাসী, আল্লাহতাআ'লা তাহাদের ভাল-মন্দের বন্ধু; তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে পথ প্রদর্শন করান।'

আল্লাহপাক চির বন্ধু মু'মিন গণের,
নিয়ে যান দয়া করে তিনি তাহাদের।
লা-দ্বীনির গোমরাহীর অন্ধকার হতে,
দ্বীনের মঙ্গলময় আলোকিত পথে।

--o--

সাত শ্রেণী আরশের ছায়ায়

হাদীছ শরীফে আছে-কেয়ামতের ময়দানে যে দিন সূর্যের ভীষণ উত্তাপ ব্যতীত দাঁড়াইয়া ছায়া লইবার মত স্থান থাকিবে না, সেদিন আল্লাহপাক তাঁহার অসীম রহমতে সাত শ্রেণীর লোককে তাঁহার আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন ঃ

১। ন্যায় বিচারক বাদশাহ, যে বিচারের বেলায় ধনী, গরীব, ছোট, বড়, আত্মীয়-স্বজন সকলকে অপরাধানুযায়ী একই বিচার করেন- স্বার্থপরতা তাহার নিকট স্থান পায় নাই।

২। যে ব্যক্তি যৌবনে পদার্পণের পর হইতে জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকিত।

৩। যাহারা শুধু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত একে অপরকে ভালবাসিয়া থাকে।

৪। এমন এক ব্যক্তি যাহাকে একজন ধনী ও ঐশ্বর্যশালিনী অপূর্ব রূপবতী ও পরমা সুন্দরী রমণী প্রেমাবদ্ধে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নিজ যৌবন তৃষ্ণার উপর আহ্বান জানাইয়াছে, তা সত্ত্বেও সে একমাত্র আল্লাহর ভয়ে তাহার কুপ্রবৃত্তি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছে।

৫। যাহারা আল্লাহ পাকের মহব্বতে নির্জনে রোদন করিয়াছে।

৬। যাহারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর নিমিত্ত তাহাদের অন্তর সর্বদা মসজিদের দিকে আকৃষ্ট রাখিয়াছে।

৭। যারা মানুষের অজ্ঞাতে দান করে।

রাছুল বলেন, সেই ভয়ানক কিয়ামতের দিন,
সেদিন নাহি থাকবে ছায়া খোদার ছায়াহীন।
সাত কিছিমের লোকের তরে আল্লা মেহেরবান,
তাঁহার আপন আরশতলে করবে ছায়া দান।
যেই বাদশাহ সঠিক বিচার করল দুনিয়াতে,
যে নওজোয়ান যৌবনেই আসল খোদার পথে।
খোদার ঘরের প্রতি যাহার সর্বদা সর্বক্ষণ,
রহে গভীর ভালবাসা প্রবল আকর্ষণ।
যারা একে অন্যে কেবল খোদার খুশীর তরে,
ভালবাসা কিংবা পীরিত ভাঙ্গে না পরস্পরে।
যৌবনা এক শরীফজাদী রূপসী, সুন্দরী,
নিজের কাছে কুমতলবে ডাকল পেয়ার করি।
সেই সিরাজীর তীব্র লোভকে করে জয়,
রইল ফিরে যেই বিজয়ী মহান খোদার ভয়।
গোপন দানের সেই দাতা যার এমনি সাখাওয়াত,
এক হাতে কি দান করিল জানে না আর হাত।
একা একা বসে যে জন নিঝুম নিরালায়,
খোদার ভয় মুহব্বতে কেঁদে বুক ভাসায়।

এ ছাড়াও আল্লাহ আরও অনেক সম্প্রদায়কে তাঁহার বিভিন্ন নেক কাজের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পবিত্র আরশের নীচে ছায়া দিবেন।

বিচার আদেশ

হাদীছ শরীফে আছে,-কেয়ামতের দিবস হাশরের ময়দানে যখন মানুষের অত্যন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা আরম্ভ হইবে, তখন দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা হজরত জিব্রাঈলকে (আঃ) সংবাদ পাঠাইয়া বলিবেন-'হে জিব্রাঈল। যাও, মোহাম্মদকে (ছঃ) গিয়া সংবাদ দাও যে, যদি তাঁহার উম্মতগণ এই নিদারুণ বিভীষিকাময় হাশর প্রান্তরে দুঃখ-কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহে, তবে দুনিয়ায় তাহারা কষ্ট-মুছীবতে পড়িয়া আমাকে যে নাম নিয়া স্মরণ করিত সেই নাম নিয়া এখনও যেন আমায় স্মরণ করে।' এ শুনিয়া হুজুর সকল উম্মতকে বলিবেন-

'হে আমার উম্মতগণ! তোমরা সকলে এক কণ্ঠে সাময়িক দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিসমিল্লা-হির রহমানির রাহীম-'দয়াময় খোদার নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি অতি দয়ালু ও মেহেরবান' কলেমা পড়িতে থাক। উম্মতে মোহাম্মদিয়া যখন আল্লাহর নির্দেশিত উক্ত কলেমা পড়িয়া পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাকিবে, তখনই আল্লাহর দয়ার সাগরে বান ডাকিবে। তিনি দয়া করিয়া সকল উম্মতের হিসাব-নিকাশ শুরু করিবেন! অতঃপর আল্লাহ পাক অন্যান্য উম্মতগণকে ডাকিয়া বলিবেন- 'হে লোক সকল! জানিয়া রাখ, যদি আমি উম্মতে মোহাম্মদিয়ার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দয়া না করিতাম, তবে তোমাদের হিসাব-নিকাশ আরও এক হাজার বৎসর পরে আরম্ভ করিতাম।

মানব জাতির মধ্যে যাহাদের নেকী-বদী সমান হইবে তাহারা বেহেশত ও দোজখে কোন স্থান পাইবে না। আর যে সকল লোকের নিকট কোন নবী না আসার কারণে ভাল-মন্দ কোন আমলই করিতে সক্ষম হয় নাই এবং যাহারা জ্ঞানহীনতা ও উম্মত্ততার দরুন নেকী-বদীর বিবেচনা করিতে পারে নাই; আল্লাহ পাক এই সমস্ত লোককে প্রথমতঃ 'আ'রাফ নামক স্থানে স্থান দিবেন। উহারা আ'রাফে পঞ্চাশ হাজার বৎসর অবস্থান করার পর আল্লাহপাক তাহাদিগকে বেহেশতবাসীদের খাদেমরূপে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।

মানব জাতির ন্যায় জিন জাতিরও হিসাব-নিকাশ হইবে। উহাদের মধ্যে যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করিয়া নেক আমল করিয়াছে, তাহাদিগে আল্লাহ পাক বেহেশতে স্থান দিবেন। আর যাহারা কুফর ও ফেসক-ফুজুরিতে লিপ্ত ছিল, তাহারা চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে।

মানব দানব ব্যতীত আল্লাহ পাক অন্যান্য পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদিগেও হিসাব-নিকাশের জন্য হাশরের ময়দানে ইলাহীর আদালতে দণ্ডায়মান করাইবেন। কিন্তু উহাদের বিচার মানব-দানবের বিচারের ন্যায় হইবে না বরং দুনিয়ায় যে সকল পশু-পক্ষী শক্তিশালী ও অত্যাচারী ছিল তাহাদিগকে দুর্বল নিঃশক্তিমান করা হইবে এবং অত্যাচারিত দুর্বল পশু-পক্ষীদিগকে সবল ও শক্তিশালী করা হইবে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে অত্যাচারিতেরা অত্যাচারী পশু-পাক্ষীদের নিকট হইতে পূর্ব প্রতিশোধ নিতে থাকিবে। ইহার পরে উহাদিগকে মাটির সহিত মিশাইয়া মাটি করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু নিম্নলিখিত আটটি জিনিষকে বিশেষ কারণ বশতঃ মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হইবে না। (১) হজরত ইসমাঈলের (আঃ) দুম্বা, (২) হজরত সালেহ নবীর উট, (৩) আছহাবে কাহাবের কুকুর, (৪) ওস্তুনে হান্নানা-কাষ্ঠের খাম্বা, যাহার সাথে রাসূলে করীম (ছঃ) মসজিদে নবুবীতে মিম্বর তৈয়ার হওযার পুর্বে ভর করিয়া খোতবা পাঠ করিতেন, (৫) কা'বা গৃহ, (৬) তুর পাহাড়, (৭) বাইতুল মোকাদ্দাসে ঝুলান পাথর ও (৮) রাসূলে পাকের রওজা মোবারক, মসজিদে নবুবী ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান।

আল্লাহ পাক এই সকল বস্তুর যথোপযুক্ত আকৃতি দান করিয়া বেহেশতে স্থান নিবেন।

কথিত আছে, আল্লাহর ভয়ে যে চক্ষু দ্বারা ক্রন্দন করিয়াছে, আল্লাহ পাক সেই চক্ষু দ্বারা কাহাকেও দোজখ দর্শন করাইবেন না। কেতাব হইতে ইহাও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে সমান্য মাত্র ক্রন্দন করিয়া একগাছি লোম পরিমাণ স্থানও ভিজাইয়া থাকিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। কেয়ামতের দিবস আল্লাহ পাক এই প্রকার ক্রন্দনকারীকেও বেহেশতের দিকে পাঠাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, 'এই ব্যক্তি আমার ভয়ে সামান্য ক্রন্দন করিলেও করিয়াছে, তাই অদ্য আমি উহার প্রতি দয়াশীল হইয়া উহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম।

খোদার ভয়ে চোখ হইতে আঁসুর ধারা ঝরে,
জাহান্নামের অগ্নি হারাম সেই যে চোখের তরে।

-০-

শেষ বিচার

হাশর প্রান্তরে সূর্য মানুষ হইতে এত নিকটবর্তী হইয়া পড়িবে যে, মানুষের মাথার উপর মাত্র এক মাইলের মধ্যে সূর্য অবস্থান করিবে। মানুষ সূর্যের প্রখর উত্তাপে পাগলবৎ হইয়া যাইবে। তদুপরি হাশর প্রান্তরে সমস্ত মাটি তাম্র নির্মিত থাকিবে। মাথার অনতিদূরে প্রখর সূর্যের উত্তাপ এবং পায়ের নীচে তাম্র নির্মিত মাটি এই দুইয়ের সংমিশ্রণে মানুষ মর্মান্তিক অবস্থায় দিনের পর দিন কাটাইতে থাকিবে। সূর্যের স্থির কিরণে ও প্রচণ্ড প্রখর তীব্র উত্তাপে মানুষের দেহ হইতে অধিক ঘর্ম প্লাবিত হইতে থাকিবে। মানুষের কৃত কর্মের ফল অনুযায়ী তাহাদের ঘর্ম বাহির হইয়া কাহারও বক্ষদেশ, কহারও বা কোমর, কাহারও হাটু, কাহারও বা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। কাফেরদের এত ঘর্ম প্রবাহিত হইবে যে, তাহারা ঘর্মের কথিত নদীতে হাবুডুবু খাইতে থাকিবে।

ইস্রফীলের সিংগার ফুৎকারে কেহ হাত পা কর্তন অবস্থায় হাশর প্রন্তরে উপস্থিত হইবে। কেহ বা পশুর আকৃতিরূপ, কেহ বা দংশনকারী সর্প গলায় পরিহিত অবস্থায় উঠিবে। কাহারও নাড়ি ভুড়ি পৃষ্ঠদেশ হইতে বহিস্কৃত অবস্থায় জিহ্বাহীনভাবে উঠিবে। এইরূপে হাশরের ময়দানে কাহারও পা উপরে এবং মাথা নীচের দিকে ঝুলান থাকিবে। কাহারও পাকস্থলী অগ্নিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। কেহ বা হাত পা লেংড়া, কর্ণ বধির এবং অন্ধ হইয়া হাশর প্রান্তরে অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তাহারা এক সময় এমন বিভীষিকাময় অন্ধকারের মধ্যে পতিত হইবে যে, মানব জ্ঞানে তাহা উপলব্ধি করাও অতি দুরূহ ব্যাপার। তাহারা অন্ধের ন্যায় হইয়া পড়িবে-অর্ধ হাত দূরের বস্তুও দেখিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা হইতে একমাত্র আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাগণ ব্যতীত আর কেহই রেহাই পাইবে না। সকলেই এই বিভীষিকাময় ভয়াবহ অন্ধকারে দিক ভুলার মত দিশাহারা হইয়া পড়িবে।

বিচার অনুষ্ঠানের জন্য রাসূলুল্লাহর সুপারিশঃ হাশর প্রান্তরে এইরূপ পিবদসঙ্কুল অবস্থায় মানুষ যখন চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকিবে, তখন তাহারা এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সোপারেশকারীর অন্বেষণে বাহির হইবে।

হাদীছ শরীফে আছে–মানুষেরা যখন হাশর প্রান্তরে মহা সঙ্কটে নিপতিত হইবে, তখন তাহাদের পরিত্রাণ ও সোপারেশের জন্য সর্ব প্রথম তাহারা মানবের আদি–পিতা হজরত আদমের (আঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে ঃ 'হে মানব জাতির আদি–পিতা! আমরা হাশর প্রান্তরে ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন। সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আপনাকে অতি আদর করিয়া সৃষ্টি করতঃ সৃষ্টির সার্থকতা দেখাইয়াছেন–বেহেশতে বসবাসের হুকুম দিয়াছেন। ফেরেশতাগণ কর্তৃক সেজদা করাইয়াছেন। সর্বাগ্রে আপনাকেই আল্লাহ আসমান–জমীনের যাবতীয় বিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছেন। জানি, আপনি তাঁহার নিকট অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাই অদ্য আমাদের শেষ বিচার অনুষ্ঠানের জন্য আল্লাহতা'লার নিকট সোপারেশ করুন–এই বিপদ হইতে আমাদিকে রক্ষাকরুন।'

এতদশ্রবণে হজরত আদম নবী (আঃ) তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবেন– অদ্য আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্রোধান্বিত আছেন, তিনি এইরূপ ক্রোধান্বিত কোনদিন হন নাই–হইবেনও না। এতদ্ব্যতীত গন্দম ভক্ষণ করিবার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও শয়তানের চক্রান্তে গন্দম ভক্ষণ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য অদ্য আমি নিজেই অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত। না জানি, আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাস করিয়া বসেন–'হে আদম, তুমি–না আমার হুকুম অমান্য করিয়া নিষিদ্ধ গন্দম ভক্ষণ করিয়াছিলে?' তখন আমি কি জবাব দিব। সুতরাং তোমাদের জন্য সুপারিশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না! তবে তোমরা হজরত নূহ নবীর কাছে যাও।'

অতঃপর তাহারা সকলে হজরত নূহের (আঃ) সমীপে হাজির হইয়া তাহাদের জন্য খোদার দরবারে সুপারিশের আবেদন জানাইবে! এতদ শ্রবণে হজরত নূহ (আঃ) অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিবে–'আমার ছেলে কেনান কাফের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের আদবের প্রতি খেয়াল না করিয়া মহা প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া ও মাগফেরাত চাহিয়াছিলাম। এই জন্য আমি নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত। তবে তোমরা হজরত ইব্রাহীম নবীর কাছে যাও।'

তৎপর সকলে হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) সমীপে উক্তরূপে আবেদন লইয়া উপস্থিত হইবে। ইহাতে হজরত ইব্রাহীমও (আঃ) অক্ষমতা প্রকাশ করতঃ বলিবেন–'দুনিয়ায় থাকিয়া আমার তিনটি পদস্খলন হইয়াছিল,

তজ্জন্য আমি নিজেই অদ্য আল্লাহর নিকট লজিত ও ভীত। সুতরাং আমার পক্ষে তোমাদের জন্য ইলাহীর আদালতে সুপারেশ করা সম্ভব নহে। তবে তোমরা মুসা নবীর কাছে যাও।

সকলেই হজরত মুসা (আঃ) নিকট হাজির হইয়া করজোড়ে উত্তরূপে আবেদন জানাইবে। তিনিও তাহার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিবেন– দুনিয়ায় থাকিয়া অসাবধানতা হেতু অপরাধী কিবতী কওমের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলাম, কাজেই অদ্য আমি স্বীয় কর্ম–ফলের দরুন নিজেই শঙ্কিত আছি! কি প্রকারে আবার তোমাদের সুপারেশ নিয়া আল্লাহর দরবারে যাইব? তোমরা রূহুল্লাহ বা ঈসা নবীর কাছে যাও।'

অতঃপর তাহারা সকলে হজরত ঈসার (আঃ) সমীপে গিয়া তাহাদের আকুল আবেদন জানাইবে। তিনি অস্বীকার করিয়া বলিবেন–'হে বিপদের সম্মুখীন লোক সকল! তোমাদের হাশর প্রান্তরে মুক্তির কাণ্ডারী এক মাত্র শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)। তাই তোমরা তোমাদের শেষ আবেদন তাঁহার সমীপে গিয়া জানাও। নিশ্চয় তিনি তোমাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করিবেন।'

সব নবীই 'নফছী নফছী' বলবে হাশর দিন,
ইয়া উম্মতি বলবে কেবল নবী আল–আমীন।

এইভাবে হাশর প্রান্তরে সকল লোক আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসার (আঃ) নিকট হইতে নিরাশ হইয়া সর্বশেষে আমাদের শেষ নবী হজরত মোহাম্মদের (ছঃ) নিকট তাহাদের আকুল আবেদন লইয়া উপস্থিত হইবে। দয়াল নবী হাশরবাসিগণের দুর্বিসহ দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের দয়ায় দ্রবীভূত হইয়া যাইবেন। অমনি তিনি বোরাকে আরোহণ করতঃ 'মাক্কাম–ই মাহমুদে' উপস্থিত হইবেন।

আল্লাহ পাক বলেন–

'আসা আইয়াব আছাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা।'

'ওহে মোহাম্মদ! অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে 'মাকাম–ই মাহমুদে' পৌছাইবেন।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) উক্ত 'মাকাম–ই–মাহমুদে' পৌছামাত্র আল্লাহ পাকের অপূর্ব তাজাল্লী (জ্যোতিঃ) দর্শনে তিনি সাত দিন যাবৎ সেজদায় পড়িয়া থাকিবেন; পরে আল্লাহর দরবার হইতে নির্দেশ

আসিবে; 'হে মোহাম্মদ! মস্তক উঠাও, অদ্য তুমি যাহা আবেদন করিবে তাহাই পুরণ করিব আর যাহা বলিবে তাহাই শ্রবণ করিব। তুমি যে জন্য সুপারেশ করিবে অদ্য আমি তাহাই কবুল করিব। বল, কি বলার আছে তোমার?

মাকামে মাহমুদা গিয়া আল্লার দরগায়,
সপ্ত দিবস রবেন নবী পড়িয়া ছিজদায়।
আল্লাতা'লা বলবে তখন ওঠ হে মোর নবী,
তোমার যত আরজু পুরণ করব আমি সবি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁহার মাথা সেজদাহ হইতে উত্তোলন করিয়া আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিয়া আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করিবেন ঃ 'হে বিচার দিনের স্বামী! আপনি আপনার একান্ত বাধ্যগত ও নির্ভরযোগ্য প্রিয় দূত জিব্রাঈলের দ্বারা আমাকে জানাইয়াছেন যে, অদ্য আমি যে বিষয়ে আবেদন করিব তাহাই আপনি কবুল করিবেন। অদ্য আমি আপনার অসীম দয়ার প্রার্থী'।

এতদশ্রবণে আল্লাহ পাক বলিবেন ঃ 'হে মোহাম্মদ! আমার একান্ত অনুগত ও নির্ভরযোগ্য সংবাদবাহক দূত জিব্রাঈল আপনাকে যাহা জানাইয়াছে তাহা একান্তই সত্য, তাহা অদ্যই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। নিঃসন্দেহে অদ্য আপনাকে খুশী করিব এবং আপনার শাফায়াত কবুল করিব। আপনি এখনই জমীনে চলিয়া যান, আমি অবিলম্বে জমীনে পদার্পণ করিতেছি। এখনই সকল মানুষের কৃতকর্মের ফলাফলের হিসাব নিকাশ লইয়া প্রত্যেককে তাহাদের আমল অনুযায়ী ন্যায়ানুগ প্রতিফল দান করিব। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জমীনে চলিয়া আসিবেন এবং সকল মানুষকে তাঁহার সুপারিশের সুসংবাদ জানাইবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছঃ) জমীনে অবতরণ করিতে না করিতেই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁহার আসমানের অসংখ্য ফেরেশতাগণসহ অপূর্ব শান-শওকাতের সহিত জমীনে পদক্ষেপ করিবেন। আল্লাহ পাকের জমীনে অবতরণের ফলে জমীন ধন্য হইবে, আকাশ-বাতাস ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, যুগের আলো-বাতাশ পুলকে নাচিয়া উঠিবে।

আল্লাহ পাক জমীনে অবতরণ করামাত্র তাঁহার সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারের এজলাসে আরোহণ পূর্বক সকল মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেনঃ 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা জানিয়া রাখ, কেয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত যে যাহা করিয়াছ তাহা আমার সম্পূর্ণ জানা আছে। বিশেষ করিয়া আমার নির্ভরযোগ্য ফেরেশতাগণ তাহা তিলে তিলে হিসাব লিখিয়া রাখিয়াছে। অদ্য তোমাদের প্রতি সামান্য মাত্র জুলুম বা অবিচার হইবে না। এখনই তোমাদের কৃতকর্মের ফল তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে এবং প্রত্যেককে তদনুযায়ী ফল ভোগ করিতে হইবে।'

বিনা হিসাবে একদলকে বেহেশতের নির্দেশ ঃ সর্ব প্রথম আল্লাহ রাববুল আ'লামীন এজলাসে উপবেশন করা মাত্র তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে হিসাব-নিকাশের পূর্বেই বেহেশতে গমন করিতে হুকুম দিবেন।

এই মর্মে হাদীছ শরীফে আছে-আল্লাহ পাক যখন কেয়ামতের ময়দানে তাঁহার আদালতে সকল মানুষকে একত্রিত করিবেন, তখন আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ সাদরে ডাকিয়া বলিবেন-'আল্লাহতাআ'লার নিকট প্রিয় ও সম্মানী লোক কাহারা আছেন? আল্লাহর দরবার হইতে তাঁহাদের জন্য নির্দেশ হইয়াছে, তাঁহারা এখনই বেহেশতে গমন করুন।' এ ঘোষণা শোনামাত্র আল্লাহর একদল প্রিয় বান্দা উঠিয়া বেহেশতের দিকে রওয়ানা হইবেন।

বেহেশতে গমনের পথে তাঁহাদের সাথে একদল ফেরেশতার সাক্ষাৎ হইবে। তাহারা বেহেশতে গমনকারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে, আপনারা কাহারা? কি আমলের বদৌলত এত তাড়াতাড়ি পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশের পূর্বেই বেহেশতে গমন করিতেছেন? তাঁহারা উত্তর করিবেন, 'দুনিয়ায় বহু লোক আমাদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করিয়াছিল, কিন্তু আমরা জুলুমের পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করিয়া তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করিয়াছি; আমাদের প্রতি কেহ অপব্যবহার করিলে আমরা তাহাদিগকে সরল প্রাণে মাফ করিতাম।' এতদশ্রবণে ফেরেশতাগণ বেহেশতের পথ দেখাইয়া বলিবে-'এই দিকে সোজা বেহেশতে চলিয়া যান।'

ইহার পর আবার আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলিবে-'হে ধৈর্যশীলগণ! আপনারা কে কোথায় আছেন? উঠুন ঃ আল্লার তরফ হইতে

হুকুম হইয়াছে, আপনারা হিসাব-নিকাশের পূর্বেই বেহেশতে গমন করুন! তখন তাঁহারা আনন্দের সহিত বেহেশতের পথ ধরিবে। পথিমধ্যে আবার তাঁহাদের সাথেও একদল ফেরেশতার মোলাকত হইবে। উহারা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, আপনারা কাহারা? হিসাব-নিকাশের পূর্বেই যে বেহেশতে গমন করিতেছেন?' তদুত্তরে ধৈর্যশীলগণ বলিবেন-আমরা দুনিয়ায় থাকিয়া সকল বিপদ-আপদ পদদলিত করিয়া সর্বদা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে কালযাপন করিতাম। তাই বুঝি অদ্য দয়ালু খোদার অসীম কৃপায় বিনা হিসাব-নিকাশেই আমাদেরকে বেহেশতে গমনের আদেশ দান করিয়াছেন।' তৎপর ফেরেশতাগণ বলিবে, শুকরিয়া খোদার রহমতে বেহেশতে চলিয়া যান।'

ইহার পর আবার যাহারা দুনিয়ায় পরস্পর একে অন্যের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, উহাদিগকে আল্লাহর আদালতের ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলিবে; 'এমন কাহারা আছেন, যাহারা দুনিয়ায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়াছেন!' ফেরেশতাদের এইরূপ উচ্চঃকণ্ঠের আহ্বানে একদল লোক আল্লাহ পাকের ন্যায় বিচারের আদালতে হাজির হইবেন। আল্লাহ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তুলাদণ্ড হিসাব হইতে রেহাই দিয়া বেহেশতে গমনের হুকুম দিবন, অমনি তাঁহারা বেহেশতের দিকে রওয়ানা হইবেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের সঙ্গেও আবার একদল ফেরেশতার দেখা হইবে। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দেখিয়া খুশীতে সাদরে জিজ্ঞাসা করিবে-

'ভাইসব! আপনারা কাহারা? ইলাহীর আদালত হইতে পাপ-পুণ্যের হিসাব হওয়ার পূর্বেই যে বেহেশতে গমন করিতেছেন?, তাঁহারা উত্তর করিবেন-'আমরা দুনিয়ায় থাকিয়া নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পরস্পর একে অন্যের সাথে খোদার সন্তুষ্টির নিমিত্ত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। আমরা পরস্পর পরস্পরের দুঃখে দুঃখিত এবং সুখে আনন্দিত ছিলাম। তাই বুঝি আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন অদ্য আমাদের উপর এতটা দয়াবান হইয়াছেন, হিসাব-নিকাশের পূর্বেই বেহেশতে যাওয়ার হুকুম দিয়াছেন।

মুখ বুজিয়া সইল যারা জুলুম অবিচার,
করল বরং সদ্ব্যবহার দাদ না দিয়ে তার।

বিপদ-আপদ, দুঃখ মুছিবত আসল দুনিয়ার,
রইল যারা ধৈর্য ধরে সবর করে তায়।
দুইটি মানুষ পরস্পরে করল ভালবাসা,
নাই তাতে স্বার্থ কেবল খোদার খুশী আশা।
হিসাব ছাড়া এ-তিন কিছিম মানুষ আখেরাতে,
হাশর হতে সরাসরি পৌছিবে জান্নাতে।

কথিত আছে-যখন উক্ত তিন সম্প্রদায় বিনা হিসাবে বেহেশতে গমন করিবেন, তখন আল্লাহর আদেশে পাপ-পুণ্য ওজন করিবার জন্য তুলাদণ্ড মীজান (পাল্লা) আনয়ন করা হইবে।

কাফেরের বিচার ঃ আল্লাহ পাক জমীনে অবতরণের পরই ফেরেশতাগণকে বেহেশত ও দোজখ আনয়নের হুকুম দিবেন যেন হাশরবাসীগণ প্রত্যক্ষ ভাবে তাহা দেখিয়া তাহাদের ভবিষ্যতের যথার্থ অবস্থা অনুধাবন করিতে পারে। বেহেশত ও দোজখ জমীনে আনায়ন করা হইলে দোজখবাসীরা দোজখের ভয়াবহ বিভীষিকাময় আজাব ও দুরবস্থা দর্শনে ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিবে। বেহেশতবাসীগণ বেহেশতের সৌন্দর্য, ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশ দেখিয়া খুশীতে বিভোর হইয়া যাইবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কষ্ট ক্লেশ ভুলিয়া ভবিষ্যতে সুখের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ মানুষের যাবতীয় কৃত-কর্মের ভাল আমল-নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাৎ, জেকের-আজকার, কোরআন ইত্যাদির আকৃতি দান করতঃ পৃথক পৃথক সারিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইবেন। এই সময় তাওহীদ উপস্থিত হইয়া বলিবে-'হে খোদা। আপনি 'সালাম' (শান্তি বর্ষণকারী) আর আমি ইসলাম শান্তি।' এতদশ্রবণে আল্লাহতাআ'লা বলিবেন ঃ 'হে কলেমা! আমার নিকটবর্তী হও, যেহেতু অদ্যকার তোমার দরুন এক সম্প্রদায় লোক পুরস্কৃত এবং আর এক সম্প্রদায় অভিশপ্ত হইয়া ভীষণ শাস্তির উপযোগী হইবে।

অতঃপর আল্লাহতাআ'লা ফেরেশতাগণকে সকলের আমল পৌছাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত নির্দেশ করিবেন।

মো'মেনদের আমল-নামা তাঁহাদের সম্মুখ দিক দিয়া তাঁহাদের ডান হাতে দেওয়া হইবে। ফলে তাঁহারা উক্ত আমল-নামা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন

এবং আল্লাহ পাকের কৃপার শুকরিয়া আদায় করিবেন। কাফেরদে আমলনামা পিছনের দিক দিয়া তাহাদের বাম হাতে দেওয়া হইবে। কাফেরগ উক্ত আমালানায় তাহাদের কৃত যাবতীয় কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন ফল হইবে না।

আল্লাহ উভয়দল সম্পর্কে বলেন–

'শেষ বিচারের বিদস যাহারা আমলনামা দক্ষিণ হস্তে পাইবে তাহারা খুশী হইয়া একে অন্যকে বলিবে ঃ আমার আমলানামা পড়িয়া দেখতো?

ডাহিন হাতে আমলনামা লাভ করিবে যারা,
কঠিন হাশর ময়দানেতে চরম সফল তারা।
খুশীর সাথে বলবে তারা এক দোছরার কাছে,
দেখতো ভাই ইহার মাঝে কি সব লেখা আছে!

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন–

'আর আমলনামা যাহারা বাম হাতে পাইবে, তাহারা দুঃখ করিয়া বলিবে– 'হায়রে! আমাদের যদি এ আমলনামা দেওয়া না হইত!'

বাম হাতেতে আমলনামা লাভ করিবে যারা,
দারুণ ভয়ে তারা সবাই হইবে দিশেহারা।
বদন পরে বিষাদ-রেখা দিবে তাদের দেখা,
বলবে ক্কেদে হায় যদি আজ না পেতাম এই লেখা।

অতঃপর আল্লাহ পাক কাফেরদিগকে তাঁহার সম্মুখে ডাকিয়া বিচার আরম্ভ করিবেন। সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক তাহাদের অংশীবাদিতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন তাহারা অস্বীকার করিয়া বলিবে–

'হে খোদা! আমরা কখনই তোমার সাথে কাহাকেও অংশীজ্ঞানকারী ছিলাম না।'

ইহাতে আল্লাহ পাক তাহারা যে স্থানে যে সময় শের্ক করিয়াছিল সেই স্থান ও সময়ের নিকট হইতে তাহাদের শের্কের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত হজরত আদমের (আঃ) নিকট যে সকল আদম সন্তানের আমল নামা পেশ করা হইত, তাঁহার নিকট হইতে এবং যে সকল ফেরেশতা আদম সন্তানের আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত, তাহাদের নিকট হইতেও সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ইহাতেও কাফেরগণ অস্বীকার করিয়া বলিতে থাকিবেঃ 'আমরা কখনই তোমার সাথে কাহাকেও অংশীদার (শের্ক) জ্ঞান

করি নাই।' অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, এক কথায় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে তাহাদের শের্কের সাক্ষ্য তলব করিবেন। ইহাতে তাহাদের সর্বাঙ্গ সাক্ষ্য দিয়া বলিবে ঃ 'হাঁ, হে খোদা! এই ব্যক্তি আপনার সাথে অংশীজ্ঞান (শের্ক) করিয়াছে।'

আল্লাহ পাক বলেন–

'যখন কাফেরগণ ইলাহীর আদালতে পৌছিবে, তখন তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক ইত্যাদি তাহাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

মোশরেকেরা কিয়ামতে বলবে খোদার ঠাঁই,
আমরা কভু তোমার সাথে শরীক করি নাই।
সাক্ষ্য চা'বেন তখন খোদা অঙ্গসমূহের,
তখন এরা সাক্ষ্য দিবে খেলাফ তাহাদের।
চোখ-কান ও ত্বক জবান খুলে বলবে খোদার কাছে,
করছে এরা ঠিক যা লিখা আমলনামায় আছে।

এইবারে কাফেরগণ উপায়ান্ত না দেখিয়া তাহারা স্বীয় গোনাহর কথা আল্লাহ পাকের সমীপে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লাহ পাক বলেন–

'অবশেষে তাহারা তাহাদের গোনাহর কথা স্বীকার করিবে।'

এই সময় কাফেরগণ করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিবে ঃ 'হে খোদা! আমরা শয়তানের চক্রে পড়িয়া এরূপ গোনাহর কার্য করিয়াছি। হে খোদা! আমাদিগকে একটু অবসর দিয়া পুনঃ দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিন। আমরা দুনিয়ায় গিয়া কখনও আর ঐরূপ গোনাহর কার্য করিব না-একান্ত আপনার অনুগত বান্দার ন্যায় যাবতীয় নেক কার্য করিব।

এতদশ্রবণে আল্লাহ পাক রাগের সহিত বলিয়া উঠিবেন ঃ 'তাহা কখনই হইতে পারে না; দুনিয়ায় তোমাদিগকে দীর্ঘজীবি করিয়াছিলাম, ভালমন্দ জ্ঞান দান করিয়াছিলাম তোমরা ইচ্ছা করিলে আমার একত্ববাদিতা স্বীকার করিয়া নেক কাজ করিয়া আসিতে পারিতে। কিন্তু তোমরা তাহার কিছুই কর নাই।

এতদ্ব্যতীত যুগে যুগে আমার নবী ও রাসূলগেণকে প্রেরণ করিয়া তোমাদিগকে আমার সতর্কবাণী শুনাইয়াছি। কিন্তু তোমরা সেই দিকেও লক্ষ্য না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছ। ইহা ছাড়া, আমার সতর্কবাণী

বাহক নবী ও রাসূলগণকে পাগল বলিয়া ধিক্কার দিয়াছ; কাজেই এখন বাধ্য হইয়া স্বীয় কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। জানিয়া রাখ, আমার আদালতে পাপীদের পক্ষে সাহায্যকারী বা সুপারেশকারী বলিতে কেহই থাকিবে না।'

অতঃপর আল্লাহ পাক হজরত আদমকে (আঃ) ডাকিয়া বলিবেন, 'হে আদম! তোমার সন্তানগণের মধ্য হইতে দোজখীদের বাছিয়া বাহির কর।' এতদশ্রবণে আদম (আঃ) খোদার দরবারে আরজ করিয়া বলিবেন, 'হে খোদা! কতজনে কতজন বাহির করিব? উত্তরে আল্লাহ বলিবেন–

'প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন বাহির কর।' এই কথা শুনা মাত্র হাশর প্রান্তরে বিষাদের কালিমা রেখা ছড়াইয়া পড়িবে। সকল মানুষ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে। তৎপর কাফেরদিগকে অধঃমুখে ধাক্কা দিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

সাধারণ মুসলমানদের বিচার ঃ আল্লাহ পাক কাফেরদের বিচার শেষ করিলে–সমস্ত কাফের দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে। তখন হাশর প্রান্তরে বিভিন্ন নবীর মোনাফেক উম্মত এবং মুসলমান ব্যতীত আর কেহ থাকিবে না। এই সময় আল্লাহতা'আলা হঠাৎ হাশর প্রান্তরে আপন আত্মপ্রকাশ করিয়া মো'মেনদের সাক্ষাৎ দিবেন। আল্লাহ পাকের অপূর্ব তাজাল্লী (নূর) দেখিয়া তাহারা সেজদায় পড়িয়া যাইবে। মোনাফেকগণ মুসলমানদের দেখাদেখি সেজদা করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু যখনই মোনাফেকগণ সেজদা করিতে চেষ্টা করিবে, তখনই তাহারা চিৎ হইয়া ভূ-তলে পড়িয়া যাইবে। সকলেই বুঝিতে পারিবে, ওরাই মোনাফেক।

হাশর মাঠে যখন খোদা দিবেন দরশন,
সাথে সাথে ছিজদা তাঁরে কবরে মুমিনগণ!
কিন্তু নাহি ছিজদা দিতে পারবে মুনাফিক,
এতেই তারা পড়বে ধরা সবাই পাবে ঠিক।

তৎপর আল্লাহ হাকিম মুসলমানদের নেকী ও বদী ওজন করিবার নিমিত্ত ফেরেশতাগণকে তুলাদণ্ড মীজান (পাল্লা) উপস্থিত করিতে নির্দেশ দিবেন। অতঃপর তুলাদণ্ড মীজানে সকল মুসলমানের নেকী ও বদীর যাবতীয় ছোট-বড় আমল সূক্ষ্মভাবে ওজন করা হইবে।

আল্লাহ পাক বলেন–

'বিচার দিবসে ন্যায় বিচারের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড স্থাপন করা হইবে।'

জীব-জন্তুর বিচার ঃ মানব-দানব ব্যতীত পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদিগকেও হিসাব-নিকাশের জন্য হাশর ময়দানে ইলাহীর আদালতে হাজির করা হইবে। কিন্তু উহাদের বিচার মানব-দানবের বিচারের ন্যায় হইবে না। দুনিয়ায় থাকিয়া যদি কোন শক্তিশালী জানোয়ার নিঃশক্তিমান জানোয়ারের উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করিয়া থাকে তবে বিচার কালে আল্লাহ দুনিয়ার নিঃশক্তিমান জানোয়ারকে শক্তি দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহর হুকুমে অত্যাচারীতেরা অত্যাচারিদের নিকট হইতে পরস্পর একে অন্যের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। পরে আল্লাহর আদেশে উহাদিগকে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু নিম্নের জানোয়ার ও বস্তুগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে না। আল্লাহ পাক উহার যথোপযুক্ত আকৃতি দান করিয়া বেহেশতে রাখিতে নির্দেশ দিবেন।

জীব ও বস্তসমূহ এই-১। হজরত ইসমাঈল নবীর দুম্বা,

২। হজরত ছালেহ নবীর উট,

৩। আছহাবে কাহাফের (গুহাবাসীদের) কুকুর,

৪। উসতোয়ানায়ে হান্নানা-কাঠের ঐ খাম্বা যাহার উপর রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মসজিদে নবুবীর মিম্বর তৈয়ার হওয়ার পূর্বে ভর দিয়া খুৎবা দিতেন।

৫। বাইতুল্লাহ বা কা'বা গৃহ,

৬। তুর পাহাড়,

৭। বাইতুল মোকাদ্দাসে ঝুলান পাথর এবং

৮। রাসুল্লাহর (ছঃ) রওজা মোবারক ও মসজিদে নবুবীর মধ্যবর্তী স্থান।

হাদীছ শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন–

'আমার কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগিচার মধ্যে একটি বাগিচা।'

মধ্য টুকু মিম্বর এবং আমার কবরের,
একটি বাগান বেহেশতেরই বাগান সমুহের।

হাশর প্রান্তরে রাসূলুল্লাহর ঝান্ডা ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক যখন সমস্ত প্রাণীকে পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সর্ব প্রথম নেতৃস্থানীয় প্রধান চারিজন ফেরেশতাকে জিন্দা করতঃ রাসূলুল্লাহকে (ছঃ)

তাঁহার মারকাদ (কবর) মোবারক হইতে অভিনন্দন করিয়া আনয়নের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন। অমনি উহারা বেহেশত হইতে 'বোরাক' এবং 'লিওয়াউল হামদ' নামক ঝাণ্ডা সঙ্গে লইয়া রসূলুল্লাহকে অভিবাদন করিয়া আনয়নের জন্য রওয়ানা হইবেন। এই 'লিওয়াউল হামদ' রাসূলুল্লাহর নির্দিষ্ট ঝাণ্ডা, কেয়ামতের ময়দানে তিনি এই ঝাণ্ডা লইয়া হাজির হইবেন। সেই দিন উম্মতে মোহাম্মদীয়া রাসূলুল্লাহর এই নির্দিষ্ট চিহ্নিত ঝাণ্ডা দেখিয়া দলে দলে তথায় সমবেত হইতে থাকিবে।

'লেওয়াউল হামদ ঝাণ্ডা হাশরের দিন,
পাইবেন আমাদের রসূল আমীন।
এই সুবিশাল পাক নিশানের তল,
মিলিত হবে তাঁর উম্মতের দল।
ওহে আল্লা, সেই মহা হাশর ময়দান,
সেই নিশানের তলে পাই যেন স্থান।

হাদীস শরীফে আছে, 'লিওয়াউল হামদ'. এতবড় বিরাট যাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একজন লোক বহু শত বৎসর গমন করিলেও তাহার শেষ সীমা পাইতে সক্ষম হইবে না। লিয়াউল হামদের প্রস্থ আসমান-জমীনের প্রস্থের ন্যায় বিশাল। আল্লাহ্ পাক এই ঝাণ্ডাকে লাল ইয়াকুত এবং সবুজ জমরুদ নামক অত্যধিক মূল্যবান পাথর দ্বারা সৌন্দর্য দান করিয়াছেন। এই ঝাণ্ডায় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে তিনটি বাক্য লেখা হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথম লাইনে লেখা আছে-

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-'দয়াময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, তিনি অতি মহান দয়ালু।

দ্বিতীয় লাইনে লেখা আছে-

'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।'

তৃতীয় লাইনে লেখা আছে-

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই, মোহাম্মদ মোস্তফা তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষ বা রাসূল।'

রাসূলুল্লাহর (ছঃ) এই লিওয়াউল হামদ নামক ঝাণ্ডার চতুষ্পার্শে সত্তর হাজার তীর ধনুক পোতা রহিয়াছে। প্রত্যেকটি তীর ধনুকের নিম্নে আবার সত্তর হাজার ফেরেশতা সারিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেকটি সারিতে আবার পাঁচ লক্ষাধিক ফেরেশতা রহিয়াছে। তাহারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত ও গুণ-কীর্তন করিতেছে। কেয়ামতের দিবস রাসূলুল্লাহর এই প্রশংসিত ঝাণ্ডার নিম্নে তাঁহার মো'মেন উম্মতগণ একত্রিত হইবে এবং শাফায়াতের অপেক্ষায় সকলে মিনতির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) ছাহাবিগণের সম্মানার্থে আরও কতগুলি তীর ধনুক লিওয়াউল হামদের নীচে পোঁতা হইবে। তন্মধ্যে সততার তীর ছিদ্দীকে আকবর হযরত আবুবকরের (রাঃ) সম্মানার্থে পোঁতা হইবে। সকল সত্যবাদীগণ সেই তীরের নিকটে সমবেত হইবেন।

ন্যায় বিচারের তীর হযরত ওমন ফারুকের (রাঃ) সম্মানার্থে পোঁতা হইবে। সকল শ্রেণীর ন্যায় বিচারক, কাজী ও বাদশাহগণ সেই তীরের নীচে সমবেত হইবেন।

দানশীলতার তীর হযরত ওসমান গণীর সম্মানার্থে পোঁতা হইবে। সকল প্রকার দানশীলগণ এই তীরের নিকটে সমবেত হইবেন।

শাহাদাতের তীর হযরত আলী কাররামুল্লাহ আজহাহুর সম্মানে পোঁতা হইবে। সকল শ্রেণীর শহীদগণ সেই তীরের নীচে সমবেত হইবেন। এইভাবে দুঃখী কাঙ্গাল-গরীবের তীর আবুদ্দারদার (রাঃ) সম্মানার্থে পোঁতা হইবে। সকল শ্রেণীর গরীব দুঃখীগণ সেই তীরের নীচে একত্রিত হইবেন।

বৈরাগ্যতার তীর হযরত আবুজার গিফারীর (রাঃ) সম্মানার্থে পোঁতা হইবে। সকল প্রকার দুনিয়া ত্যাগী খোদাভীরুগণ সেই তীরের নীচে সমবেত হইবেন।

কোরআন শুদ্ধরূপে পাঠক ও পাঠদানকারীগণের তীর হযরত উবাই ইবনে কাআবের (রাঃ) সম্মানার্থে পোঁতা হইবে; সকল প্রকার কোরআনের কারীগণ সেই তীরের নীচে সমবেত হইবেন।

এইরূপে অত্যাচারিত ব্যক্তির তীর হযরত ইমাম হুসাইনের (রাঃ) সম্মানার্থে পোঁতা হইবে। সকল প্রকার অত্যাচারিত লোকগণ যাহারা অন্যায়ভাবে নিহত হইয়াছে তাহারা সেই তীরের নীচে সমবেত হইবেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন-

কেয়ামতের দিবস আমি সকল সম্প্রদায়কে তাহাদের পথ প্রদর্শক ইমামগণের সহিত ডাকিব।'

ডাকা হবে সকল দলে দিন কেয়ামত,
নিজ নিজ অনুসরক ইমামের সাথ।

-০-

পোলসেরাত

মুসলমানগণের যাবতীয় ভাল-মন্দ আমল ওজন করা হইলে পর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে নিজ নিজ নবীগণের সঙ্গী হইয়া পোলসেরাত পার হইয়া বেহেশতে গমনের আদেশ দিবেন। পোলাসেরাত চুল হইতে অতি সূক্ষ্ম এবং তরবারি হইতে অধিক ধারাল। ইহা দোজখের উপর স্থাপিত থাকিবে। হাদীস মতে বুঝা যায়, উহার দৈর্ঘ সাধারণ লোকের মধ্যম ধরনের গতির পনের হাজার বৎসরের রাস্তার সমান।

চুলের চেয়ে চিকন অতি অসির চেয়ে ধার,
জাহান্নামের ভীষণ অনল জ্বলবে নীচে তার।
চার দিকেতে মহা আধার একটু আলো নাই,
এ পুলসিরাত পার হইয়া যাইতে হবে ভাই।

সকল নবীর উম্মতগণ তাহাদের নিজ নিজ নবীর সঙ্গী হইয়া পোলসেরাত পার হইয়া বেহেশতে গমনের উদ্দেশ্যে পোলসেরাতের দিকে রওয়ানা হইবেন। ইতঃপূর্বেই হাশর প্রান্তর এত ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে যে, কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইবে না। এই ভীষণ বিভিষীকাময় মুহূর্তে মুসলমানগণ তাহাদের আমলের মর্যাদানুযায়ী কেহ একটি, কেহ দুইটি নূরের (আলো) বাতি লাভ করিবেন। আবার কেহ বা সামান্য মাত্র নূরের মশাল পাইবে যাহাতে শুধু মাত্র তাহাদের পদদ্বয়ের পার্শ্ববর্তী স্থান আলোকিত হইবে। মুসলমানদের মধ্যে আমলের মর্যাদানুযায়ী সর্বনীচু স্তরের মুসলমানগণ মাত্র প্রদীপের ন্যায় আলোর অধিকারী হইবে। কিন্তু মোনাফেকগণ এই ভীষণ অন্ধকারে বিপদে পতিত হইয়া এইরূপ নূর হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন-

'ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদীহিম অবি আইমানিহিম'-ঈমানদারদের ডানে বামে অনুসরণকারী নূরের মশাল হইবে।

ইমানদারের সামনে পিছে হবে উজ্জ্বল নূর,
সাথে সাথে চলবে এ নূর হবে নাক দূর।

যখন সকল নবীর উম্মতগণের মধ্যে মো'মেন ব্যক্তিগণ পোলসেরাত পর্যন্ত পৌছিবে, তখন তাহাদিগকে নিজ নিজ মর্যাদানুযায়ী কেহ বিদ্যুৎ গতি, কেহ বায়ুর মত দ্রুত গতি কেহ বা উটের সামান্য গতির ন্যায় পোলসেরাত দ্রুত অতিক্রম করিতে থাকিবে। এইরূপে সকল শ্রেণীর মো'মেনগণ পোলসেরাত পার হইতে থাকিবে। এই সময় দোজখ হইতে অগ্নির বড় বড় লেলীহান শিখা বাহির হইয়া কিছু সংখ্যক লোককে দংশন করিবে এবং কতককে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া দোজখের অতল গর্ভে টানিয়া লইয়া যাইবে। এই প্রকার ভীষণ বিপদ সঙ্কট মুহূর্তে লোকদের নেক আমল-নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি তাহাদের সাহায্যকারী হইবে।

মুসলমানগণ যখন তাহাদের নূরের মশালের সাহায্যে পোলসেরাত পার হইতে থাকিবে, তখন মোনাফেকগণ তাহাদের পিছন হইতে ঈমানদার-গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে ঃ 'হে ভাই মো'মোমেনগণ! আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করুন, যেন আমরা আপনাদের আলোর সাহায্যে পোলসেরাত পার হইতে পারি।' মো'মেনগণ তখন উত্তর করিবেন ঃ 'তোমরা একটু পিছনে হটিয়া আমরা যে স্থান হইতে আলো লইয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে তোমরাও আলো নিয়া আইস।'

মোনাফেকগণ একটু পিছনে হটিলেই তাহারা এক ভীষণ বিভীষিকাময় অন্ধকারাচ্ছন্নে পতিত হইবে। মোনাফেকগণ নিরূপায় দেখিয়া পুনঃ তাহাদের পিছনে ছুটিবে, কিন্তু তাহারা আর মো'মেনদের সঙ্গী হইতে পারিবে না। এই সময় দোজখ হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখা বাহির হইয়া আসিবে এবং মোনাফেকদিগকে এক সঙ্গে দোজখের সর্ব নিম্নস্তরে টানিয়া লইয়া যাইবে।

দুরাচার এই মোনাফেকদের সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্ বলেন-

'মোনাফেরকদের চির আবাস স্থল দুঃখময় দোজখের সর্বনিম্ন স্তর।'

জাহান্নামের অতল তলে মুনাফেকের স্থান,
ভণ্ড ওরা মনটা কাফির বাহির মুসলমান।

-০-

দোজখবাসী মুসলমানদের শাফায়াত

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পোলসেরাত দোজখের উপর স্থাপিত। ইহা পার হইবার কালে ঈমানদার তাঁহাদের মর্যাদানুযায়ী কেহ বিজলীর ন্যায়, কেহ মধ্যম ধরনের গতিতে অতিক্রম করিয়া যাইবে। আবার কাহাকেও বা দোজখ হইতে উত্থিত অগ্নি নির্মিত অঙ্কুর চুম্বকের ন্যায় দোজখের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবে। ইহারাই ফাসেক-গোনাহগার মুসলমান। এই পোলসেরাত পার হইবার কালেই বে-দীন লোকগণ (কাফের) পোলসেরাত হইতে কর্তিত অবস্থায় দোজখের অতল গহ্বরে নিপতিত হইবে।

ঈমানদারগণ যখন পোলসেরাত অতিক্রম করিয়া বেহেশতের সন্নিকট হইবেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) স্বীয় হস্ত মোবারক দ্বারা বেহেশের তালা খুলিয়া তাঁহাদের অবস্থান গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। এই সময় রাসূল-ল্লাহর উম্মত বেহেশতিগণের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ হইবে।

রাসূলে পাক (ছঃ) স্বীয় বেহেশতী উম্মতগণের পর্যবেক্ষণ ও সংবাদ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া যাইবেন। তিনি যখন উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন যে এখন পর্যন্ত তাঁহার শত সহস্র উম্মত দোজখের নিদারুন আজাব ও যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে-নির্যাতিত হইতেছে, তখন আপন উম্মতের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিবে। তিনি উম্মতের শাফায়াতের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িবেন। উম্মত দরদী নবী কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদের ত্রাণকল্পে সেজদায় পড়িয়া আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে দরখাস্ত করিবেন। এই ভাবে তিনি সাত দিন পর্যন্ত সেজদায় থাকিয়া আল্লাহ পাকের অসীম প্রশংসা ও গুণকীর্তন করিতে থাকিবেন এবং বলিতে থাকিবেন ঃ

'হে খোদা! এখনও আমার শত সহস্র উম্মত দোজখে থাকিয়া সীম-াহীন নির্যাতন ভোগ করিতেছে; হে খোদা! উহাদিগকে মাফ কর।'

এতশ্রবণে আল্লাহ্ পাক আদেশ করিবেন ঃ হে উম্মত দরদী বন্ধু! যাও, তোমার দোজখবাসী উম্মতগণের মধ্যে যাহাদের অন্তরে মাত্র একটি জবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, উহাদিগকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আন।

মহান আল্লাহর এ প্রকার উক্তি শুনিয়া অন্যান্য নবী-রাসূলগণও নিজ নিজ উম্মতের শাফায়াতের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিবেন। আল্লাহ পাক তাঁহাদিগকেও স্বীয় উম্মতগণের শাফায়েতের জন্য নির্দেশ

প্রদান করিবেন। তাঁহারাও আপন আপন উম্মতের শাফায়াত কল্পে দোজখের দ্বারে উপস্থিত হইবেন।

এতদ্ব্যতীত উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রত্যেক শহীদ সত্তর জন এবং প্রত্যেক হাফেজ দশ জন দোজখী মুসলমানকে শাফায়াত করিতে পারিবেন। এইরূপে প্রত্যেক আলেম তাঁহার মর্যাদানুযায়ী দোজখবাসী মুস-লমানকে শাফায়াত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সকল শাফায়াতকৃত মুসলমানগণকে লইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবেন। এই সময় তাঁহার উম্মতগণ বেহেশতবাসীগণের মধ্যে সংখ্যায় এক তৃতীয়াংশে পরিণত হইবে।

তৎপর রাসূলুল্লাহ (ছঃ) পুনর্বার উম্মতের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া জ্ঞাত হইবেন যে, এখনও তাঁহার বহু সংখ্যক উম্মত দোজখে পড়িয়া আছে। তিনি পূর্বের ন্যায় আবার দোজখবাসী উম্মতগণের মুক্তির জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে সেজদায় পড়িয়া যাইবেন। এতদ্দর্শনে আল্লাহ্ পুনরাদেশ করিবেন ঃ

'হে মোহাম্মাদ! তোমার দোজখী উম্মতগণের যাহাদের অন্তরে সরিয়ার ন্যায় বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আন-আমি সবই কবুল করিলাম।'

রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আল্লাহ্ পাকের এইরূপ নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় উম্মতের আলেম-ওলামা, পীর-বুজুর্গানও শহীদানগণকে লইয়া দোজখের কিনারায় থাকিয়া তাঁহার দোজখী উম্মতগণকে ডাকিবেন এবং যাহাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণ বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, উহাদিগকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন। এই সময়ে উম্মতে মোহাম্মদিয়া বেহেশতীদের মধ্যে সংখ্যায় অর্ধাংশে পরিগণিত হইবে।

যার কলবে ঈমান কেবল সরষে বরাবর,
খোদার নিকট সেও ক্ষমা পাইবে অতঃপর।

--০--

সর্বশেষ দলের শাফায়াত

অতঃপর হুজুর আবার নিজ উম্মতগণের তত্ত্ব-তালাশ লইয়া জানিতে পারিবেন যে, এখনও তাঁহার বহু সংখ্যক উম্মত দোজখে ভীষণ আজাবে নির্যাতিত হইতেছে। উম্মত দরদী বিগলিত প্রাণ নবী পুনঃ উম্মতের

মুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন এবং আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়িয়া করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিবেন–

'হে খোদা! এখনও আমার বহু সংখ্যক উম্মত দোজখের আজাবে যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। হে খোদা! তুমি উহাদিগকে মাফ কর।' আল্লাহ্ পাক অনতিদূর হইতে নির্দেশ প্রদান করিবেন–'যাহাদের অন্তরে অর্দ্ধবিন্দু ঈমান আছে উহাদিগকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আন–তাহাদিগকে আমি মাফ করিলাম।

এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এস্তভাবে দোজখের শিরদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমস্ত দোজখী উম্মতগণকে ডাকিবেন এবং যাহাদের অন্তরে অর্দ্ধবিন্দু ঈমান থাকিবে, তাহাদিগকে দোজখ হইতে শাফায়াত করিয়া নিয়া আসিবেন। এই সময়ে উম্মতে মোহাম্মদিয়া বেহেশতীদের মধ্যে সংখ্যায় দ্বিগুণে পরিগণিত হইবে।

ওহে খোদা রাসূলের পেয়ে শাফায়াত,
লাভ করি যেন তব সুখের জান্নাত।

অতঃপর দোজখে উম্মতে মোহাম্মদিয়া বলিতে আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না।

সর্বশেষ আল্লাহ্ পাক 'মোওয়াহহেদীন'–যাহারা শুধু এক মাত্র আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসী ছিল, তাহাদিগকে দোজখের আজাব হইতে মুক্তিদান করিবেন। মোটকথা, আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাসী বলিতে কেহই দোজখে থাকিবে না। চির দিনের জন্য আজাব ও নির্যাতন ভোগ করিবে শুধু কাফের ও মুশরিক–অংশীবাদিগণ।

–০–

মৃত্যুর হত্যা

দোজখীগণ পোলসেরাত হইতে কর্তন অবস্থায় দোজখে পতিত হইলে এবং মুসলমানগণ পোলসেরাত পার হইয়া বেহেশতে গমন করিলে, উভয় সম্প্রদায়ের জন্য স্বীয় অবস্থান চিরস্থায়ীভাবে নির্ধারিত হইয়া যাইবে। অতঃপর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থান হইতে গাইবী নির্দেশ আসিবে–

'হে বেহেশতীগণ! তোমরা অনতিবিলম্বে বেহেশতের কিনারায় সমবেত হও। আর হে দোজখীগণ! তোমরাও কালবিলম্ব না করিয়া দোজখের কিনারায় হাজির হও।'

এতদশ্রবণে উভয় দল খুশীতে স্বীয় বাসস্থানের (বেহেশত ও দোজখ) পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইবে। দোজখীগণ ভাবিবে, না জানি আল্লাহ গাফুরুর রাহীম আমাদের প্রতি কি মহান দয়া প্রদর্শন করেন! বেহেশতীগণ ভাবিবেন, হয়তো আল্লাহ্ পাক আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের দর্শন দান করিবেন।

আল্লাহ পাকের এই নির্দেশানুযায়ী যখন বেহেশতীগণ বেহেশতের কিনারায় এবং দোজখীগণ দোজখের কিনারায় হাজির হইবে, তখন এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শ্বেত ও কৃষ্ণ রং মিশ্রিত একটি মেষ আকৃতিরূপ মৃত্যুকে দণ্ডায়মান করা হইবে। অতঃপর বেহেশত ও দোজখবাসী উভয় সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করা হইবে–

'তোমরা কি এই মেষটিকে চিন?' উভয় সম্প্রদায় এক বাক্যে বলিবে, জ্বি হাঁ, আমরা সকলেই উহাকে চিনি–উহা মেষ আকৃতিরূপ মৃত্যু।'

অতঃপর আল্লাহ পাকের হুকুমে সকলের সম্মুখে মেষ আকৃতিরূপ মৃত্যুকে হত্যা করা হইবে এবং প্রচার করিয়া দেওয়া হইবে–'হে বেহেশত ও দোজখবাসীগণ! তোমরা জানিয়া রাখ, অদ্য হইতে আর কাহারও মরণ–সুরা পান করিতে হইবে না। তোমরা নিজ নিজ বাসস্থানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে থাক। 'হে বেহেশতিগণ! তোমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের চিরশান্তির স্থানে (বেহেশতে) মহা সুখ–ভোগে কালযাপন করিতে থাক। আর হে দোজখবাসিগণ! তোমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের এ দুঃখ ও যন্ত্রণার স্থানে (দোজখে) নির্যাতন ভোগ করিতে থাক।

হত্যা করে মরণেরে হবে এলান এই,
এখন হতে সবাই অমর মরণ কার নেই।
বেহেশত বাসী লভ অনন্তকাল সুখ,
দোজখবাসী তোমরা ভোগ চিরজীবন দুঃখ।

এতদশ্রবণে বেহেশতীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যাইবে এবং মনে মনে শান্তি অনুভব করিবে–'বড়ই আনন্দের হইয়াছে। অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া আর আমাদের ঘাড় মটকাইতে পারিবে না এবং আমাদের এই মহা সুখশান্তি ভোগ হইতেও বঞ্চিত করিতে পারিবে না।'

বলাবাহুল্য, দোজখবাসীগণ ইহা শুনামাত্র মাথায় দ্বিগুণভাবে করাঘাত করিয়া বলিতে থাকিবে, সর্বনাশ! হয়তো ইহার পরে হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া আমাদের এই দুঃখ-দুর্দশা হইতে পরিত্রাণ করিত। তাহাও ত আর হইবার মত নয়, তবে কি এইরূপ মহা শাস্তি ও নির্যাতন চিরদিনের মতই ভোগ করিতে হইবে?' এই ভাবিয়া তাহারা অত্যন্ত অস্থির ও দুঃখিত মনে মাথার চুল ছিঁড়িতে থাকিবে।

তৎপর দাজখের দ্বারসমূহ শিরদেশ হইতে কঠিনভাবে শক্ত করিয়া রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। দোজখীদের দোজখ হইতে বাহির হইবার সামান্য দুশ্চিন্তাটুকু যেন অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়া যায়।

অনুরূপ ভাবে বেহেশতের দ্বারসমূহও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বেহেশতীগণের যেন এ আশংকা মনে অদৌ উঁকি মারিতে সুযোগ না পায়-'না জানি এখান হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র গমন করিতে হয় এ প্রকার উদভ্রান্ত শংকা করার জন্য।

থাক সুখে চির দিন বেহেশত বাগান,
শুকুর কর খোদার রহীম রহমান।

--o--

পঞ্চম অধ্যায়

বেহেশত ও দোজখ

এক।। দোজখের বিবরণ

মহান আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির দাস সাজিয়া যে সকল জিন, ইনসান নিজেদের চালনা করে; আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষ বা নবী ও রাসূলগণের সত্যতা অস্বীকার করিয়া শিরক বা অংশিবাদিতায় লিপ্ত হয়-তাঁহাদের হুকুম অমান্য করে, কিংবা তাঁহাদের নিষেধাজ্ঞার সামান্যতম তোয়াক্কা করে না।; মৃত্যুর পরে অনন্ত অসীম দীর্ঘ দিনের দুঃখ-দুর্দশার কথা এতটুকুও মনে না করিয়া ক্ষণিকের এ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া নিজেদের তাহাতে ভাসাইয়া দেয়, -দুষ্কৃতকারী অবাধ্য এ সকল জিন ইনসানের জন্য আল্লাহ তা'আলা ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা রাখিয়াছেন-আজাব দিবেন তিনি তাহাদেরকে সেখানে। এই জঘন্য আজাবের কোন পরিসমাপ্তি নাই-নাই কোনরূপ বিরাম। পবিত্র কোরআনের ভাষায় এ স্থানকেই বলা হয়- জাহান্নাম বা দোজখ।

এই জাহান্নাম বা দোজখে পাপীদের জন্য অনন্তকাল পর্যন্ত বিরামহীন ভাবে আজাব ও যাতনা চলিতে থাকিবে। ক্ষণিকের জন্যও সেখানে শান্তি নাই, সুখ নাই- আছে শুধু দুঃখ আর দুঃখ। চারিদিকে শুধু আত্ম-চীৎকার, হাহাকার, বিভৎস আর্তনাদ এবং হায় মাতমের ভয়ঙ্কর ধ্বনি। কোথাও বা যমকালো প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসমূহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কোথাও বা উত্তপ্ত লূ হাওয়া শাঁ শাঁ করিয়া বহিতেছে, কোথাও আগ্নেয়গিরির মত প্রবল বেগে অগ্নিশিখাসমূহ উত্থিত হইতেছে। কোথাও প্রচন্ত শীতে জাহান্নামীদের আপাদমস্তক অবশ হইয়া আসিতেছে। কখনও শাস্তির অবতার যমকালো দৈত্যের মত ফেরেশতার তর্জন গর্জনে সমগ্র জাহান্নাম থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কোথাও ক্ষতস্থান বিগলিত পূঁজ ও পচা রক্তের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। কোথাও ফেরেশতাদের লাঠি ও গুর্জের আঘাতে জাহান্নামীদের অস্থি-মাংস চুরমার হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। কোথাও পূঁজ রক্তের সমুদ্রে পাপীগণ হাবুডুবু খাইতেছে। কোথাও অগ্নির কাঁচি দ্বারা জিহবা কাটা হইতেছে।

কোথাও উট খচ্চরের মত বৃহদাকার সর্প ও বিচ্ছুসমূহ ফণা বিস্তার করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে, আর উহাদের দংশনে অভিশপ্ত পাপীগণ ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। কোথাও উত্তপ্ত পানি পাপীদেরকে পান করানো হইতেছে, কাহারও বা মাথায় ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। ফলে উহাদের নাড়ী ভুঁড়ী আর মুখের মাংসসমূহ খসিয়া পড়িতেছে। কোথাও বিষাক্ত জাক্কুমের কড়াকাড়ি, কিংবা অগ্নিসমূহ কন্টকময় ঝাঁর ভক্ষণে জাহান্নামীদের গড়াগড়ি। সেখানে ফেরেশতাগণ নির্মম কঠোর-দয়া নাই, দাক্ষিণ্য নাই, নাই মায়া, নাই মমতা। আছে শুধু হাতে ডান্ডা, আগুনের ছড়ি, লোহার শৃঙ্খল হাতুড়ি, তর্জন গর্জন আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ!

এইরূপ হাজার হাজার কিসিমের আজাব ও গজবে লিপ্ত হইয়া দোজখবাসীগণের চীৎকার আর্তনাদে জাহান্নামের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইয়া উঠিবে। তদুপরি ফেরেশতাদের গর্জন ও জাহান্নামের ভীষণ হুঙ্কারে এমন এক কর্ণ বিদারক মহা হুলস্থুলপূর্ণ আওয়াজ উত্থিত হইবে যে, সুদীর্ঘ ৫০০ বৎসরের দূরত্ব হইতেও তাহা শ্রবণ করিলে কান ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইবে।

--o--

দোজখের স্তর ও সংখ্যা

পবিত্র কোরআন ও হাদীছ শরীফে দোজখের বহু সংখ্যক নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান সাতটির নাম ঃ

প্রথম ছায়ীর ঃ এই দোজখে যাহারা আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

দ্বিতীয় লাজা ঃ যাহারা যাকাত আদায় করে নাই, তাহারা উক্ত দোজখে শাস্তি পাইবে।

তৃতীয় ছাক্কার ঃ যাহারা নামাজ আদায় করে নাই ও গরীব দুঃখীদিগকে অন্নদান করে নাই, তাহারা তথায় শাস্তি ভোগ করিবে।

চতুর্থ জাহীম ঃ যাহারা আল্লাহর রাস্তা হইতে ঘাড় ফিরাইয়াছে ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিন্দেগীর লোভে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহারা উক্ত দোজখে প্রবেশ করিবে।

পঞ্চম জাহান্নাম ঃ যাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর কোন বান্দাকে হত্যা করিয়াছে, তাহারা তথায় শাস্তি পাইবে।

ষষ্ঠ হাবিয়া ঃ বিভিন্ন প্রকার পাপে লিপ্ত হইয়া যাহারা বদ আমলের পাল্লাকে ভারী করিয়াছে, তাহাদের তথায় হইবে বাসস্থান।

সপ্তম হোতামা ঃ যাহারা চোগলখুরী করিয়াছে, তাহারা উক্ত দোজখে শাস্তি ভোগ করিবে।

উপরি উক্ত সাতটি জাহান্নামেই দোজখীদের আজাব ও নির্যাতন হইতে থাকিবে। এছাড়া অন্যান্য প্রকার জাহান্নামও আছে। কোরআন পাকের ভাষায় এই গুলিকে দোজখের দরজা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কোন স্থানে এইগুলিকে 'স্তবক বা তবক'ও বলা হইয়াছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

দোজখ সাতটি দরজা বিশিষ্ট। প্রত্যেক দরজাতেই উক্ত পাপীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ পথ রহিয়াছে।'

হাদীছ শরীফে আছে, হজরত নবী করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ দোজখের সাতটি দরজা আছে। উহাদের মধ্যে একটি সেই সমস্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট যাহারা অন্যায়ভাবে আমার উম্মতের উপর অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

জাহান্নামের সপ্ত তলা একের তলে আর,
ভোগবে কঠিন শাস্তি একেক কিছিম গুনাগার।

উপরি উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, দোজখের সাতটি দরজা রহিয়াছে। সাত দরজা অর্থ সাতটি তবক (স্তর)। প্রত্যেক স্তরেই পাপ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আজাবের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোন কোন তাফসীরকারগণের মতে সাতটি দরজাই বটে, তবে দোজখবাসীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন একটি দরজা যথেষ্ট নহে বলিয়া ৭টি দরজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আল্লামা ইবনে কাছীর হজরত আলী হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তিনি হাতের ইশারায় বলিয়াছেন ঃ দোজখের উপর নীচে ৭টি স্তর হইবে। প্রত্যেক স্তরেই বিভিন্ন দরজা হইবে।

এই সম্পর্কে আল্লাহ পাকের এরশাদ হইতেছে-

ঃ নিঃসন্দেহে মোনাফেকগণ (কপটগণ) দোজখের একেবারে তলদেশে প্রবেশ করিবে।

লোক দেখান ঈমান-ওয়ালা-কপট মুনাফিক,
জায়গা এদের জাহান্নামের সবচে' নীচে ঠিক।

এ উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, দোজখের দরজাগুলি ছাড়াও উহার স্তর বা 'তবক' রহিয়াছে। এই স্তরগুলির একটি হইতে অপরটি ভয়ঙ্কর।

দোজখের গভীরতা ও প্রাচীর : হজরত রসূলে করীম (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন : দোজখ চারিটি বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। উহার প্রত্যেকটি প্রাচীরের বিরাট পুরত্ব-অতিক্রম করিতে ৪০ বৎসর সময় লাগিবে।

পোলসেরাত দোজখের উপর প্রতিষ্ঠিত-একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহর হাদীছ হইতে ইহাই প্রমাণিত। তিনি দোজখের গভীরতা সম্বন্ধে ফরমাইয়াছেন : যদি একটি পাথর পোলসেরাত হইতে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পাথর দোজখের তলদেশে পৌছিতে ৭০ বৎসর সময় লাগিবে।

হজরত আবু হোরাইয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা একদিন হুজুরের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা কোন একটি জিনিস পতিত হইবার বিকট শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন হজরত (ছাঃ) আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জান, ইহা কিসের শব্দ? আমরা উত্তর করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন হুজুর উত্তর করিলেন, 'আল্লাহতাআ'লা একটি পাথর দোজখের মুখ হইতে নীচের দিকে ছাড়িয়াছিলেন, অতঃপর উহা ক্রমাগত ৭০ বৎসর যাবৎ নীচের দিকে ধাবিত হওয়ার পর দোজখের তলদেশে পৌছে। ইহা জাহান্নামের তলদেশে ধাক্কা খাওয়া সেই পাথরের শব্দ।

দোজখের আগুন : দোজখীদের আজাবের অন্যতম উপকরণ আগুন। দুনিয়ার আগুনের সাথে এর কোন তুলনা হয় না। যদিও দুনিয়ার বা সাধারণ আগুনের দাহ্য বা পোড়ানো ক্ষমতা যথেষ্ট আছে এবং তা সম্পূর্ণ দাহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন; তবুও দোজখের আগুনের তুলনায় তা সামান্যই। কারণ মহান আল্লাহতা'আলা উহার তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছেন। আর তা এজন্যই যে, দোজখীদের পোড়ানোর ব্যাপারে তা যেন সফলতার সাথে কাজ করিতে পারে।

আল্লাহর রাসূল বলেন-

: দোজখের অগ্নিকে হাজার বৎসর উত্তপ্ত করার পর উহা লোহিত বর্ণ ধারণ করে-দেখিতে উহা কটা লাল বর্ণের হয়। অতঃপর উক্ত অগ্নিকে

আরও তীব্রতর অধিক দাহিকা ক্ষমতা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত আগুনকে আরও এক হাজার বৎসর কাল উত্তপ্ত করা হয়। ফলে তা অধিক তীব্রতর হইয়া শ্বেত-বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর এই তীব্র দাহিকা সম্পন্ন আগুনকে সর্বাধিক তীব্র করার উদ্দেশ্যে পুনঃ এক হাজার বৎসর কাল তেজ করা হয়, ফলে উহা ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বাধিক তেজোদীপ্ত দাহিকা স্বভাব সম্পন্ন হয়। বর্তমানে দোজখের আগুনের রং ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের এবং দোজখও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় রহিয়াছে। রাসূলে করীম (ছাঃ) অন্যত্র ইরশাদ করেন-

: ছাহাবাগণ! তোমাদের এ দুনিয়ার আগুন হইতে দোজখের আগুন সত্তর গুণ অধিক দাহিকা ক্ষমতা সম্পন্ন। ছাহাবাগণ হুজুরের পবিত্র জবানে ইহা শুনিয়া বলিলেন : ইহা রাসূলাল্লাহ! আমাদের এ দুনিয়ার আগুনই তো পোড়ানোর জন্য যথেষ্ট-এই দাহিকা সম্পন্ন আগুনইতো পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতে পারে।' উত্তরে হজরত রাসূলে করীম (ছাঃ) বলিলেন : বটে! তবুও দোজখীদের চরম আজাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে উহাকে দুনিয়ার আগুন হইতে উনসত্তর গুণ অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে।

দুনিয়ার আগুন ও দোজখের আগুনের দাহিকা ক্ষমতার তুলনা করিতে গিয়া রাসূলে করীম (ছাঃ) অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন :

দুনিয়ার আগুন দোজখের আগুনের তুলনায় এতই শীতল ও আরামদায়ক যে, দোজখীদের যদি দুনিয়ার আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাহাদের নিদ্রা আসিবে।'

এতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দুনিয়ার আগুন দোজখের আগুনের তুলনায় কত নিম্নমানের দাহিকা সম্পন্ন। দুনিয়ার সাধারণ আগুনের সাথে দোজখের আগুনের তাই কোন তুলনাই হয় না।

তুলনামূলক দোজখীদের সবচাইতে নিম্নতর আজাবের একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নবী করীম (ছাঃ) বলেন-

: সবচাইতে কম আজাব সে ব্যক্তির হইবে যাহাকে একজোড়া অগ্নির জুতা পরানো হইবে। উহার ফিতাও হইবে আগুনের তৈরী। এই অগ্নি জুতার উত্তপ্ত দাহিকায় সে ব্যক্তির মস্তক টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে এবং চতুর্দিক দিয়া উহা বাহিয়া পতিত হইতে থাকিবে। সে ব্যক্তি যদিও

মনে করিবে, ইহাই তাহাকে সর্বাধিক শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই তাহার সবচাইতে নগণ্য ও সামান্য আজাব।

দোজখের সর্প ঃ দোজখবাসীদের আজাবের অপর উপকরণ হিসাবে সেখানে রাখা হইয়াছে অসংখ্য অগ্নি-সর্প। উহাদের আকৃতি বড় আকারের উটের ন্যায়। এই সকল সর্প একবার কোন দোজখীকে দংশন করিলে তার বিষক্রিয়া থাকিবে বহুদিন, বহু বৎসর এবং ক্ষতস্থান হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর। জ্বালা-যন্ত্রণায় প্রাণ হইবে ওষ্ঠাগত। অনুরূপ বিরাট বিরাট বিচ্ছুও দোজখে থাকিবে ভরপুর। উহাদের আকৃতি খচ্চরের ন্যায় বিরাট। উহারাও একবার দংশন করিলে তার বিষক্রিয়া চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হইবে।

আজাবের দৃষ্টান্ত ঃ দোজখের আজাবের দৃষ্টান্ত বুঝাইতে গিয়া রাসূলে করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেন-কেয়ামতের দিবস একজন দোজখের উপযোগী ব্যক্তিকে যে দুনিয়ায় সবচাইতে আরাম-বিলাসীতা ও সুখ-শান্তির জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল এমন একজনকে একবার মাত্র দোজখের অগ্নিতে ডুবাইয়া আনা হইবে।

অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও সুখ ও শান্তি বলিতে কিছু দেখিয়াছ? উত্তরে সে বলিবে ঃ হে প্রভু, আমি কসম করিয়া বলিতেছি, সুখ বলিতে আমি কোন জিনিষ জীবনে কখনও দেখিতে পাই নাই বা অনুভব করি নাই।

অনুরূপ, একজন বেহেশতের উপযোগী ব্যক্তিকে যিনি দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বেশী দুঃখি ব্যক্তি ছিল, তাহাকে বেহেশতের বাগিচা একবার মাত্র দেখাইয়া আনা হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি কখনও দুঃখ বা মুছীবত দেখিয়াছ? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে ঃ 'হে প্রভু, তোমার কসম খাইয়া বলিতেছি, আমি দুঃখ বা মুছীবত বলিতে কোন জিনিস জীবনে দেখি নাই।'

এই সম্পর্কে রাসূলে করীম (ছাঃ) অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন-'হে মানুষ সকল! তোমরা আপন গুনাহকে স্মরণ করিয়া কাঁদ। যদি তোমাদের কান্না না আসে তাহা হইলে কাঁদিবার ভান করিয়া কাঁদিতে থাক। কেননা দোজখীগণ দোজখের মধ্যে এতই কাঁদা কাঁদিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের পানিতে বুক ভাসিয়া ঝরণার মত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এমন কি,

তাহাদের চক্ষের পানি যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন তাহারা রক্তের কান্না কাঁদিতে থাকিবে-চক্ষুতে ঘা হইয়া যাইবে। এমনকি চক্ষে রক্তের স্রোত এমনি প্রবাহিত হইবে যে, উহাতে কিস্তিও ভাসাইয়া দিলে ভাসিয়া বেড়াইবে।

দোজখী মানুষ আল্লাহ পাকের অভিশপ্ত মানুষ। তাদের আজাব যেমনি জঘন্য, অবস্থাও তাহাদের হইবে তেমনি কুৎসীত। এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ) দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন ঃ যদি দোজখীদের ঘায়ের পুঁজ বা রক্ত একফোটা পরিমাণ দুনিয়ায় দেওয়া হইত, তবে তাহার দুর্গন্ধে সমস্ত বস্তু নষ্ট হইয়া যাইত।

দুনিয়ার গরম-ঠাণ্ডা দোজখের ক্রিয়া ঃ শীত ও গ্রীষ্মকালের এই দুইটি পরিবর্তন আমরা এ দুনিয়ায় স্পষ্ট দেখিতে পাই; শীতকালে অনুভব করি তীব্র ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মকালে অস্থির হই প্রচণ্ড গরমে। শীত ও গ্রীষ্মকালের এই যে পরিবর্তন, ইহাও দোজখের প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এর কারণ হিসাবে নবীয়ে করীমের একটি হাদীছ লক্ষণীয়। তিনি ইরশাদ করেন ঃ 'তোমরা গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ সামান্য দেরী করিয়া পড়িবে, কারণ দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরম দোজখের গরমের প্রশ্বাস বিশেষ।

রাসূলের এ উক্তি হইতে প্রমাণ হয়, দুনিয়ার প্রচণ্ড গরম দোজখ হইতে আগত। হাদীছের ভাষায় একে দোজখের প্রশ্বাস বলা হয়। এ সম্পর্কে রাসূলে খোদা তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ দোজখের তেজ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দোজখ আল্লাহর দরাবারে আরজ করিয়া বলিবে-

প্রভু হে, আমার দাহিকা ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে যে, এখন আমার একাংশ বিগলিত হইয়া অপর অংশের সাথে মিশ্রিত হইবার উপক্রম হইয়াছে- একাংশ অন্য অংশকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; এখন আমি কি করিতে পারি? আমার কিছু স্বাভাবিক হইবার অনুমতি প্রদান করুন।

ইহাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা দোজখকে বৎসরে দুইবার শ্বাস বা ভাপ ছাড়িবার অনুমতি প্রদান করেন। ফলে শীতকালে একবার, গ্রীষ্মকালে একবার, এই দুইবার শ্বাস বা ভাপ ছাড়িয়া থাকে। দোজখ গরমের দিনে যে শ্বাসি ছাড়িয়া থাকে উহা দোজখের গরম অংশের

তাপেরই প্রতিক্রিয়া এবং শীতের দিনে যে শ্বাস ছাড়ে, তা দোজখের শীতল অংশের ভাপের প্রতিক্রিয়া।

বর্ণিত আলোচনায় আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হইল যে, দোজখীদের আজাব ও যন্ত্রণা প্রদান কল্পে আগুন তথা গরম যে প্রকার উপকরণ, অনুরূপ শীতলও দোজখীদের আজাব প্রদানের বিশিষ্ট উপকরণ। আর এ জাতীয় আজাবের উপকরণ আগুনের দাহিকা উপকরণ হইতে কোন ক্রমেই নিম্ন মানের হইবে না।

জ্বিন ও মানব জাতির দুবৃত্ত পাপাচারিদের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে জাহান্নাম বা দোজখ। মানুষের সৃষ্টির মৌল উপকরণ মাটি। আর জ্বিন জাতের সৃষ্টির মৌল উপকরণ অগ্নি। সাধারণ কথা—সমজাতীয় বস্তুদ্বারা সমজাতীয় বস্তুকে আজাব বা কষ্ট দেওয়া দুরূহ—দিব্য দৃষ্টিতে তা প্রমাণও হয় না। যেহেতু জ্বিন জাতি আগুন বা গরম পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট, তাই দোজখে উহাদের আজাব তার বিপরীত জাতীয় পদার্থ তথা ঠাণ্ডা বা শীতল জাতীয় জিনিসে হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তি সঙ্গত।

এ কারণেই কোন কোন বুজর্গ ব্যক্তিবর্গ বলিয়াছেন—জ্বিনদের ভীষণ ঠাণ্ডা জাতীয় বস্তু দ্বারা দোজখে আজাব দেওয়া হইবে। একই কারণে তাহারা এ কথাও বলেন যে, দুনিয়াতেও তাই উহারা শীতল স্থানে বসবাস করিতে পারে না এবং শীতল আবহাওয়াও তাদের অসহ্য। এ শ্রেণীর বুজুর্গবর্গ একই কারণে হত্যাকারীদের আজাবও জ্বিন সম্প্রদায়ের ন্যায় শীতল উপকরণ দ্বারাই দেওয়া হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কারণ, হত্যাকারীরাও অগ্নির ন্যায় উত্তেজিত হওয়া ব্যতীত অন্যকে হত্যা করিতে পারে নাই।

দোজখের জ্বালানী ঃ আল্লাহর কুদরতেই সব কিছু সম্ভব। আর তা হইয়াও থাকে। দোজখ প্রজ্জ্বলনের জন্যও তাই কোন প্রকার জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না; তবুও আল্লাহ পাক দোজখীদের সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে দোজখের জ্বালানীর অন্যতম উপকরণ মানুষ ও পাথরের কথা কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ পাক বলেন—

'অকূদুহান্নাসু আল হিজারাহ'—মানুষও পাথর হইল দোজখের ইন্ধন জ্বালানী।

হিজর অর্থাৎ পাথর। পবিত্র আয়াতে বর্ণিত পাথর এখানে দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথম অর্থ, যাহা বিখ্যাত ভাষ্যকার আবদুল্লাহ ইবনে মাছউদের বর্ণনা। তিনি বলিয়াছেন যে, পাথর দোজখের লাকড়ি ইন্ধন হইবে, উহা গন্ধকের তৈয়ারী পাথর। যেদিন আল্লাহতা'আলা আসমান-জমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, সে দিন হইতেই উক্ত পাথর প্রথম আসমানে রক্ষিত হইয়াছে, উহা একমাত্র কাফেরদের শাস্তির জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অপর একটি বর্ণনায় বোঝা যায়, কাফেরগণ যে সকল পাথরের মূর্তি পূজা করিত, সেই সকল পাথর-মূর্তি দোজখের ইন্ধনরূপে ব্যবহার হইবে! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

'হে মোশরেকগণ! নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য মা'বুদ সকল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।'

হজরত ইবনে মাছউদ হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরাম (ছাঃ) বলিয়াছেন ঃ হাশরের দিন দোজখকে সত্তর হাজার শৃঙ্খল দ্বারা টানিয়া আনা হইবে! প্রত্যেক শৃঙ্খলকে ৭০ হাজার ফেরেশতা ধরিয়া থাকিবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন—খোদা না করুক, যদি দোজখের শিকলসমূহ ফেরেশতাদের হাত হইতে ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে ভালমন্দ নির্বিচারে সমস্ত লোককে সে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, কেহই তার হাত হইতে রেহাই পাইবে না।

হাদীছ শরীফে আছে, কেয়ামতের দিবস দোজখের একটি বিশেষ ধরনের ঘাড় বাহির হইয়া আসিবে, যাহার দুইটি চক্ষু হইবে, যদ্দারা সে দেখিতে পাইবে এবং তাহার দুইটি কর্ণ হইবে, যদ্দারা সে শুনিতে পাইবে। এবং একটি মুখ হইবে যাহা দ্বারা সে বিভিন্ন কিসিমের কথাবার্তা বলিতে পারিবে।

দোজখের আজাবের ফেরেশতার সংখ্যা ঃ দোজখীদের আজাবের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে উনিশজন ফেরেশতা। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাপীদের বিভিন্ন প্রকার আজাবের দায়িত্বে নিয়োজিত। অন্যথায়, দোজখীদের আজাবের জন্য একজন মাত্র ফেরেশতাই যথেষ্ট। কারণ তাহারা প্রত্যেকেই এতবড় মজবুত ও শক্তিশালী যে, মানব দানবের শক্তি তাহাদের কাছে কিছুই নহে।

কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে—

'আলাইহা তিসআতু আশারা'—দোজখে উনিশ জন ফেরেশতা নিযুক্ত রহিয়াছে।'

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন—

'তথায় শক্তিশালী ও মজবুত ফেরেশতাগণ নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা আল্লাহর আদেশের বিন্দুমাত্রও অন্যথা করেনা বরং যাহা করিবার জন্য আদেশ করা হয়, তাহাই করিয়া থাকে।'

এ সম্পর্কে নবী করিম (ছাঃ) ইরশাদ করেন—দোজখের একজন মাত্র ফেরেশতার শরীরে সারা জাহানের জ্বিন এবং ইনসানের সমতুল্য শক্তি ও ক্ষমতা রহিয়াছে।

পাপীদের দোজখের আহ্বান ঃ দোজখীদের তথায় নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বেই দোজখের বিকট হুঙ্কার তাহারা শুনিতে পাইবে। মনে হইবে, দোজখ তাহাদের উপর ভীষণ ক্ষেপিয়া আছে। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে হুশিয়ার করিয়া বলেন—

'যাহারা আপন প্রভুকে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি রহিয়াছে এবং উহা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। যখন তাহারা উক্ত দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তাহারা উহার ভীষণ হুঙ্কার শুনিতে পাইবে এবং উহা এ রকম টগ বগ করিতে থাকিবে যেন শীঘ্রই ভীষণ রাগে ফাটিয়া পড়িবে।

তফসীরে বয়ানুল কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হয়ত আল্লাহ তা'আলা দোজখের ভিতর রাগান্বিত হইবার এক অনুভূতি পয়দা করিয়া দিবেন, না হয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, দোজখের অবস্থা দৃষ্টে মনে হইবে যেন উহা ভীষণ রাগান্বিত হইয়াছে।

দোজখের হুঙ্কার দোজখীরা শুনিতে পাইবে দুর হইতে। যেমন বাজারের নিকটে পৌছিলে বাজারের শোরগোল শোনা যায়। কিন্তু দোজখীরা বন্ধন অবস্থায় অদূরে থাকিতেই দোজখের আহবান শ্রুত হইবে এবং তখন তাহারা মৃত্যুকে স্মরণ করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকিবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন—

ঃ যখন উক্ত দোজখ দুর হইতে জাহান্নামীদিগকে দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা উহার বিকট শব্দ ও হুঙ্কার শুনিতে পাইবে। অতঃপর যখন তাহাদিগকে বন্ধনাবস্থায় দোজখের কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা শুধু মৃত্যুকে আহবান করিতে থাকিবে।'

দুনিয়ার বুকে মানুষ কোন বিপদগ্রস্ত হইলে যে রকম শুধু বলিতে থাকে, হায় মরিয়া গেলাম! হায় মরিয়া গেলাম! তদ্রূপ দোজখবাসীগণও বলিতে থাকিবে। কিন্তু তাহাদের চীৎকার ও আর্তনাদ কোন কাজেই আসিবে না। কেহই তাহাতে সাড়া দিবে না বা কর্ণপাত করিবে না। যদিও দোজখ প্রশস্ত স্থান, তবুও শাস্তির জন্য পাপীদিগকে মাঝে মাঝে সংকীর্ণ স্থানে রাখা হইবে।

ছুরায়ে মায়ারেজে আছে, আল্লাহ বলেন—

ঃ দোজখ ঐ সমস্ত লোকদিগকে নিজের দিকে আহবান করিবে যাহারা হক রাস্তা হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে এবং আল্লাহ তাআ'লার গোলামী হইতে মুখ ফিরাইয়াছে এবং অবৈধভাবে ধন সম্পদকে জমা করিয়া সংরক্ষিত করিয়াছে।'

--o--

দোজখীদের পরিসংখ্যান

পৃথিবীতে যত লোকের আগমন ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে, তাহাদের মধ্যে এক হাজার লোকের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন লোকই হইবে দোজখী। বাকী মাত্র এক জন যাইবে বেহেশতে। এ সম্পর্কে রাসূলে করীমের (ছাঃ) একখানা নাতিদীর্ঘ হাদীছ আছে, তিনি ইরশাদ করেন—

ঃ দ্বিতীয়বার যখন হজরত ইস্রাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখন সমস্ত লোক হঠাৎ নিজ নিজ কবর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে যে, আপন প্রভুর সম্মুখে চল। ফেরেশতাদের প্রতি ফরমানে এলাহী জারী হইবে যে উহাদিগকে দাঁড় করাও, কারণ উহারা নিজ নিজ কৃত কর্মের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইবেন। তখন আবার আল্লাহতাআ'লার আদেশ জারী হইবে যে, পাপীদিগকে পৃথক করিয়া ফেল। ইহাতে ফেরেশতাগণ বলিবেন, 'ওহে পরওয়ারদেগার, কত জন মানুষ

হইতে কত জন দোজখী বাহির করা হইবে?' ইরশাদ হইবে ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন দোজখীকে বাহির কর।'

অপর এক হাদীছে জানা যায়, গরীব মুসলমান ও নারীর সংখ্যাই দোজখী হইবে অধিক। এ বিষয়ে হজরত (ছাঃ) বলেন—

ঃ আমি দোজখের মধ্যে অভাবগ্রস্ত গরীব মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী দেখিয়াছি। এ ছাড়া দোজখের মধ্যে নারীদের সংখ্যা দেখিয়াছি সর্বাধিক পরিমাণ।

দোজখীদের ছুরত ও আকৃতি ঃ অধিক আজাব ভোগ করার জন্য বিরাট আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া যুক্তিসংগত। কারণ আজাব হাড়ে হাড়ে পৌছানোর জন্য বিশাল দেহ হওয়া প্রয়োজন। দোজখীদের তাই দেহাকৃতি হইবে যেমনি বিশাল, ছুরতও হইবে তেমনি কুৎসিত। দেখিলে যে কেহর অভক্তি হইবে, ভীত হইবে দেখিলে তাহাদের বিরাটকায় আকৃতি। এ বিষয় হাদীছে বলা হইয়াছে—

হজরত নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নামী কাফেরদের এক বাহু হইতে অপর বাহুর দূরত্ব হইবে তিন দিনের পথ, যদিও তার উপর দিয়া কোন দ্রুতগামী ঘোড়া চলিয়া যায়। কাফেরদের সামনের দাঁত হইবে অহুদ পাহাড়ের মত বিরাট এবং তাহাদের শরীরের চামড়া তিন দিনের পথ বরাবর পুরু হইবে।' অন্য একটি রেওয়ায়েতে দোজখীদের শরীরের চামড়া ৪২ গজ পুরু হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে।

দোজখীদের ছুরত কেমন কুৎসিত ও কদাকার হইবে, এ সম্পর্কে কোরআন মজিদে স্পষ্ট বর্ণনা আছে, আল্লাহ বলেন—

ঃ আর যাহারা পাপকার্যসমূহে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অপরাধের শাস্তি অপরাধ পরিমাণ হইতে থাকিবে এবং তাহাদিগকে এই ভাবে বেইজ্জত ও পর্যুদস্ত করা হইবে যে, আল্লাহর আজাব হইতে তাহাদেরকে রক্ষাকারী আর কেহই থাকিবে না। তাহারা এত বদছুরত হইবে যেন অন্ধকার রাত্রির তীব্র অন্ধকার তাহাদের মুখমণ্ডলকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি দোজখীদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তিকে দুনিয়াতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার ভয়ঙ্কর ছুরত ও দুর্গন্ধে দুনিয়ার সকল জীব জন্তু মরিয়া যাইবে। অতঃপর হজরত আবদুল্লাহ অনেকক্ষণ কাঁদিতে থাকেন।

এক সম্পর্কে কোরআন মজিদেও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন—

ঃ অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে এমনিভাবে জ্বালাইয়া দিবে যে, উহা সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবে।

নবীয়ে করীম (ছাঃ) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, দোজখীদের আগুনে এমনিতর জ্বালাই বিকৃত করিবে যে, তাহাদের উপরের ঠোঁঠ বিকৃত হইয়া মাথা পর্যন্ত উঠিয়া যাইবে।

এমনকি দোজখীদের জিহবা এত বড় হইবে এবং উহা টানিয়া বাহির করা হইবে, যাহার উপর দিয়া লোক হাটিয়া যাইতে সমর্থ হইবে। ইহার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া রাসূলে করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন—

ঃ কাফেরগণ নিজ নিজ জিহবাকে একক্রোশ পর্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে, যার উপর দিয়া মানুষ হাটিয়া যাইবে।

বিভিন্ন পাপে ভিন্ন ভিন্ন আজাব

রিয়াকারদের আজাব ঃ ইবাদত পুণ্যের হইলেও যদি ইহার উদ্দেশ্যে লোক দেখানো হয়, তবে উহাকেই বলে রিয়া। ইহা এ ধরনের শিরক— মহা গুনাহের কাজ।

হুজুর আকরাম (ছঃ) বলিয়াছেন ঃ 'জুব্বুল হুজন' অর্থাৎ চিন্তার কূপ হইতে তোমরা আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ চাও। ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! 'জুব্বুল হুজন কি জিনিস? হুজুর উত্তর করিলেন, উহা দোজখের মধ্যে একটি গর্ত যাহা হইতে স্বয়ং দোজখই দৈনিক চারিশত বা আল্লাহর দরবারে পানাহা চাহিতেছে।' ছাহাবারা বলিলেন, তাথায় কাহারা শাস্তি পাইবে? হুজুর উত্তর করিলেন, সেইসব ইবাদতকারী তথায় গমন করিবে, যাহারা লোকদের দেখানোর নিমিত্ত ইবাদত করিয়াছে।

মদখোরের আজাব ঃ বুদ্ধিশূন্যতা মানবতা বিরোধী, মানবতা ও বিবেকশূন্য মানুষ সমাজে ঘৃণিত এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে তাহার খেয়াল থাকে না আদৌ। মদের নেশায় মানুষ নির্লজ্জ ভাবে সব কিছুই করিতে পারে, এজন্যই ইহা পান করা মহা পাপ। এ প্রকার পাপের শাস্তি সম্পর্কে হুজুর আকরাম (ছাঃ) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহতাআ'লা আপন

ইজ্জতের কসম খাইয়া ওয়াদা করিয়াছেন, আমার বান্দাগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এক গ্লাস মদও পান করিবে আমি তাহাকে সেই পরিমাণ পুঁজ পান করাইব এবং যে ব্যক্তি আমার ভয়ে শরাব পান ত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহাকে পবিত্র হাউজে কাউছার হইতে পান করাইব।' হজরত আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিশার দ্রব্য পান করিবে, আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাকে রোজ কেয়ামতে তীনাতুল খেয়াল পান করান হইবে। ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর, তীনাতুল খেয়াল আবার কি জিনিস? হুজুর পাক উত্তর করিলেন— উহা দোজখবাসীদের ঘাম ও নিংড়ানো পুঁজ রক্ত।

হজরত আবু মূসা আশ'আরী হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছাঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে ও সে অবস্থাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, আল্লাহ তাআ'লা তাহাকে নহরুল গোতা হইতে পান করাইবেন। ছাহাবারা উহার তথ্য জানিতে চাহিলে হুজুর উত্তর করিলেন ঃ 'উহা এমন একটি নহর যাহা ব্যভিচারী নারীদের লজ্জা স্থান হইতে প্রবাহিত কুৎসীত পদার্থ।

আমলহীন বক্তার আজাব ঃ 'যে ব্যাপার তোমার আমল নাই, তার নচীহত অন্যদের করিও না' —আল্লাহর এ বাণীর বিরুদ্ধে গিয়া যারা মানুষকে উপদেশ খয়রাত করে, তাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফর্মান ঃ যে রাত্রে আমি মেরাজ গমন করি, সেই রাত্রে আমি কতগুলি লোককে দেখিয়াছি যে, তাহাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই জিব্রাঈল, উহারা কাহারা? তিনি উত্তর করিলেন, উহারা আপনার ঐ সমস্ত উম্মত, যাহারা লোকদিগকে সৎকাজের আদেশ করিত অথচ নিজেরা তাহার প্রতি আমল করিত না এবং আল্লাহর কিতাব পড়িত অথচ তদরূপ আমল করিত না।

এ সম্পর্কে রাসূলে করীমের (ছাঃ) অন্য একটি হাদীছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেখা যায়, হাদীছটি সংগ্রহ করিয়াছেন ইমাম বোখারী ও মুসলিম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন— কেয়ামতের দিবস এক ব্যক্তিকে হাজির করার পর দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পেটের ভিতরের নাড়ী ভূঁড়ি সব বাহির হইয়া পড়িবে এবং সেই ব্যক্তি উহার

চারিদিকে এ রকম চক্কর দিতে থাকিবে, যে রকম গাধা ঘাণির চারিদিকে চক্কর দিতে থাকে। তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য দোজখীরা তাহার চারি পার্শ্বে ভীড় জমাইতে থাকিবে এবং বলিতে থাকিবে—

ওহে হতভাগ্য! তোমার কি হইয়াছে, তুমি দুনিয়াতে ভাল কাজের জন্য আদেশ করিতে এবং মানুষকে মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিতে। তখন সে উত্তর করিবে, হাঁ, আমি তোমাদিগকে নেক কাজের আদেশ করিতাম অথচ নিজে উহার আমল করিতাম না। আর অন্যায় কাজ হইতে মানুষকে ফিরাইয়া রাখিতাম অথচ নিজে সেই অন্যায় আমল করিতাম।

অনুরূপ, ইলেম গোপনকারী আলেমের জিহবায় ও মুখে আগুনের লেগাম লাগানো হইবে। এ সম্পর্কে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন ঃ যাহার নিকট কোন মাছায়েল জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, অথচ সেই ব্যক্তি নিজের ইলেমকে গোপন রাখিয়া জানা সত্ত্বেও উত্তর দেয় নাই। কেয়ামতের দিবস তাহার মুখে আগুনের লেগাম পরান হইবে।

আত্মহত্যার আজাব ঃ আত্মহত্যা মহা পাপ। কারণ ইহাতে আল্লাহর কাজে নাখোশ থাকার শামিল। এ সম্পর্কে রাসূলে করীম বলেন— যে ব্যক্তি পর্বত শৃঙ্গ হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সে দোজখের অগ্নির পর্বত হইতেও পড়িতে থাকিবে, ইহাতে তাহার কোন বিরাম হইবে না। আর যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা হইয়াছে, সে দোজখের অগ্নিতে উক্ত বিষ সর্বদা পান করিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি লৌহের কোন অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা হইয়াছে, সে উক্ত লৌহ অস্ত্র দোজখের অগ্নিতে নিজের পেটে বিদ্ধ করিতে থাকিবে।

অহংকারীর সাজা ঃ অহঙ্কার শয়তানের স্বভাব! এই শয়তানী স্বভাব মানুষের দীন দুনিয়ার সুখ নষ্ট করে। দুনিয়ায় কোন ব্যাপারে তার শান্তি থাকিবে না। পরকালে আজাব সম্পর্কে হুজুর আকরাম (ছাঃ) ইরশাদ করেন— যাহারা অহঙ্কার ও গর্ব করিয়াছে, তাহারা পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র শরীর নিয়া কেয়ামতের মাঠে উঠিবে। অবশ্য আকৃতি তাহাদের মানুষের আকৃতিই হইবে। অতঃপর হুজুর বলেন, চুতুর্দিক হইতে তাহারা বেইজ্জত হইতে থাকিবে, অবশেষে দোজখের জেলখানার দিকে চালিত হইতে থাকিবে, যাহার নাম বুলেছ। উক্ত বুলেছ নামীয় জেলখানায় এত কঠিন

আগুনের ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, যাহা অন্যান্য আগুনকে আগুনকে খাইয়া ফেলিয়ে পারে এবং তাহাদিগকে তীনাতুল খেয়াল— অর্থাৎ দোজখীদের নিংড়ান রক্ত, পুঁজ ও চর্বি ইত্যাদি খাওয়ান হইবে।'

অন্য একটি হাদিছে আছে—

দোজখে একটি ময়দানের নাম হাব-হাব। গর্বিত ও অহঙ্কারী ব্যক্তিগণকে তথায় শাস্তি দেওয়া হইবে।

--০--

দোজখীদের খাদ্য ও পানীয়

দোজখ যাতনা ও পাপীদের আজাবের ঘৃণিত স্থান। এখানে যাহা কিছু করা হইবে সবই যাতনা, দুঃখ ও আজাবের। তাদের পানাহারের বস্তু হইবে সেখানে আজাব। মর্মান্তিক যাতনার হইবে খাদ্য-পানীয়। নিম্নে উহার বর্ণনা দেওয়া গেল।

গরম পানীয় ও দ্বারী খাদ্য ঃ দোজখীররা যখন ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালায় অস্থির হইবে, তখন তাহদের জন্য উত্তপ্ত পানি ও কন্টকময় খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইবে। কোরআনের ভাষায় এই কন্টকময় খাদ্যকে 'দ্বারী' বলা হইয়াছে। দ্বারী নামক এই খাদ্য খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্ত দুরের কথা কাটার যাতনায় ভক্ষণকারী হইবে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য।

আল্লাহ পাক বলেন—

ঃ পান করানো হইবে দোজখীদের উত্তপ্ত নহরের পানি, খাওয়ানো হইবে দ্বারী জাতীয় অগ্নি কন্টক খাদ্য। এতে না আছে কোন প্রকার প্রাণ শক্তি, না হইবে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ।'

হেজাজে 'দ্বারী' নামীয় এক প্রকার কন্টকময় বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষ এত কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত যে, চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার উহার ধারে কাছেও যায় না। কারণ সেই গাছ ভক্ষণ করিলে জানোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এই আয়াত শরীফে 'দ্বারীউন শব্দ দ্বারা আগুনের কন্টককে বুঝান হইয়াছে, যাহা উক্ত বৃক্ষ হইতেও তিক্ত ও কিষাক্ত এবং মৃত পশু হইতে

অধিক দুর্গন্ধযুক্ত আর আগুন হইতে উত্তপ্ত, যাহা অধিক পরিমাণ ভক্ষণ করিলেও না পাইবে তাতে কোন প্রাণ-শক্তি, না নিবৃত্ত হইবে ক্ষুধা।

মায়ে হামীম ঃ হাদীছের উক্তি হইতে জানা যায়, দোজখে 'মায়ে হামীম' বা উষ্ণ পানির একটি নহর আছে। উক্ত নহরের পানি এতই গরম যে, দোজখীরা পানির পিপাসায় অস্থির হইয়া আল্লাহর কাছে পানি পান করিতে আবেদন নিবেদন করিলে তিনি উক্ত উষ্ণ নহর হইতে পানি পান করিতে আদেশ করিবেন। দোজখীরা উক্ত পানি পান করিলে উষ্ণতার তীব্রতা হেতু তাহাদের উপরের ওষ্ঠ কর্ণ ও নাক পর্যন্ত উঠিয়া যাইবে। এবং নিম্নের ওষ্ঠ পেট ও নাভী পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িবে। শুধু কি তাই, ইহাতে দোজখীর নাড়ী ভূড়ী বিগলিত হইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইতে থাকিবে। ওদিকে আওয়াজ আসিবে, 'নিস্তার নাই, নাই নিস্তার।'

কবির জবানীতে শোনা যাক—

দোজখের এক কুপ তাহাকে মায়ে হামীম' কয়,
সেই ভায়ানক কুপের পানি গরম অতিশয়।
দোজখবাসী কাতর হয়ে দারুণ পিপাসায়,
পানি পানি বলে যখন করিবে হায় হায়।
সেই যে কুপের পানি তখন তাদের এনে দিবে,
দোজখীরা পরম খুশীর সঙ্গে তাহা নিবে।
অথচ সে কুয়ার পানির এমনি গরম-চোট,
উলটে যাবে কান বরাবর তাতে উপর ঠোঁট।
নিম্ন অধর পড়বে ঝুলে নাভির বরাবব,
নাড়ি ভুড়ি গলে গলে পড়বে অতঃপর।

আল্লাহ পাক বলেন—

ঃ কাজেই অদ্য তাহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকিবে না, এবং ক্ষতস্থান হইতে গলিত পুঁজ, রক্ত ব্যতীত অন্যকোন খাদ্যও হইবে না যাহা একমাত্র পাপীষ্ঠগণ ভক্ষণ করিবে।'

জাক্কুম বিস্বাদ ফল ঃ দোজখীদের আরেক শ্রেণীর খাদ্য হইল আরব দেশীয় জাক্কুম নামীয় কন্টকপূর্ণ বিস্বাদ ফল।

এ সম্পর্কে কোরআন মজিদে আছে, আল্লাহ পাক বলেন—

'ইন্না শাজারাতাজ্জাক্কুম............

ঃ নিশ্চয় গোনাহগারদের খাদ্য হইবে গলিত তাম্রের ন্যায় জাক্কুম বৃক্ষ, যাহা পেটের ভিতর উত্তপ্ত পানির মত টগবগ করিতে থাকিবে।

জাক্কুমের পরিচয় দিয়া আল্লাহ আরও বলেন—

'অতঃপর হে অবিশ্বাসী বিপথগামীগণ! নিশ্চয় তোমরা জাক্কুম বৃক্ষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে, যা দ্বারা তোমার আপন পেট ভর্তি করিয়া লইবে। শুধু কি তাই, উত্তপ্ত গরম পানিও পান করিতে থাকিবে, যেমন পিপাসিত ও তৃষ্ণার্ত উট পান করে। কেয়ামতের দিবস ইহাই হইবে তাহাদের মেহমানদারীর সামগ্রী।

জাক্কুম বৃক্ষ কেমন এবং চরিত্রই বা কি এবং উহার উৎপত্তি কোথা হইতে, দেখায় কেমন—ইহার বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

ঃ নিশ্চয় উক্ত জাককুম এমন একটি বৃক্ষ যাহার উৎপত্তি দোজখের তলদেশ হইতে আর ইহার উপরিভাগ ঠিক যেন সর্পের ফনা।'

জাক্কুমের আরব দেশে এক বিখ্যাত তিক্ত-বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়। এখানে উক্ত বৃক্ষের নাম শুধু বোঝান হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জাহান্নামের সহিত উহার কোন তুলনাই হয় না। কারণ জাহান্নামের জাক্কুম দুনিয়ার জাক্কুম হইতে শত সহস্র গুণ বেশী তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত, উহা দেখিতেও কত বিশ্রি, দোজখবাসীগণ সেই বিষাক্ত বৃক্ষই ভক্ষণ করিবে। তদুপরি অত্যন্ত উষ্ণ পানিও পান করিবে। তাহাও আবার দুই এক ফোটা বা বিন্দুমাত্র নহে বরং পিপাসিত উষ্ট্রের ন্যায় ঘোঁত ঘোঁত করিয়া পান করিতে থাকিবে।

জাক্কুম ফলের বিশদ ব্যাখ্যা রাসূলে করীমের বিভিন্ন হাদীছ হইতে জানা যায়। একটি হাদীছে দেখা যায়—হুজুর আকরাম (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ জাককুমের একটি মাত্র ফোটা যদি দুনিয়াতে পতিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় উহা তামাম দুনিয়াবাসীর সমুদয় খাদ্যকে বিষাক্ত করিয়া দিবে। এখন চিন্তার বিষয় এই যে, ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে যাহার খাদ্য হইবে একমাত্র জাক্কুম।

গাচ্ছাক বিস্বাদ খাদ্য ঃ গাচ্ছাক অর্থাৎ দোজখীদের পঁচা দুর্গন্ধ পুঁজ এবং তাহাদের শরীরের জখম হইতে নির্গত রক্ত ও প্রবাহিত পঁচা পানি তাহাদের পানীয় দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, উহাই তাহাদের পান করিতে দিবে। আরো পান করিতে দিবে বিষাক্ত ঠাণ্ডা পানি।

আল্লাহ পাক বলেন— লা ইয়াজুকুনা ফীহা বারদাউ অলা শরাবা......

ঃ তাহারা উক্ত দোজখসমূহের ভীষণ গরম পানি এবং গাচ্ছাক ব্যতীত কোন প্রকার ঠান্ড জিনিস অথবা পানীয় দ্রব্য পান করিতে পারিবে না।

গাচ্ছাক পানীয় এতই গরম যে, উহা দুনিয়ার গরম পানির সাথে কোনই তুলনা হয়না। এ সম্পর্কে নবীয়ে করীম (ছাঃ) বলেন—যদি এক বালতি পরিমাণ গাচ্ছাক দুনিয়ার বুকে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমুদয় দুনিয়াবাসী গলিয়া যাইবে।'

ছুরায়ে মোজামেলে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন ঃ

ঃ নিশ্চয় ঐ সমস্ত কাফেরদের জন্য আমার নিকট শিকলসমূহ এবং অগ্নির স্তুপ ও গলায় বিদ্ধ হইয়া যাইবার মত খাদ্য রহিয়াছে এবং আরো রহিয়াছে কঠিন আজাবের ব্যবস্থা।

ক্ষুৎ-পিপাসার দ্বারা আজাব ঃ দোজখ দোজখীর আজাবের জন্যই নির্দিষ্ট। দোজখের বিভিন্ন আজাবের উপকরণের মধ্যে দোজখীদের তীব্র ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালা-যন্ত্রণা একটি বিরাট আজাব। তাহাদের এতই তীব্র ক্ষুৎ-পিপাসা লাগিবে যে, তাহার দরুন যা কিছু তাহারা খাবার জন্য সম্মুখে পাইবে, অখাদ্য হউক, কি কুখাদ্য সেদিকে তাহাদের অনুভূতি থাকিবে না, তাহাই খাইবে।

এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন ঃ

'দোজখবাসীদের এত অধিক ক্ষুধা পাইবে যে, অন্যান্য আজাবের সমতুল্য তাহাও এক বিরাট আজাব হইয়া দাঁড়াইবে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহারা যখন আল্লাহর দরবারে খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করিবে, তখন তাগাদিগকে অগ্নির কাঁটা দেওয়া হইবে, যাহা ভক্ষণ করিলে প্রাণ-শক্তি পাইবে না, মোটা-তাজাও হইবে না এবং ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হইবে না। অতঃপর তাহারা ক্ষুধার যাতনায় অসহ্য হইয়া ছটফট করিতে ও

খাদ্যের জন্য কাকুতি মিনতি করিতে থাকিবে। পুনরায় তাহাদিগকে অনুরূপই কন্টকময় খাদ্য দেওয়া হইবে, যাহা গলার ভিতর আটিয়া যাইবে, উহাকে বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হইবে না বরং সেসব গলার ভিতর আরও শক্ত ভাবে আটকাইয়া যাইবে।

খাদ্য গলায় আটকাইয়া পড়িলে পানি পান করিলে যে উহা পেটে চলিয়া যাইত, দুনিয়ার এ রীতির কথা স্মরণ হইলে দোজখীরা তাহাদের গলায় বিদ্ধ খাদ্য পেটের ভিতরে প্রবেশ করানোর জন্য পুনঃ পানি, পানি বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। সুতরাং তাহাদিগকে লোহার পাত্রে উত্তপ্ত পানি দেওয়া হইবে। এই উত্তপ্ত লোহার পাত্রের পানি যখনই দোজখীদের সম্মুখে হাজির করা হইবে, তখনই তাহাদের মুখমন্ডলের সমস্ত মাংস খসিয়া পড়িবে। অপর দিকে পানি পেটের ভিতর প্রবেশ করা মাত্র পেটের যাবতীয় নাড়ী-ভুড়ী ও কলিজা গুর্দা টুকরা টুকরা হইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বিগলিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

অখাদ্য ও কুখাদ্য দোজখীদের প্রধান খাদ্য। কিছু খাইতে চহিলে তাহাদের উক্ত খাদ্য খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে হাজির করা হইবে। দেখিয়া শুনিয়া তাহারা তা খাইতে না চাহিলেও বলপূর্বক তা তাহাদের খাওয়ানো হইবে। এ হইতে ফিরিয়া থাকিবার দোজখীদের কোন উপায় থাকিবে না। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তাহাদের উহা ভক্ষণ করিতে হইবে। ফলে তাহাদের ক্ষুৎ-পিপাসা দুর হওয়াতো দুরের কথা, শুরু হইয়া যাইবে তাহাদের ভীষণ যন্ত্রণা ও অকথ্য আজাব।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

ঃ সেই দোজখবাসীকে পুঁজ বিগলিত পানি পান করান হইবে যাহা সে ঘোঁত ঘোঁত করিয়া পান করিতে থাকিবে এবং ভীষণ কষ্টেই তাহা পেটের ভিতর প্রবেশ করিবে। আর চতুর্দিক হইতে মৃত্যুর বিভীষিকা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে অথচ তাহার কোন মৃত্যু হইবে না।'

হজরত আবু ওমামার সূত্রে জানা যায়, রাসূলে করীম (ছঃ) বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলিয়াছেন ঃ পুঁজ বিগলিত বিষাক্ত পানি যখন জাহান্নামীদের সন্নিকটে রাখা হইবে, তখন তাহারা উহাকে ঘৃণিত বস্তু

হিসাবে উপেক্ষা করিবে। অতঃপর যখন উহাকে আরও নিকটবর্তী করা হইবে, তখন তাহাদের মুখমন্ডল জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে এবং মাথার চামড়া খুলিয়া খসিয়া পড়িবে। অতঃপর যখন তাহা পান করিবে, তখন পেটের যাবতীয় বস্তু টুকরা টুকরা হইয়া পায়খানার রাস্তা দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

আল্লাহ পাক বলেন—

ঃ 'তাহাদেরকে এইরূপ উত্তপ্ত পানি পান করান হইবে যাহা তাহাদের নাড়ীসমূহকে খন্ড বিখন্ড করিয়া দিবে।'

আল্লাহ আরো বলেন—

ঃ দোজখীরা পানির জন্য আর্তনাদ করিতে থাকিলে তাহাদের তৈলের গাদের ন্যায় গাঢ় অথচ দুর্গন্ধ যুক্ত পানি দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহাদের মুখমন্ডল জ্বলিয়া যাইবে। আহাঃ কতইনা নিকৃষ্ট পানীয়।'

--০--

আজাবের বিভিন্ন দিক

দোজখ কাফেরদের দুঃখ ও আজাবের স্থান, এ আজাব তাহাদের চলিবে অনন্তকাল—এতটুকু বিরাম হইবে না এ হইতে কোন দোজখীর। খাদ্য খাদকের বেলায় যেমনি আজাব হইবে, তেমনি আজাব হইতে থাকিবে বিভিন্ন আজাবের বস্তু দ্বারা।

যখন তাহারা তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া ছটফট করিবে ও পানির জন্য আর্তনাদ করিতে থাকিবে তখন তাহাদেরকে এ রকম পানি দেওয়া হইবে যাহা তৈলের গাদের মত বিশ্রী হইবে ও মুখমন্ডলকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। উহ! উহা কত নিকৃষ্ট পানীয়।

এখানে কি কি রূপে এবং কিসের দ্বারা কি ভাবে আজাব করিবে তাহার মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

আগুনের পাহাড় ঃ দোজখীদের আজাবের উপকরণের মধ্যে আগুনের পাহাড় একটি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'অতি সত্বর আমি তাহাকে সাউদ নামক পাহাড়ে উঠাইব।

এই আয়াতের সাউদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া নবী করীম (সাঃ) বলেন— অগ্নির একটি পাহাড়ের নাম 'সাউদ'। দোজখীদিগকে উহার উপর অনবরত ৭০ বৎসর যাবত উঠান হইবে। অতঃপর সেখান হইতে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইবে এবং পুনরায় ৭০ বৎসর যাবত নীচের দিকে পড়িতেই থাকিবে। এই ভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত শাস্তি পাইতে থাকিবে।

দোজখের শিকল ঃ দুনিয়ার কয়েদীদের যে প্রকার শিকল বা জিঞ্জির দ্বারা জেলখানায় আটক করে, তেমনি দোজখীদের আগুনের শিকল কড়া দিয়া বাঁধিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। উক্ত শিকল বহু শত গজ লম্বা। কোরআনের ভাষায় উহাকে সত্তর গজ লম্বা বলা হইয়াছে—

ঃ ফেরেস্তাদের প্রতি আদেশ হইবে, তাহাকে গ্রেফতার কর এবং পরাইয়া দাও তাহাকে কয়েদির শৃঙ্খল। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর উহাকে এইরূপ এক জিঞ্জিরে আবদ্ধ কর যাহা ৭০ গজ লম্বা হইবে।

তিরমিজি শরীফের একটি হাদীছে আছে, হজরত রাসুলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন—

যদি রাং-এর একটি টুকরা প্রথম আসমান হইতে দুনিয়ার প্রতি ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত টুকরা সন্ধ্যা হইবার পূর্বে জমীনের বুকে পতিত হইবে। অথচ ইহা পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। আর সেই রাং-এর টুকরা যদি দোজখের জিঞ্জিরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তা হইলে পূর্ণ জিঞ্জিরের দূরত্ব অতিক্রম করিতে উহার দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইবে।

পঙ্গপাল উত্তপ্ত অগ্নিতে কাবাব করার উদ্দেশ্যে লোহার দন্ডে ভরিয়া যেভাবে কাবাব করা হয়, অনুরূপভাবে দোজখীদের গুহ্যদ্বার দিয়া জিঞ্জির ভরিয়া দিয়া আজাব দেওয়া হইবে।

এ কথার ব্যাখ্যা পাই আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী কোরআন মজিদের আয়াতে।

আল্লাহ পাক বলেন—

ঃ নিশ্চয় আমি কাফেরদের জন্য শৃঙ্খলসমূহ ও জ্বলন্ত অগ্নি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি।

দোজখীদের গুহ্যদ্বারে এ প্রকার জ্বলন্ত শিকল যে বিদ্ধ করা হইবে, তাহাও কোরআন মজিদে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

আল্লাহ পাক সূরায়ে মু'মেনুনে ইরশাদ করেন—

ঃ ক্ষণকাল পরেই তাহারা জানিতে পারিবে, যখন তাহাদের ঘাড়ে বেড়ী লাগাইয়া শৃঙ্খল দ্বারা ফেরেস্তাগণ সজোরে টানিতে টানিতে অগ্নি সমতুল্য তপ্ত পানির মধ্যে নিয়া যাইবে এবং পুনরায় সেই প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করিবে।

বিভিন্ন হাদীছের তথ্যে জানা যায়—দোজখবাসীগণ কোন একদিকে ঘোর কালো বর্ণ মেঘের আনা গোনা দেখিতে পাইবে, ফেরেস্তাগণ জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের কি অভিপ্রায় আছে তাহা প্রকাশ কর। তখন তাহারা দুনিয়ার উপর কেয়াছ করিয়া বলিতে থাকিবে, আমাদের ইচ্ছা হইল এই মেঘমালা আমাদের উপর বর্ষিত হউক। সঙ্গে সঙ্গেই সে মেঘরাশি গর্জন সহকারে তাহাদের উপর বর্ষণ আরম্ভ করিবে। আর তথা হইতে বেড়ী, শৃঙ্খল এবং অগ্নি স্ফুলিঙ্গসমূহ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। যা দ্বারা তাহারা জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইবে এবং তাহাদের দুঃখ ও মুছিবত আরও অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

এ বিষয় আরও জানা যায়, ভীষণ গরম পানিতে যখন দোজখবাসীদের গর্দান ধরিয়া ডুবাইয়া উঠান হইবে, তখন তাহাদের শরীরের সমস্ত মাংস খসিয়া পড়িবে এবং সারা অঙ্গের কঙ্কাল ও দুইটি চক্ষু ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। অবশ্য পরে আবার মাংস ফিরিয়া পাইবে।

যেমন কোরআন মজিদে আছে, আল্লাহ বলেন—

ঃ দোজখীদের চামড়া জ্বলিয়া খশিয়া পড়া মাত্র নূতন চামড়ার আবর্তন হইবে। কারণ এতেই নূতন নূতন আজাবের স্বাদ অনুভব হইবে।

এ সম্পর্কে হাদীছের তথ্যে জানা যায়, জাহান্নামীদের দৈনিক সত্তর বার পোড়ান হইবে এবং প্রত্যেকবার নূতন চামড়া পরানো হইবে। অন্য সূত্রে জানা যায়, সত্তর হাজার বার এ প্রকার করা হইবে। মোটকথা, বহুবারই তাদের চামড়া পোরানো হইবে এবং নূতন চামড়ার সৃষ্টি হইবে।

শুধু কি তাই, অগ্নি ফুটানো ভীষণ গরম পানি দ্বারাও দোজখীদের শাস্তি দেওয়া হইবে।

আল্লাহ পাক বলেন—

ঃ তাহাদের মাথার উপর ভীষণ উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে, যাহার দরুণ উহাদের পেটের ভিতরের যাবতীয় পদার্থ এবং শরীরের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে।

বিরাট বিরাট গুর্জ দ্বারাও দোজখীদের চরম শাস্তি দেওয়া হইবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

ঃ আর জাহান্নামীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য লোহার গুর্জসমূহ রহিয়াছে। যখন তাহারা সেই কঠিন আজাব হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে ধাক্কা দিয়া পুনরায় আজাবে লিপ্ত করাইয়া দিবে এবং উপহাস করিয়া বলিতে থাকিবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক।

গুর্জ কত ভারী ও ভয়ানক তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া নবী করীম (ছাঃ) ব্যাখ্যা করেন ঃ জাহান্নামের একটি লৌহ গুর্জ যদি জমীনের বুকে রাখা হয়, তাহা হইলে দুনিয়ার সমুদয় জ্বিন ও ইনছান মিলিয়াও উহাকে উঠাইতে পারিবে না। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, জাহান্নামের একটি গুর্জ পাহাড়ের উপর মারিলে উহা ভস্মে পরিণত হইয়া যাইবে।

দোজখীদের কত ধরণের শাস্তি দেওয়া হইবে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। সে সকল শাস্তির কথা মনে উঠিলে দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-শান্তির কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, কয়জনে সেদিকে খেয়াল করে। মানুষ যদি এদিকে সামান্য খেয়াল করিত, তবে এত পাপ পাঙ্কিল রাস্তায় গমন করিতে সাহস পাইত না। যা কিছু পাইত তাও আবার মানুষের গোপন দুশমন অভিশপ্ত শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি বা নফছে শয়তানের প্রলোভনে তা মানুষ ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এজন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে নিজের কৃত পাপের জন্য তওবা করা উচিত।

আজাব এতই করুণ হইবে যে, আজাবের জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহারা গাধার মত আর্তচীৎকার করিতে থাকিবে।

কোরআন মজিদে আছে, আল্লাহ বলেন—

ঃ পাপীরা জাহান্নামে গাধার মত চীৎকার করিতে থাকিবে।

—০—

শয়তানের উপদেশ

দোজখীগণ দোজখে নিক্ষিপ্ত হইয়া নানা উপকরণীয় আজাবের বস্তুদ্বারা নিদারুণভাবে নির্যাতিত হইতে থাকিবে। এদিকে কাফেরদের (দোজখীদের) প্রধান গুরু শয়তান অগ্নি মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে তাহার নিকট আহ্বান করিবে—'হে দোজখীগণ! তোমরা সকলেই আমার নিকট সমবেত হও, শেষবারের মত আমি তোমাদের দু'টি কথা বলিয়া যাই।' দোজখীগণ শয়তানের এইরূপ আহ্বান শ্রবণ করিয়া ভাবিবে, হয়ত শয়তান আমাদের ত্রাণকল্পে কোন ফন্দি আঁটিয়াছে; না জানি শয়তান আমাদিগকে এই ভীষণ আজাব ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তিদান করিতে পারে। এই ভাবিয়া দোজখবাসীগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। অমনি শয়তান গলায় খেকর দিয়া উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিবে—

'বন্ধুগণ! জানিয়া রাখ, আল্লাহ পাকই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও মুক্তিদাতা। যুগে যুগে নবী রাসূলগণের দ্বারা তিনি তোমাদিগকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহাই সত্য। আর আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা, চক্রান্ত বৈ অন্য কিছু ছিল না। সত্য বলিতে কি! প্রকৃতপক্ষে আমিই ছিলাম তোমাদের একান্ত শত্রু।'

আল্লাহ পাক তোমাদিগকে তাঁহার নির্দেশ অমান্য হেতু যে সব ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তোমরা অদ্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে যে সকল কার্যে অনুপ্রাণিত করিয়া কতগুলি মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিয়াছিলাম, তাহা অদ্য পূরণ করার শক্তি আমার নাই। আমি নিজেই আজ তোমাদের পথের পথিক।'

'হে দোজখবাসীগণ! তোমরা অদ্য বিপদে নিপতিত হইয়া আমাকে কোনরূপ দোষারূপ করিতে পার না। কেননা, আমি শুধু তোমাদিগকে অন্যায় পথ প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু তোমরা স্বীয় ইচ্ছায়ই সেই পথে গমন করিয়াছ, ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তোমাদেরকে সেই পথে ধাবিত করি নাই। তাই তোমরা নিজেদের বিপদ নিজেরাই টানিয়া আনিয়াছ, আমাকে দোষারোপ করিয়া কি লাভ? কাজেই স্বীয় আত্মার উপরই অনুতপ্ত হও।'

'মনে রাখিবে, অদ্যকার এই শোচনীয় বিপদ হইতে তোমাদিগকে সাহায্য করার মত শক্তি আমার নাই, আর তোমরাও আমাকে আমার এই বিপদ হইতে কোনরূপ সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে না। নিজ নিজ কর্ম-ফল আজ অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। অদ্য আর এখানে কোন প্রকার চক্রান্ত খাটিবে না।'

দোজখীগণ কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের এই নৈরাশ্যজনক উপদেশ শ্রবণ করিয়া একেবারে হতভম্ভ হইয়া পড়িবে। তাহাদের সকল আশা ভরসা দিনের অবসানের পর রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় হইয়া যাইবে।

অতঃপর দোজখীদের চিরদিনের জন্য দোজখের দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিতে হইবে। দোজখ হইতে বাহিরে আসিবার সামান্য কুমতলবটুকুও মন হইতে ধুইয়া যাইবে।

আল্লাহ পাক বলেন—

ঃ আল্লাহর সাথে অংশীবাদিতার বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ বেহেশত হারাম করিয়া দিয়াছেন—তাহারা নিক্ষিপ্ত হইবে ভীষণ অনলকুণ্ডে। জালেমদের নাই কোন সাহায্যকারী।

কবির ভাষায়—

অদ্বিতীয় খোদার সাথে শরীক যারা করে,
সুখের বেহেশত তাদের লাগি হারাম চিরতরে।
চির দুঃখে দুঃখের জাহান্নামে হবে তাদের ঠাঁই,
অত্যাচারির জন্য কোন মদদকারী নাই।

--০--

গোমরাকারীদের প্রতি দোজখীদের অনিহা

এদিকে শয়তান মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত কাজ করা হইতে দূরে সরাইয়া দোজখের মহাবিপদে ফেলিয়া উক্ত প্রকার উক্তি করায় তারা বিক্ষুব্ধ হইল। অপর দিকে মানুষরূপী পথ ভ্রষ্টকারীদের প্রতিও দোজখীদের ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। কারণ তাহারা তাহাদের অজ্ঞতা

ও মূর্খতার সুযোগ লইয়া বিপথগামী করিয়াছে। উহাদের এই ক্ষোভ ও দুঃখমূলক উক্তি কোরআন পাকে এ প্রকার উক্ত হইয়াছে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

ঃ নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণকারী ছিলাম। অদ্য কি তোমরা আমাদের থেকে আল্লাহ তাআ'লার কঠিন আজাবের বিন্দুমাত্রও লাঘব করিতে সক্ষম নহ?'

দোজখীদের এ প্রকার দুঃখ ক্ষোভের উক্তি শুনিয়া তাহাদের দোজখেই প্রবিষ্ট দোসর পথ প্রদর্শকরা উত্তর করিবে—

ঃ তোমাদিগকে আমরা কি রক্ষা করিব। আজ আমাদেরও নিস্তার নাই, যদি আল্লাহ তাআ'লা আমাদিগকে হেদায়েত করিতেন আমরাও তোমাদিগকে সরল পথে চালিত করিতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি বা অধৈর্য হইয়া ছটফট করিতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান। কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই।

নৈরাশ্যজনক এ উক্তি শুনিয়া জাহান্নামীরা অত্যধিক রাগান্বিত হইবে এবং তখনই গোমরাহকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে আরজ করিবে—

ঃ হে আমাদের প্রভু! জিন ও ইনসানের মধ্যে যাহারা আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও যেন আমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে পারি। তবেইত তাহারা যথেষ্ট বেইজ্জত ও পর্যুদস্ত হইবে।

--০--

মালেক ফিরেশতার প্রতি নিবেদন

দোজখীরা বিভিন্ন আজাব ও যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া প্রথমতঃ দোজখ রক্ষী দারোগা ফেরেশতাদের নিকট তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা, আজাব ও যন্ত্রণার কথা সবিনয় অবগত করিবে এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহর দয়া প্রদর্শনের নিমিত্ত সোপারেশ ধরিবে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইবে না। কোরআনের ভাষায় তাহাই উল্লেখ রহিয়াছে, আল্লাহ বলেন—

ঃ 'হে দোজখের খাজেনগণ! আপনাদের প্রভুর নিকট আবেদন করুন, তিনি একদিনের জন্য হইলেও যেন আমাদের শাস্তিকে হালকা করিয়া দেন।

এ শ্রেণীর ফেরেশতা কেন, দোজখীদের কোন সোপারেশই আল্লাহর কাছে কেউ করিতে পারিবে না। তা গ্রহণযোগ্যও নহে।

এ কারণেই ফেরেশতাগণ উত্তর করিবে—

ঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ তাআ'লার প্রেরিত পয়গাম্বরগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়া আসেন নাই? তাঁহারা কি তোমাদিগকে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি পাইবার পথ দেখাইয়া দেন নাই?

জাহান্নামীরা উত্তর করিবে, 'হাঁ, নিশ্চয়ই আনিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি নাই।'

দোজখের খাজেন বা রক্ষী ফেশেতাগণ তখন তাহাদের স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিবেন—

ঃ কাজেই আমরা তোমাদের জন্য কোন আবেদনই করিতে পারিব না বরং তোমরা স্বয়ং খোদার দরবারে প্রার্থনা কর। কিন্তু জানিয়া রাখিবে, নাফরমানদের আবেদন ও নিবেদন কোন কাজেই আসিবে না।'

দোজখীরা দোজখ-রক্ষী ফেরেশতাদের নিকট কোন প্রকার সাহায্যের আশা না পাইয়া অবশেষে দোজখের কর্তা 'মালেক' ফেরেশতার নিকট আবেদন জানাইবে এবং আরজি পেশ করিয়া বলিবে—

ঃ হে মালেক ফেরেশতা! আপনি প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি মৃত্যু দিয়া যেন আমাদের শাস্তির অবসান করিয়া দেন।

মালেক ফেরেশতার নিকট দোজখীরা এ আবেদনের জবাব সত্বর পাইবে না। এক হাজার বছর পরে যা-ও-বা পাইবে, তাও অত্যন্ত করুণ—দুঃখজনক।

এতে মালেক ফেরেশতা বলিবেন—

ঃ তোমরা অনন্ত কালের জন্য এ অবস্থায়ই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এখান হইতে বাহির হইবে না, মৃত্যুতেও পাইবে না।

--০--

দোজখীদের খোদার দরগাহে শেষ নিবেদন

দোজখীরা কাহারও কাছে কোন সাহায্য বা অনুরোধ করিয়া কোন ফল না পাইয়া অবশেষে তাহারা মহান দয়াময় আল্লাহ পাকের দরগাহে শেষ নিবেদন করার জন্য প্রস্তুত হইবে। এ উদ্দেশ্যে তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া সরাসরি আল্লাহর দরগাহে ফরিয়াদ করিবে। তাহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাদের এই ভীষণ বিপদকালে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই নাই, ফরিযাদ শ্রবণ করিবার কেহই নাই। তাই তাহারা ফরিয়াদ করিবে—

ঃ 'হে আমাদের পরয়ারদেহার! যথাযথই আমাদের দুর্ভাগ্য ও বদনছীব আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম! হে প্রভু! আপনি মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে এই দোজখের ভীষণ অগ্নি হইতে বাহির করুন। অতঃপর যদি কখনও আমরা ঐ রূপ গর্হিত কাজ করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জালেম ও অত্যাচারী সব্যস্ত হইবে।'

আল্লাহতাআ'লার তরফ হইতে উত্তর আসিবে—

'দোজখে এ প্রকারই তোমাদের আজাব চলিতে থাকিবে, কথার অবতরণা করিবেন না।

অনন্তকাল তোমাদের সাজা হবে এই মত,
করিবনা কোন দয়া করিস না কোন বাত।

আল্লাহতাআ'লার এই বাণী শুনিবামাত্র জাহান্নামীরা তাহাদের প্রতি যে কোন প্রকারের ক্ষমা বা দয়ার ব্যবহার হইতে চির দিনের জন্য নিরাশ হইয়া যাইবে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত আফছুছ ও হাহাকার করিতে থাকিবে, আর শুধু চীৎকার দিতে থাকিবে গাধার মত।

করবে কত কাঁদাকাটি জাহান্নামীগণ,
কত রকম করবে বিনয় আকুল নিবেদন।
কিন্তু কিছু কাজ না হবে সব হবে নিষ্ফল,
অনন্ত কাল আজাব ভোগবে পাপীর দল।

--০--

দুই ঃ বেহেশতের পরিচয়

জান্নাতকে ফারসী ভাষায় বলে বেহেশত। বাংলা ভাষায় বেহেশত মানে উদ্যান বা বাগান। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে মনোরম ও সুদর্শন একখানা বাগান তৈরি করিতে কতই না জিনিসের সমাবেশ করি। নিজের জ্ঞানে না কুলাইলে সাহায্য নেই অন্যের, প্রত্যক্ষ করি অন্যের তৈরি বাগানের নিপুণতা ও কারুকার্য।

আল্লাহ অসীম জ্ঞানী ও কর্ম-নিপুণ। তাঁর কর্ম নিপুণতা ও জ্ঞানের কাছে আমাদের জ্ঞান নেহাত তুচ্ছ, নাই বলিলেই হয়। এমন কর্ম কৌশল ও জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ যে বাগান বাড়ি বা বেহেশত তাঁহার বন্ধুদের মনোরঞ্জন ও অভ্যর্থনার নিমিত্ত তৈরি করিয়াছেন, তা কতইনা সুন্দর ও মনোহর হইতে পারে তা যে কোন শ্রেণীর বিবেকবানেরও অনুভব করা অসম্ভব। জ্ঞানের অনেক উর্ধে তার অনুধাবন করা।

এই অপূর্ব সৌন্দর্য বাগান বাড়ি বা বেহেশত মহান আল্লাহ পাক তাদের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁহার প্রিয় রাসূল হজরত মুহাম্মদের (ছাঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোরআন ও হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক জীবন গড়িয়া তোলে এবং নিজের নফস ও কুচক্রি শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সেই সমস্ত ধার্মিক লোকদের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতাআ'লা পারলৌকিক জীবনে চির সুখময় ও পরম আনন্দদায়ক এক বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

এই বেহেশতের রং-রূপ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা করা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। তথায় অনন্ত মহাকালের চির বসন্ত বিরাজিত। চতুর্দিকে প্রশান্তি আর শান্তির ঢেউ খেলিতেছে। দুঃখ-সৈন্য ও অভাব-অনটন বা শাস্তির লেশ মাত্রও তথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী পর্যাপ্ত ও প্রচুর পরিমাণে তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। অতি মাত্রায় ভোগ করার পরেও যাহার কোন ইতি নাই, অন্তও নাই। কোথায় হাজার হাজার পাখীর মন মাতানো গানে স্বর্গের আকাশ বাতাস মুখরিত। কোথাও শত সহস্র প্রকার প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধি ও

সৌরভে দিক দিগন্ত উদ্ভাসিত। আবার কোথাও প্রস্ফুটিত গোলাপের সুরভি সৌরভে আকুল হইয়া দলে দলে ভ্রমণগুলি গুনগুন রবে প্রেম ভিক্ষার আহলাদিত। কোথাও সুশীতল ও স্নিগ্ধ সুমধুর সমীরণ প্রবাহে জান্নাতবাসীদের মন প্রাণ আনন্দে পুলকিত। কোথাও সুমিষ্ট পানি ও শুভ্র দুগ্ধের ঝরণা।

কোথাও দাড়িম্ব সদৃশ উচ্চ বক্ষ ও কালকৃষ্ণ ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট জোলায়খার মত প্রেম উন্মাদিনী হুরবালাগণের আপন আপন স্বামীর প্রতি বাঁকা চাহনী। আর সেই চিরকুমারী মৃগ নয়না হুরগণের যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া বেহেশতীদের অপরূপ দৃশ্য অথবা পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট যুবক যুবতী স্বর্গোদ্যানের অপূর্ব শোভা সন্দর্শনে নিমগ্ন।

আবার কোন দিকে বিচিত্র পুষ্প-পতাকার ও মনমুগ্ধকর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া হুরবালাগণের ইতস্ততঃ বিচরণ; আবার কোন স্থানে দেখা যাইবে, গোল টেবিল বৈঠক আর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে শরাবের মজলিস আর তাহাদের চতুষ্পার্শে হাজার হাজার খাদেম ও গেলমান পেয়ালা এবং রেকাবী হস্তে দণ্ডায়মান। আবার কেহ কেহ বালাখানার জানালা দিয়া টি.ভি. সাক্ষাৎকারের মত কোটি কোটি মাইল দুরবর্তী জাহান্নামীদের জ্বালা-যন্ত্রণাময় জীবনের দৃশ্য অবলোকন করিতেছে। আবার কেহ কেহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও ইয়াকুত নির্মিত পালঙ্কের উপর গির্দা তাকিয়া হেলান দিয়া শাহী হালতে আমোদ-আহলাদে মত্ত। অথবা অফুরন্ত খাদ্য সামগ্রী ও ফলমূল ভক্ষণে রীতিমত ব্যস্ত। আবার কোথাও চির আকাঙ্খিত আল্লাহর দর্শন লাভে বেহেশতীগণ বেহেশতের যাবতীয় হুর গেলমানের কথা ভুলিয়া এক মহা তৃপ্তিতে অভিভূত।

মোটকথা, বেহেশতের সেই অপরূপ সৌন্দর্য ও সুগন্ধির বাহার সুদীর্ঘ এক হাজার বৎসর দূরত্ব হইতেও অনুভূত হইবে এবং উক্ত স্থানে গমণের জন্য আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণ প্রফুল্ল চিত্তে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। সেই অতুলনীয় সুখ সম্ভারে ভর্তি চিরসুখময় স্বর্গীয় বার্তা শুনিবার জন্য রাজা, প্রজা, ধনী-নির্ধন, দীন-দুঃখী এমন কি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানব গোষ্ঠিও যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রবল উৎসুক হইয়া থাকে বেং উহার বর্ণনা শ্রবণ করিয়া কমজোর দুর্বল দেহে এক নববল পাইয়া ধর্মের

প্রবল স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় এবং স্বর্গীয় আনন্দে আনন্দিত হইয়া ধর্ম-কর্মে জীবনটাকে উৎসর্গ করে।

সেই মহাশান্তির ঘর পবিত্র বেহেশতের কিছুটা বর্ণনা হাদীছে কুদসীতে দেখা যায় ঃ

আল্লাহ্ পাক বলেন—

ঃ বেহেশতের মধ্যে আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এইরূপ নেয়ামতসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কেহ কোন দিন চক্ষে দর্শন করে নাই বা কর্ণে শ্রবণ করে নাই অথবা কাহারও কল্পনায় তাহা আসে নাই।'

বেহেশতের সংখ্যা ও দরজা ঃ বেহেশত সর্বমোট আটটি এবং বেহেশতের দরজাও আটটি, যথা ঃ

প্রথম বেহেশত 'দারুল জানান'—এ বেহেশতটি শুভ্র মরওরীদ পাথরের তৈয়ারী।

দ্বিতীয় বেহেশত 'দারুছ ছালাম'—উহা লাল ইয়াকুতের তৈয়ারী।

তৃতীয় বেহেশত 'জান্নাতুল মাওয়া'—উহা সবুজ জবরজ্বদ পাথরের তৈরী।

চতুর্থ বেহেশত 'জান্নাতুল খোলদ'—উহা হলুদ রং মারজান পাথরের তৈয়ারী।

পঞ্চম বেহেশত 'জান্নাতুল নাঈম'—উহা বিশুদ্ধ রৌপ্যের তৈয়ারী।

ষষ্ঠ 'জান্নাতুল ফেরদাউস'—উহার একটি ইট রৌপ্যের, একটি ইয়াকুতের, একটি জবরজ্বদের এবং গারা মেশকের হইবে।

সপ্তম 'জান্নাতে আদন'—উহা শুভ্র মূর্তির দ্বারা তৈরী। এই বেহেশত খানা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বত্তোম। অন্যান্য বেহেশত হইতে ইহাই মনোরম। উহাতে আসমান ও জমিনের মধ্যভাগের সমতুল্য স্বর্ণের বিরাট একটি দরজা আছে। উহার একটি ইট স্বর্ণের, একটি রৌপ্যের, মাটি আম্বরের। গারা মেশকের। এই বেহেশত হইতে উৎপন্ন নহরসমূহ অন্য সব বেহেশতের তলদেশ দিয়াই প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত নহরসমূহের পানি বরফ হইতে ঠাণ্ডা, মধু হইতে মিষ্টি। উহাতে রাসূলুল্লাহর নহরে কাওছারও রহিয়াছে। আরও রহিয়াছে উহাতে নহরে কাফুর, নহরে তাসনীম, নহরে সালসাবীল, নহরে রাহীক, দুধের নহর ও মধুর নহর।

অষ্টম 'জান্নাতুল ফিজা'। এ জান্নাত বা বেহেশত উদ্যানটি বেহেশতীদের বসবাসের জন্য নহে, ইহা জান্নাতীদের মিলন-বাগান। এখানেই মু'মেনদের সাথে আল্লাহর দীদার নছীব হইবে। ইহার অপর নাম ইল্লীয়্যুন।

বেহেশতের আটটি দরজা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—নিশ্চয় বেহেশতে প্রবেশ করিবার আটটি দরজা রহিয়াছে, যাহা রং-বেরং-এর মণি-মুক্ত, হিরা জোহরাত দ্বারা খচিত স্বর্ণের তৈয়ারী।

প্রথম দরজার মধ্যে লেখা রহিয়াছে, কালেমায়ে তাইয়্যেবা। উক্ত দরজা দিয়া নবী ও রাসূলগণ এবং শহীদ ও দাতা ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিবেন।

দ্বিতীয় দরজা ঐ সমস্ত নামাজীদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম মত নামাজ আদায় ও অজু পরিপূর্ণভাবে করিয়াছেন।

তৃতীয় দরজা জাকাত আদায়কারীদের জন্য, যাহারা আপন সম্পত্তির জাকাত হিসাব করিয়া আদায় করিয়াছেন।

চতুর্থ দরজা দিয়া ঐ সকল লোক প্রবেশ করিবে যাহারা লোকদিগকে সৎকাজের আদেশ দান করিত এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিত।

পঞ্চম দরজা ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা আপন প্রভুর উদ্দেশ্যে আত্মার কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ দরজা হজ্জ-ওমরা আদায়কারীদের জন্য।

সপ্তম দরজা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন।

অষ্টম দরজা দ্বারা ঐ সকল লোক প্রবেশ করিবে, যাহারা আপন চক্ষুকে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হইতে বিরত রাখিয়াছেন এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যহার করিয়াছেন, আপন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের নেক আমল করিয়াছেন।

বেহেশ্‌তের পরিধি ঃ বেহেশত যে কত বড়, কত বিশাল তাহা মানব জ্ঞানে উপলব্ধি করা অতিশয় দুরূহ। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক যা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কিছুটা অনুমান করিতে পারি।

আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

ঃ হে আমার বান্দাগণ! আপন প্রভুর নিকট ক্ষমা চাহিবার ও বেহেশত পাইবার জন্য দৌড়াইতে থাক, যাহার প্রস্থ হইবে আসমান ও জমীনের প্রস্থের সমতুল্য।

এই আয়াত পাকের মধ্যে পবিত্র বেহেশতের শুধু প্রস্থেরই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, দৈর্ঘের কোন উল্লেখ নাই। ছাহাবাদের মধ্যে প্রখ্যাত মোফাচ্ছের হযরত ইবনে আব্বাস উক্ত আয়াতের অর্থ এইরূপপ করিয়াছেন যে, সপ্ত আসমান যদি একত্রে পাশাপাশি রাখা হয়, তাহা হইলে যতটুকু প্রস্থ হইবে, পবিত্র বেহেশতেরও ততটুকু প্রস্থ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাচ্ছের তাবারী আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন—'আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতকে সৃষ্টি করিয়া তখন আদেশ করেন যে, হে জান্নাত, তুমি দীর্ঘ হইয়া যাও।' জান্নাত জিজ্ঞাসা করিল, 'হে পরওয়ারদেগার, কতটুকু দীর্ঘ হইব।?' উত্তর আসিল, এক লক্ষ্য বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ দীর্ঘ হইয়া যাও।' পুনরায় হুকুম হইল, 'হে জান্নাত! তুমি লম্বা হইতে থাক।' জান্নাত বলিল, কি পরিমাণ লম্বা হইব? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, আমার রহমত যেরূপ অনন্ত ও অসীম তুমিও তদ্রূপ অনন্ত ও অসীম হইয়া যাও। তারপর হইতে অনন্তকাল ধরিয়া বেহেশত ক্রমাগত লম্বাই হইতে থাকিবে। অতএব আল্লাহর রহমতের মত বেহেশতের কোন সীমারেখা নাই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমগ্র সৌরজগতের দূরত্ব এক লক্ষ্য আলোক বৎসর। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। এরূপ দ্রুত গতিতে আলো দৌড়াইতে থাকিলে এক লক্ষ্য বৎসরে যতদূর পথ অতিক্রম করিবে, সমগ্র সৌরজগতের পরিধিও ততটুকু। ইমাম তাবারীর প্রথম রেওয়ায়েত অনুসারে বুঝা যায়, বেহেশতের প্রশস্থতাও এক লক্ষ (আলোক) বৎসর। বৈজ্ঞানিকগণ ও আল্লামা তাবারীর মতের বেশ কিছুটা সামঞ্জস্য দেখা যায়।

এখন, আল্লাহ্‌ পাক বেহেশতের পরিধি সম্পর্কে বলেন—বেহেশতের প্রস্থ আকাশ ভূমির সমতুল্য। অথচ নব্য বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, আকাশের অস্তিত্ব বলিতে কিছুই নাই। কিন্তু তাহাদের মনে করা উচিত যে, অনন্ত মহাশূন্য সৌরজগত বলিতে তাহারা যাহা কিছু উপলব্ধি করেন, কোরআন, হাদীস ও ইসলামী মাতানুসারে সেই মহাশূন্যের সাতটি স্তরের অপর নাম সপ্ত আকাশ। কাজেই এখন প্রমাণিত হইল যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মতে ও আমাদের বিশ্বাসে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

বেহেশতীগণের আকৃতি প্রকৃতি ঃ বেহেশবাসীগণের রূপ লাবণ্য কেমন, তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতিই বা কি? পবিত্র কোরআন ও হাদীসের তথ্যে আমরা যাহা পাই, তাহাই নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হইল। হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেন—

ঃ যদি বেহেশতের কোন লোক উঁকি মারিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিত এবং তাহার কোন অলঙ্কারের সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া পড়িত তাহা হইলে সূর্যের আলোক এইভাবে বিলীন হইয়া যাইত, যেভাবে সূর্যের আলোকে সমগ্র আকাশের গ্রহ নক্ষত্রসমূহ বিলীন হইয়া যায়।

এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি বলেন—

ঃ নিশ্চয়ই বেহেশতবাসীগণের শরীরে কোন লোম হইবে না এবং দাঁড়ি গোফবিহীন, কাজল বর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট, তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক। তাহাদের যৌবনের কোন পরিবর্তন আসিবে না এবং তাহাদের পরিধানের বস্তুসমূহে কোন প্রকার জীর্ণতা আসিবে না।

বেহেশতের সমস্ত পুরুষও সম বয়স্ক হইবে; অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইবে এবং শরীরের উচ্চতা হযরত আদম (আঃ)-এর মত তাঁহারই হাতের পরিমাণ ষাট হাত লম্বা হইবে।' হযরত ইউসুফ নবীর মত অপরূপ সুন্দরের অধিকারী হইবে। তাহাদের জ্যোতির্ময় চেহারার সম্মুখে চতুর্দশীর পূর্ণচন্দ্রও হার মানিয়া যাইবে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (ছাঃ) মত চরিত্রবান হইবে। সকলের অন্তর একই অন্তরের সমতুল্য হইবে। কাহারও অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, অহঙ্কার অপবিত্রতা কিছুই থাকিবে না। তাহাদের কণ্ঠস্বর হইবে দাউদ নবীর মত মনতামানো ও চিত্ত হরণকারী সুমধুর। মুখে কোন দাঁড়ি গোঁফ হইবে না। নাকে ও বগলে কোন ময়লা জমিবে না।

বেহেশতীদের পরিসংখ্যান

উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যাই বেহেশতে হইবে সর্বাধিক। একটি হাদীসে আছে, হুজুর (সঃ) বলেন—

ঃ জান্নাতবাসীদের সর্বমোট একশত বিশ কাতার হইবে। তন্মধ্যে একমাত্র উম্মতে মোহাম্মদীর আশি কাতার হইবে। বাকী চল্লিশ কাতার অন্যান্য নবীদের উম্মত দ্বারা গঠিত হইবে।

বেহেশতে প্রত্যেকের জায়গার পরিমাণ ঃ পবিত্র বেহেশতে বেহেশতীগণ কে কতটুকু স্থান পাইবে, তা অনুমান করা মানব জ্ঞানের বাহিরে। হাদীসের তথ্যে জানা যায়, সর্বনিম্ন মর্যাদার বেহেশতী এ দুনিয়ার দশটির সমান স্থান লাভ করিবে।

এই হাদীসের উপর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই—করিলে সে বেঈমান হইয়া যাইতে পারে। উক্ত হাদীসের সত্যতা সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত একটি অকাট্য যুক্তিও রহিয়াছে। যুক্তিটি এই যে, বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ্ করিয়াছেন, সূর্য পৃথিবী হইতে তের লক্ষ গুণ বড় অথচ বিশাল আকাশ-মণ্ডলীতে উহাকে একটা থালার মত দেখায়। এখন দেখা যায় যে, সূর্যের সমপরিমাণ বেহেশত প্রত্যেককে দশটি দুনিয়ার পরিমাণ দেওয়া হইলে এক লক্ষ তিরিশ হাজারেরও অধিক লোককে দেওয়া চলে। আর এই প্রকার কোটি কোটি সূর্যকে একত্র করিলেও বোধ হয় সপ্ত আকাশের সমতুল্য হইবে না। কাজেই যে বেহেশতের প্রস্থই হইল সপ্ত আসমান ও জমীদের সমতুল্য সে ক্ষেত্রে সৃষ্টির শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যত লোক জন্মলাভ করিয়াছে ও করিবে, তাহাদের সকলকে যদি ঐ পরিমাণ বেহেশত বন্টন করিয়া দেওয়া হয়, তবুও বেহেশতের স্থান শেষ হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

সুবিশাল রাজ্য মহা মহিম সমরাট,
যে দিকে তাকিবে দেখিবে দিগন্ত বিরাট।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বেহেশতকে বিশাল বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, উহা কতই না বিশাল হইবে তাহা তিনি ব্যতীত কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

বেহেশতে প্রবেশের আগে

হিসাব নিকাশান্তে সকল মানুষ পোলসেরাত পার হইবার নির্দেশ পাইবে। পোলসেরাতের নিম্নে দোজখ আর তাহার অপর পারে বেহেশত। বেহেশতীগণ এই পোলসেরাত পার হইয়া কি দেখিবে এবং সেখানে কি-বা আছে, সে সম্পর্কে নবী করীমের (ছাঃ) বাণী হইতে যাহা কিছু জানা যায় তাহা হইল—

ঃ পোলসেরাতের অপর পার্শ্বে বিরাট বৃক্ষ ও বিশাল বিস্তীর্ণ ময়দান রহিয়াছে। এই বিরাট বৃক্ষের তলদেশ হইতে দুইটি করিয়া নহর প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষের ডান ও বাম দিকে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। আল্লাহর আদেশে মো'মেন ব্যক্তিগণ এলাহীর আদালত হইতে আগমন করিয়া ভীষণ তৃষ্ণাতুর হইবে। বিশেষতঃ কেয়ামত ময়দানে সূর্যের অগ্নি রচিত গরমে তৃষ্ণার্ত হইয়া উক্ত নহরদ্বয়ের যে কোন একটি নহর হইতে সুস্বাদু পানি পান করিবে। পানি যখন তাহাদের বক্ষ পর্যন্ত পৌছিবে, তখনই আল্লাহ্ পাক এই পানির বদৌলতে তাঁহাদের যাবতীয় কালিমা দূর করতঃ অন্তঃকরণ পবিত্র ও উজ্জ্বল করিয়া দিবেন। উক্ত পানি যখন তাঁহাদের পাকস্থলী পর্যন্ত পৌছিবে, তখন তাঁহাদের শরীরের রক্ত, মল-মূত্র দূরীভূত হইয়া একজন বেহেশতী স্বভাবের লোকে পরিগণিত হইবে। কেননা, বেহেশী লোকের শরীরে দুনিয়ার মানুষের ন্যায় অপবিত্র রক্ত ও মল-মূত্রের অস্তিত্ব থাকিবে না আদৌ।

অতঃপর তাহারা অপর নহরটির পানি দ্বারা গোসল করিবে, ইহাতে তাহাদের চেহারা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, হালকা ও নরম এবং সমস্ত শরীর মেশকের মত সুগন্ধি যুক্ত হইয়া যাইবে।

পানি দ্বারা করলে গোলস সে পাক নহরের,
দীপ্ত কোমল চন্দ্র বদন হইবে তাহাদের।
শরীর হবে সবল সুঠাম ঝলমলিবে নূর;
করবে তাহা মৃগনাভীর সুগন্ধে ভরপুর।

ইহার পর তাহারা আর দুনিয়ার মানুষের ন্যায় স্বভাব চরিত্রে পশুর স্বভাবের থাকিবে না—দেখাইবে না দুনিয়ার মানুষের ন্যায় কুৎসীত। তৎপর তাহারা বেহেশতের নিকটবর্তী হইয়া বেহেশতের দরজা খটখটাইতে আরম্ভ করিবে, অমনি বেহেশত হইতে অপূর্ব সুন্দরী ও রূপবতী হুরগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বেহেশতে দরজার নিকট উপস্থিত হইবে। বেহেশতের হুর গেলমানগণ তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে এবং তাহারা তাহাদের নিজ নিজ স্বামীগণের গলায় গলা লাগাইয়া ও মুখে মুখ লাগাইয়া বলিতে থাকিবে—

বেহেস্তেরী তোরণ দ্বারে হুরবালারা এসে,
জানাইবে সুস্বাগত মধুর হাসি হেসে।
গলায় গলা মিলাইয়া গালের সাথে গাল,
বলবে তোমার এন্তোজারে ছিলাম এত কাল
এস এস প্রিয় সখা এস মোদের সনে,
রাখব সদা বেঁধে তোমায় মধুর আলিঙ্গনে।

'হে আমাদের প্রিয়সাথী! এতদিন আমরা আপনাদের অপেক্ষায় চাতকের ন্যায় তাকাইয়া ছিলাম! মনে রাখুন—আমরা আপনাদের চিরসাথী বন্ধু, আমরা কখনই আপনাদের ব্যবহারে অতীষ্ঠ হইব না। চলুন—আপনাদের আগমনের অপেক্ষায় বহুদিন পূর্বেই আপনাদের জন্য খাট পালংকে ফুলবিছানা সাজাইয়া রাখিয়াছি।' এই বলিয়া হুর গেলমানগণ তাহাদিগকে আপন শয়নগৃহে নিয়া যাইবে। এই শয়নগৃহ অপূর্ব সৌন্দর্য। উহার মধ্যে বহু সংখ্যক সুন্দর খাট-পালংক ফুলবিছানার দ্বারা সুসজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেকটি খাট-পালংকের উপর আবার এক একজন রূপবতী সুন্দরী যুবতী; তাহারা কোমর পর্যন্ত চুল ঝুলাইয়া নানা রকম সুন্দর সুন্দর মূল্যবান গহনা ও পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ বেহেশতবাসীগণের ভোগ বিলাসের জন্য অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে। এই সকল হুর গেলমানদের রূপের এত বাহার যে, তাহারা স্তরে স্তরে পোশাক পরা সত্ত্বেও শরীরে হাড়-মাংস ভেদ করিয়া হাড়ের মগজ পর্যন্ত দৃষ্টমান হইবে। যেমন ভাল্ব কাঁচ ভেদ করিয়া নির্দিষ্ট স্থান আলোকিত করে। ইহা ছাড়া তাহাদের একগাছি চুল এত উজ্জ্বলময় যে, যদি অমাবস্যার রাত্রেও

তাহাদের একগাছি চুল জমীনে ফেলা হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী দিনের ন্যায় আলোকিত হইয়া যাইবে। মোটকথা, তাহাদের একগাছি লোমের কিরণ সূর্যের রশ্মির হইতেও অধিক আলোকময়।

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ পাক এই সকল হুরগণের চক্ষু হরিণের চক্ষুর ন্যায় ইয়াকুত ও মারজান নামক সৌন্দর্যযুক্ত পাথরের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। হুরগণ তাহাদের এই সকল চক্ষু দ্বারা দুনিয়ায় একবার তাকাইলে দুনিয়ার সমস্ত মানব-দানব তাহাদের প্রেমে পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু তাহারা এইরূপ অকৃত্রিম প্রেমাসক্ত নহে। এমন কি, বেহেশতে থাকিয়াও তাহাদের নির্দিষ্ট স্বামীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। আর তাহাদের জন্য আল্লাহ্ পাক যে সকল স্বামী নির্ধারিত করিয়াছেন, উহারা ব্যতীত তাহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানব-দানব স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহাদের স্বামীগণ যখন ফুল শয্যায় মধুর মিলন হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, তখনই তাহারা নূতন স্পর্শহীনা নবউত্থানকারিণী যুবতীর ন্যায় হইয়া যাইবে।

হুরীরা সব রূপেরাণী, অনন্ত যৌবন,
কুসুম কোমল অঙ্গে তাদের রইবে অনুক্ষণ।
বদন যেন চন্দ্র, না না, চন্দ্রিমা কোন ছার,
বিশ্ব মাঝে নাই তুলনা সে রূপ চেহারার।
মৃগ-নয়ন দৃষ্টি তাহার মাদকতায় ভরা
গ্রীবাখানি মরাল সম পরান আকুল করা।
বিজলী সম মুখের হাসি চিকন কটিদেশ,
অপূর্ব এক শোভায় ভরা মাথার দীঘল কেশ।
বক্ষখানা রূপের খনি চকমকে দর্পণ,
বেহেস্তীরা করবে তাতে চেহারা দর্শন।
অঙ্গ জুড়ে নামছে তাদের রূপ লাবণীর ঢল,
পাহাড়িয়া ঝর্ণা সম সর্বদা চঞ্চল।
মায়ায় ভরা আবেগ আকুল মিষ্টি মুখের ভাষা,
হৃদয় ভরা পাগল করা প্রণয় ভালবাসা।

এমনি সেরূপ কোনই মিছাল নাইক সে রূপের,
নাই তাহার এক শতাংশ রূপ ধরার মানুষের।
পড়ত যদি ধরায় তাদের একগাছি কেশ খসি,
মলিন হত তাহার শোভায় ধরার রবি শশী।
একটু থুঁথু যদি তারা ফেলত ধরার পরে,
সারা জগত মৃগনাভীর গন্ধে যেত ভরে,
একটি নজর চক্ষু তুলে চাইলে ধরার পানে,
পাগল হত সকল মানুষ সেইযে রূপের টানে।
যাহার লাগি তৈরী যেজন তাহার আগে কেহ,
সৃষ্টি কুলের মধ্যে কভু ছোয়নি তাদের দেহ।
বেহেস্তীরা হইবে যেমন এদের অনুরাগী,
তারা তেমন ব্যাকুল সদা তাদের মিলন লাগি।
হোকনা যত মিলন কিম্বা কাটুক না কাল যত,
সর্বদাই থাকবে এরা নব বধুর মত।

বেহেশতের সাতটি গোলাকার দেয়াল বা প্রাচীর আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি শধু রৌপ্য দ্বারা নির্মিত এবং দ্বিতীয়টি রৌপ্য ও স্বর্ণ-মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা ও তৃতীয়টি শুধু স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে। এইরূপে চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দেয়াল জমরূদ নামক অমূল্য পদার্থ দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে। বেহেশতের নিকটতম সমস্ত প্রাচীর নূর দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে যেন বেহশতীগণ স্বীয় স্থানে থাকিয়া আনন্দিত মনে কাল যাপন করিতে পারে। এই সমস্ত প্রাচীরের প্রত্যেকটির দুরত্ব পরস্পর বহুশত ব ৎসরের রাস্তা। ইহাতে মানসপটে কিছুটা অনুভতি আসিতে পারে, আল্লাহ বেহেশতকে কত বিশাল আকারে তৈয়ার করিয়াছেন।

বেহেশতী লোকদের চক্ষের ভ্রূ, পিছি ও মাথার কেশ ভিন্ন সমস্ত শরীরে কোন প্রকার লোম থাকিবে না। কিন্তু পুরুষগণের সামান্য ধরনের গোঁফের নমুনা থাকিবে, যেরূপ অল্প বয়স্ক ছেলেদের যৌবনের প্রারম্ভে সামান্য মাত্র গোঁফের রেখা পড়িয়া থাকে। বেহেশতের হুরগণের শরীর এত পরিষ্কার হইবে যে, বেহেশতী পুরুষগণ দর্পণের পরিবর্তে তাহাদেরকে দর্পণ হিসাবে ব্যবহার করিবেন।

দুনিয়ার মানুষ যেরূপ চল্লিশ বৎসরের পরে বার্ধক্যে উপনীত হয়; বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে থাকিয়া দৈনন্দিন রূপে-গুণে সৌন্দর্যশালী যুবক হইয়া উঠিবেন; এমন কি দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যকিদের ন্যায় শত শত লোকের শক্তি এক একজন বেহেশতী লোকের হইয়া উঠিবে। তাহারা শুধু শক্তিতে যুবক হইয়া উঠিবে তাহাই নহে, বরং পানাহারে, স্ত্রী সহবাসে ইত্যাদিতেও তাহারা অতিমাত্রায় শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

সেথায় সদা কবরে বিরাজ অনন্ত যৌবন,
অসুখ বিসুখ 'বুড়াপায়ী' আসবেনা কখন।
সেই খানেতে বর্ষা কিংবা নাইক গরম-শীত,
বসন্তকাল চিরটিকাল সেথা উপস্থিত।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন— যখন বেহেশতবাসীগণ ফলমূলাদি খাইয়া পরতুষ্ট হইবেন, তখন তাঁহারা পুনঃ খাইতে ইচ্ছা করিবেন। অমনি বেহেশতের খাদেমগণ ও গেলমানেরা মুক্তা-জহরত, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং বিভিন্ন কিমতি অংখ্য খানচা ও পাত্রাদি ভর্তি করিয়া নানা কিসেমের ও রূপ রঙ্গের স্বাদ ও গন্ধের ফলমূলাদি, খাদ্য-সামগ্রী এবং নানা ধরনের পানীয় বস্তু লইয়া হাজির হইবে।

আল্লাহ্ পাক বলেন—

'বেহেশতের খাদেমগণ বেহেশতীগণের সম্মুখ দিয়া স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত বর্তন ও পেয়ালার মধ্যে নানা রকমের খাদ্যাদি লইয়া তাঁহাদের চতুষ্পার্শে ঘুরিবে, যাহার মধ্যে তাঁহাদের অভিপ্রায় ও চক্ষু শীতলকারী খাদ্যাদি মওজুদ থাকিবে।

সাথে নিয়ে সোনা-রূপার পেয়ালা ঝিকমিক,
গোলাম সকল বেহেশতীদের ঘুরবে চারিদিক।
থাকবে তাতে মনের মত চোখ জুড়ান খানা,
(খাইবে তাহা বেহেশতীরা কবরে আমিরানা)।

এই সকল পেয়ালা ও বরতনে নানা রকমের যেসব সুস্বাদু খাদ্যাদি মওজুদ থাকিবে, তাহা কোন বাবুর্চি নিজের হাতে রান্না করে নাই, বরং আল্লাহর আদেশ মতে প্রস্তুত হইয়াছে। বেহেশতের খাদেমগণ এই সকল

অভিনব খাদ্যাদি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিবে, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই সকল খাদ্যাদি হইতে আপনাদের যাহা ইচ্ছা পানাহার করিতে পারেন। বেহেশতবাসীগণ ইহা শুনা মাত্র তাহাদের চির-সংগিণীগণকে লইয়া আহার করিতে বসিবেন।

এই সকল তৃপ্তিদায়ক খাদ্য খাদক আহার করিয়া বেহেশতীগণ যখন তৃপ্তি লাভ করিবেন, তখন আবার এক প্রকারের পাখী তাহাদের চুতম্পার্শে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে থাকিবে-'আমরা অমুক সৌন্দর্যময় ময়দানে চড়িয়াছি, অমুক সুমিষ্ট কূপের পানি পান করিয়াছি, তাই আমরাও ভক্ষণ করিতে অত্যন্ত সুস্বাদু।' বেহেশতীগণ ইহা শুনা মাত্র পুনঃ উহা খাইতে ইচ্ছা করিবে। অমনি ঐ সকল পাখী ভূনা গোশতে পরিণত হইয়া খাঞ্চায় আসিয়া পড়িবে। বেহেশতবাসীগণ উহাকেও অতি আনন্দ সহকারে খাইতে থাকিবে।

হাদীস শরীফে আছে, বেহেশতবাসীগণ যত ইচ্ছা ফলমল খাইবে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের মল-মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে না বরং খাদ্যাদির ত্যাজ্য জিনিগুলি সুগন্ধি ঘর্ম এবং ঢেকুর দ্বারা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।

যত খুশী খাইবে সেথায় নানা রকম খানা,
হইবেনাক কভু তাতে পেশাব ও পায়খান।
উঠবে ঢেকর, বাহর হবে ঘর্ম সুবাসিত,
এতেই আবর ক্ষুধা তাদের পাইবে আগের মত।

মোটকথা, আল্লাহ্ পাক তাঁহার মো'মেন বান্দার সুখ ভোগের জন্য বেহেশতে যে সকল নেয়ামত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাহা কোন মানব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং কলম দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে! তবে আল্লাহর বাণী কোরআন শরীফের সামান্য এক টুকরা আয়াত এবং একটি হাদীসে কুদসী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বেহেশতের নেয়ামতসমূহ সকল নেয়ামত হইতে শতগুণ পার্থক্য রহিয়াছে।

মোটকথা, আল্লাহ্ পাক তাঁহার মো'মেন বান্দার সুখ ভোগের জন্য বেহেশতে যে সকল নেয়ামত প্রস্তুর্ত রাখিয়াছেন, তাহা কোন মানব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং কলম দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে! তবে আল্লাহর বাণী কোরআন শরীফের সামান্য এক টুকরা আয়াত এবং

একটি হাদীসে কুদসী হইতে আমরা বুঝেতে পারি যে, বেহেশতের নেয়ামতসমূহ সকল নেয়ামত হইতে শতগুণ পার্থক্য রহিয়াছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন—

ঃ আল্লাহ্ পাক মো'মেনদের জন্য বেহেশতে কি যে চক্ষু শীতকারী নেয়ামত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাহা আল্লাহ্ পাকই অবগত।

চোখ জুড়ান কত নে'মাত সেথায় আছে তার,
আল্লা ছাড়া হিসাব নিকাশ কেউ জানেনা আর।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন-

ঃ আমার প্রিয় নেককার বান্দাদের জন্য বেহেশতে যে সব নেয়ামত প্রস্তুত রাখিয়াছি, তাহা কোন মানব চক্ষে দেখে নাই, কানে শোনে নাই, এমনকি তাহার উপলব্ধি পর্যন্ত কোন মানুষ করিতে পারে নাই। (হাদীসে কুদসী)।

কবির ভাষায় শোনা যাক—

নেক বান্দাদের তরে বেহেশত মাঝার,
যত নেয়ামত আমি করেছি তৈয়ার।
কোন আঁখি সে সকল কভু দেখে নাই,
তাহার বান কোন কান শোনে নাই।
এমন কি মানুষের খেয়ালেও তাই,
আসিতে পারেনা, আর কভু আসে নাই।

--০--

বেহেশতের সৃষ্টি কৌশল ও নেয়ামত

বেহেশত সৃষ্টির কৌশল অপূর্ব। তার নেয়ামতও অবিস্মরণীয়। ইহার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা চেষ্টা করা বিশাল সাগরে হাবুডুবু খাওয়া ন্যায়ই। তুবও কিঞ্চিত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করিব।

এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দেস ও মুফাচ্ছের আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—

বেহেশতের স্বর্ণ-নির্মিত সর্বমোট আটটি দরজা। এই দরজার প্রথমটিতে কলেমা তাইয়্যেবা—

'লা-ইলাহা ইল্লাহল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখা রহিয়াছে। এই দরজা হইয়া নবী, রাসূল, শহীদ ও দানশীলগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবেন। দ্বিতীয় দরজা দ্বারা যে সকল লোক উত্তমরূপে অজু করিয়া অতি মিনতিভাবে ও নিয়মানুযায়ী নামাজ পড়িয়াছেন, তাঁহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবেন। তৃতীয় দরজা দিয়া যে সকল লোক সন্তুষ্ট চিত্তে জাকাম আদায় করিয়াছেন, তাঁহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবেন। চতুর্থ দরজা দিয়া যাঁহারা মানুষদিগকে আল্লাহর নির্দেশিত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নিষিদ্ধ পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন, তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবেন। পঞ্চম দরজা, যাঁহারা অন্যকে অন্যায়ভাবে অত্যাচার হইতে এবং নিজেকে কাম রিপু হইতে বিরহ রাখিয়াছে তাঁহাদের কর্তৃক উক্ত দরজা বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ষষ্ঠ দরজা দিয়া যাঁহারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হজ্জ্ব করিয়াছেন, তাঁহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবেন। সপ্তম দরজা-যাঁহারা দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থভাবে জেহাদ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্যায় কার্য (হারাম) হইতে নিজ আত্মাকে বিরত রাখিয়াছেন এবং মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিাছেন; তাঁহারা উক্ত দরজা দিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবেন।'

বেহেশত মোট আটটি, তন্মধ্যে বেহেশতবাসীগণের আবাস গৃহরূপে সাতটি যথা— দারুল জানান, দারুচ্ছাল্লা, জান্নাতুল মা'ওয়া, জান্নাতুল খোলদ, জান্নাতুন নাঈম, জান্নাতুল ফিরদাউস জান্নাতুল আদন। অষ্টম বেহেশত ইল্লিয়্যুন ঃ ইহা বেহেশতীদের বিচরণ ও পরিভ্রমণ বাগান বা

পার্ক। ইহা সকল বেহেশতের সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিমিত্ত তৈরী করা হইয়াছে।

বেহেশতের প্রস্তুত কৌশল অত্যাশ্চর্য ও সৌন্দর্যময়। উহার নির্মাণ কৌশলের মধ্যে সৌন্দর্য এই যে, স্বর্ণ নির্মিত একটি ইটের পরে আর একটি রৌপ্য নির্মিত ইট সাজাইয়া গাঁথা হইয়াছে। অর্থাৎ এক ইট পরিমাণ স্থান লাল বর্ণ এবং আর এক ইট পরিমাণ স্থান শ্বেত বর্ণের-এই প্রকারে একটির পর একটি ইট গাঁথিয়া (স্বর্ণের ও রৌপ্যের) ইমারতটির নির্মান কার্য শেষ করা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, বেহেশত দেখিতে কত মনোরম। এতদ্ব্যতীয়ত ইট গাঁথুনীর বস্তু মেশক এবং জাফ্রান দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এক খানা ইট সোনার এবং রজতের একখান,
মশল্লা তার আতর গোলাব মেশক ও জাফরান!

বেহেশতে বিরাট বিরাট গম্বুজ আছে, এই সকল গম্বুজ যথাক্রমে মুক্তা ও জমরূদ নামক পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে।

বেহেশতের নিম্ন দিয়া অনেকগুলি নহর (ছোট নদী) প্রবাহিত আছে। এই সমস্ত নহরের পার্শ্ব শ্বেত বর্ণের মুক্তা দ্বারা বাঁধান। দেখিতে উহা অতি মনোরম। নহরগুলির মধ্যে নহরে রহমত সুদীর্ঘ, উহা সকল বেহেশতে প্রবাহিত হইয়া অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে। নহরে রহমত ছোট ছোট মুক্তার দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান আছে। উহার পানি বরফ হইতে শীতল এবং মধু হইতে মিষ্টি। বেহেশতবাসীগণ উহার পানি একবার পান করিলে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবেন, দ্বিতীয়বার পান করিবার মত ইচ্ছা তাহাগের আর থাকিবে না।

আর একটি নহরের নাম 'নহরে কাওসার'। এই নহরটি আমাদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জন্য আল্লাহ্ বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কেয়ামতের দিবস যখন উম্মতে মোহাম্মদিয়া পানির তৃষ্ণায় ব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তখন হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহার উম্মতকে উহার পানি পান করাইবেন। উক্ত নহর হইতে যে ব্যক্তি একবার পানি পান করিবে, চিরদিন তাহার আর পানির তৃষ্ণা হইবে না। উহার মধ্যে অসংখ্য স্বর্ণ নির্মিত তারকার ন্যায় সমুজ্জল পান-পাত্র ভাসিতেছে।

বেহেশতবাসীগণ যখনই ইচ্ছা করিবেন উক্ত সৌন্দর্যের পাত্র দ্বারা পানি পান করিতে পারিবেন।

নবীজীকে দেয়া খাছ তোহফা আল্লাহ্
অমীয় ধারায় পূর্ণ কাওছার নহর।
সুরভিত পানি তার এত মজাদার,
হয়না কিছুর সাথে তুলনা তাহার।
কনক নির্মিত দীপ্ত তারকার ন্যায়,
উজ্জ্বল পিয়ালা তাতে বাসিয়া বেড়ায়।
সেই পানি যদি পান করে একবার,
জীবনে পিপাসা কভু লাগিবেনা আর।

বেহেশতে আরও অনেক নহর আছে, তন্মধ্যে–নহরে সালসাবীল, নহরে রাহীকুম মাখতুম ইত্যাদি। এই সবের পানিও অতি সুস্বাদু। বেহেশতবাসীগণ যখন যে নহরের পানি পান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই সেই নহরের পানি পান করিতে পারিবেন। হাদীছ শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে জিব্রঈল আমাকে সকল বেহেশত পরিদর্শন করাইয়াছেন। আমি বেহেশতের মধ্যে চরি প্রকার নহর দেখিয়াছি। তন্মধ্যে একটির পানি বিশুদ্ধ পানির স্বাদ ও পরিষ্কার, আর অপরগুলিতে যথাক্রমে দুধ, পবিত্র শরাব ও বিশুদ্ধ মধু আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

ঃ বেহেশতের নহরসমূহের মধ্যে এক শ্রেণীর নহরে স্বচ্ছ পানি থাকিবে, আর এক শ্রেণীর নহরে এমন খাঁটি দুধ থাকিবে স্বাদ কখনই পরিবর্তন হইবে না; অন্য এক ধরণের নহর থাকিবে যাহা এমন পবিত্র শরাব দ্বারা পরিপূর্ণ যে, তাহা পানকারীদের নিকট অতিশয় সুস্বাদু বলিয়া মনে হইবে এবং আর এক প্রকার নহর আছে, যাহা অত্যন্ত পরিস্কৃত মধু দ্বারা পরিপূর্ণ।

বেহেশত মাঝে নানা রকম নহর আছে জারী,
তাহার কতগুলির মাঝে স্বচ্ছ–শীতল বারী।

কতগুলি দুধের নহর ঝির ঝিরিয়ে বয়,
যেই দুধেরই স্বাদ কখন বদল নাহি হয়।
কতক নহর. শরাব বোঝাই গন্ধে স্বাদে ভরা,
কতক নহর খালেছ মধুর পরান আকুল করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সকল নহর দেখিয়া জিব্রাইলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন— 'হে ভাই জিব্রাইল। এই সকল নহর কোথায় নহর কোথা হইতে প্রবাহিত হইয়াছে এবং কোথায় গিয়া পড়িয়াছে?' হজরত জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর করিলেন, 'কোথা হইতে যে এই সকল নহর প্রবাহিত হইয়াছে তাহা আমিও জানি না। তবে সকল নহরই 'কাওসার' নামাক নহরে পড়িয়াছে।' ইহার পর হজরত জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহকে (ছাঃ) বলিলেন— ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট ইহার গোপন তথ্য জানার জন্য আবেদন করুন।' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাই করিলেন। অমনি আল্লাহর আদেশে একজন ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া সালাম করিয়া বলি–লেন— ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি চক্ষু বন্ধ করুন।' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলি–লেন, আমি একস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি, যাহার দরজা শ্বেত বর্ণের মোতির, দরজার কড়া অত্যন্ত মূল্যবান ইয়াকুত পাথর দ্বারা নির্মিত এবং তাহা অতি বড় একটা স্বর্ণ নির্মিত তালা দ্বারা বন্ধ করা রাহিয়াছে।

অতঃপর আমি ফেরেশতার আদেশ মতে তাহার নিকটবর্তী হইয়া 'বিস মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়িলাম। অমনি তালা খুলিয়া গেল। আমি উত্ত ঘরে প্রবেশ করিলাম; ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি উহার মধ্যে বড় বড় চারিটি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভের গায়ে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখিত রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও দেখিলাম যে, বেহেশতের পানির নহর 'বিসমি'–এর (মীম) হইতে, দুধের নহর 'আল্লাহ' দুধের নহর 'আল্লাহ' এর (হা) হইতে; শরাবের নহর 'আরাহমান' রে (মীম) হইতে এবং মধুর 'আর রাহীমের' এর (মীম) হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।

ইহার পর আল্লাহ পাক আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে মোহাম্মদ! তোমার উম্মতের যে কেহ আমার নাম নিয়া ডাকিবে এবং অন্তঃকরণে

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলিবে, তাহাকে আমি এই চারটি নহর হইতে– পানি, দুধ, শরাব ও মধু পান করাইয়া পরিতৃষ্ট করাইব।

বেহেশতে 'তুয়া' নামে একটি অতীব সুন্দর বৃক্ষ আছে। তুয়া বৃক্ষের মূল বা শিকড় মোতি নির্মিত মাটির নিম্ন দিয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার শাখা সমূহ যমরূদ এবচং পাতা বহু মুল্যের সুনদুস নামক পদার্থ দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে। এই বৃক্ষের শাখা–প্রশাখাগুলি এত প্রসারিত হইয়াছে যে, বেহেশতের এমন কোন কামরা নাই যেখানে তাহার শীতল ছায়া পতিত হয় নাই যেমন সূর্য বহু কোটি বৎসর দূরের রাস্তায় থাকিয়াও আমাদের প্রত্যেহ বাড়ি–ঘরে আলো প্রদান করিয়া থাকে।

হজরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন–বেহেশতের যাবতীয় ফলমূ–লের গাছপালা স্বর্ণ নির্মিত হইবে। দুনিয়ার গাছ–পালার শিকড় যেরূপ নহে বরং উহার কান্ডসমূহ উপরের দিকে থাকে, বেহেশতের গাছপালা সেইরূপ নহে বরং উহার কান্ড নিম্নের দিকে ঝুলান এবংং শিকড় বা মূল উপরের দিকে থাকিবে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, বেহেশতবাসীদের মেওয়া ফল আহরণ করিতে যেন কষ্ট৬ না হয়।

আল্লাহ পাক বলেন— 'কুকুফুহা দানিয়া

কবির ভাষায় ইহার অর্থ শোনা যাক—

এমন আজব বৃক্ষরাজি বেহেশত মাঝে ভাই,
এই যে গাছের কোন নজীর এই দুনিয়ায় নাই
নীচের দিকে ডালপালা সব উপর দিকে মূল।
সহজেই হাত্রে কাছে পার যাতে ফল–মূল।

হজরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে–রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফর্মান, বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষ হইতে সুন্দর গহনা বেহেশতীগণের জন্যে নিয়ে পতিত হইয়া থাকে এবং উহার নিম্নদেশ হইতে মোতি ও ইয়াকুত নামে মূল্যবান পদার্থের তৈয়ারী এক প্রকার ডানা ওয়ালা ঘোড়া বাহির হইয়া থাকে। এই সমস্ত ঘোড়ার শরীর পালক দ্বারা আবৃত এবং ঘোড়ার তাঁহার আওলিয়াউল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধুগণকে বেহেশতের নানা সৌন্দর্য তাঁহার কীর্তি পরিদর্শন করে দান করিবেন। তাই

তাহারা উঁহার উপর আরোহণ করতঃ বেহেশতের বাগানে ভ্রমণ করিয়া নানা রকম আমোদ রকম আমোদ প্রমোদ উপভোগে মগ্ন থাকিবেন।

অন্যান্য বেহেশতী লোকগণের এ প্রকার সম্মানিত সোয়ারী মিলিবে না। ইহাতে উহাদের মনে সামান্য দুঃখ অনুভূত হইবে। এ কারণ আল্লাহর দরবারে তাঁহারা আরজ করিবেন– 'ইয়া এলাহী! উহাদিগকে আপনি এইরূপ ঘোড়া দান করিয়া সম্মানিত করিলেন, এমন কি আমলের দরুণ উহারা প্রাপ্ত হইল? আল্লাহ উত্তর করিবেন–

'হে লোক সকল! তোমরা রাত্রে গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকিতে, আর উহারা আমার সন্তুষ্টির জন্য রাত্রে নিদ্রা হইতে উঠিয়া নামাজ পড়িত; এইরূপে তোমরা দিনের বেলা পান ও আহার করিতে আর উহারা অধিকাংশ সময় রোজা রাখিত। আর তোমরা ইসালামের জন্য যুদ্ধ করার ভয়ে ঘরের একপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে, কিন্তু উহারা নিজেদের জীবনের ভয় তোমরা নিজের আত্মার উপর কুটিলতা করিয়া দান–ছদকা করিতে পার নাই, কিন্তু উহারা নিজে সুখ ভোগ না করিয়াও সর্বদা আমার রাস্তায় মাল দৌলত খরচ করিত। তাই আমি তাহাদের প্রতি অতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইয়া উহাদিগকে অদ্য এইরূপ সম্মানিত করিয়াছি।

বেহেশতের আবহাওয়া আমাদের নশ্বর দুনিয়া বসন্ত কালের আবহাওয়ার সাথে কিছুটা মিল আছে— অতি মাত্রায় গরম নয় আর অতি শীতলও নয়। এক কথায় নাতিশীতোষ্ণ। অনুরূপ, বেহেশতে অতি প্রখর রৌদ্রও নয় আর মেঘাচ্ছন্ন দিনের ন্যায় অন্ধকার নয়। বেহেশতের প্রকৃত অবস্থা মানসপটে উপলব্ধি করা অতি কঠিন কাজ। ইহা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই জানেন না।

নাই সেখানে বর্ষা কিম্বা নাইক গরম শীত,
বসন্তকাল বেহেশত মাঝ সদা উপস্থিত।
সেথায় নাহি সুতীব্র কিংবা মেঘের ভার,
প্রখর আলো নাইক সেথায় অথাবা আধার।
মাঝামাঝি সকল কিছু স্নিগ্ধ মনোরম,
বুঝাইতে সে খুবীর কথা লিখনী অক্ষম।

--০--

বেহেশতরে হুর গেলমান

হাদীছ শরীফে আছে, আল্লাহতাআ'লা শ্বেত, সবুজ, হলুদ ও লাল এই চরি প্রকার রং-এর মিশ্রণে বেহেশতের হুরগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের পা হইতে হাঁটু পর্যন্ত সৌন্দর্যময় জাফ্রান রং এ রঞ্জিত এবং হাঁটু হইতে মাথা পর্যন্ত কর্পুর, মেশক ও আম্বরের মিশ্রণে সুবাসিত ও সৌন্দর্য যুক্ত। বেঞ্রেশতের হুরগণের মাথার কেশ লম্বা সুবাসিত 'কারণ' নামক এক প্রকার আরব কৌকড়ান তৃণ বৃক্ষের ন্যায়। উহা দেখিতে অত্যন্ত মনোরম।

শুভ্র, সবুজ, হলদে ও লাল মিশিয়ে রং চার,
রূপের রাণী হুর বালাদের করছে তৈয়ার।
পা হইতে হাঁটু তাদের জাফ্রানেরি রংয়ে,
শোভার বাঁহার করে খোদা গড়ছে আজব ঢংয়ে।
সুরভিত কাফুর এবং মেশক ও আম্বর,
জানু হতে শির এ তিনে গঠিত সুন্দর।
ঢেউ খেলান কৃষ্ণ কোমল কোকড়ান কুন্তল,
কোকড়া যেমন সুবাসিত তৃণ করণ ফল।

আল্লাহ পাক আদি মানব হজরত আদম কে যেরূপ কাদা-মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি বেঞ্রেশতের হুরগণকেও মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের গঠন আকৃতি এবং সৌন্দর্যের সাথে অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবের কোন তুলনা চলে ন। সকল সৌন্দর্যই যেন আল্লাহ তাহাদের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত হুরগণের শরীরে আল্লাহ পাক এত সুগন্ধি দান করিয়াছেন, যদি উহারা নশ্বর দুনিয়ায় একবার থু থু ফেলে, তবে গোটা দুনিয়া মেশখ আম্বরের গন্ধে সুবাসিত হইয়া যাইবে। উহাদের প্রত্যেকের বক্ষে আল্লাহ পাকের যে বেহেশতী বন্ধুর জন্য তাহারা পয়দা হইয়াছে, তাহর নাম-ধাম লেখা থাকিবে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট এক একটি মনোরম মূর্তি ও স্বর্ণ নির্মিত চিরুণী আছে, যদ্দারা উহারা মাথার কেশ আচড়াইয়া পরিপক্ক করিয়া থাকে।

আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন— লো'মান নামে বেহেশতে একজন অপরূপ সুন্দরী রমণী (হুর) আছে। উহাকে আল্লাহতাআ'লা মিশখ কুপের পানির সংমিশ্রণে পয়দা করিয়াছেন। আল্লাহ উহার মধ্যে বিশেষ গুণ ইহাই দিয়াছেন যে, যদি সে সপ্ত সমুদ্রে পানিতেও সামান্য মাত্র থু থু নিক্ষেপ করে তবে সমুদ্রের সমস্ত পানি মধুর ন্যায় সুস্বাদু হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত উহার গ্রীবা দেশের পিছন ভাগে লিখিত আছেঃ যে আমার ন্যায় অপরূপ সুন্দরী রমণীর মিলন কামনা করে, সে যেন সর্বদা খোদার ইবাদতে মশগুল থাকে।

সাগর নীরে ফেললে থুথু ধরার সাগর যত,
পানি তাহার হয়ে যেত মিষ্টি মধুর মত।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন— আল্লাহ পাক 'জান্নাতে আদন' তৈয়ার করার পর জিব্রাঈলকে (আঃ) নির্দেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন— হে জিব্রাঈল! যাও জান্নাতের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া আমার সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া আইস। জিব্রাঈল আল্লাহর পাকের নির্দেশ মতে 'জান্নাতুল আদন পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একজন অপরূপ অসামান্য সুন্দরী (হুঃ) বেহেশতের কোন কামরা হইতে ধীর পদক্ষেপ বাহিরে আসিতেছে। রমণী বাহিরে আসিয়াই তাঁহার সম্মুখীন হইল এবং পাতলা রঙ্গীন অধর দুইটি যৎকিঞ্চিত প্রসারিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত সমূহ সামান্য বাহির করিয়া মুচকি হাসিল। রমণীর এহেন হাসিতে বেহেশতময় আলোকিত হইয়া গেল। এতদ্দর্শনে জিব্রাঈল ক্ষণিকের মত মূর্ছিত হইয়া জমীনে পড়িয়া রহিলেন এবং ভাবিলেন-'হয়তো ইহা আল্লাহ পাকের স্বীয় নুরের জ্যোতিই হইবে।

অতঃপর গাইব নির্দেশ আসিল— 'হে জিব্রাঈল? ভয় পাইও না, তুমি যাহা ভাবিয়াছ তাহা নহে,মস্তক উঠাও এবং উহার সাথে আলাপ কর।' এ নিদেশমত জিব্রাঈল (আঃ) উহার প্রতিবিম্বের দিকে তাকাইয়া বলিলেন-

সুবহানাল্লাজী খালাক্কাকী-'তোমার ন্যায় অপরূপ রূপসির সৃজনকর্তার গুণ-কীর্তন বর্ণনা করিতেছি।

সুন্দরী ইহার উত্তরে বলিল— 'হে আমীনুল্লাহ! তুমি কি জান,আল্লাহ আমাকে কাহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?' তিনি উত্তর করিলেন, 'না, জানি

না। 'সুন্দরী বলিল— 'আমাকে আল্লাহ ঐব্যক্তির জন্য পয়দা করিয়াছেন, যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত স্বীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আত্মার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ পালনপূর্বক তাঁহাকে রাজী রাখিতে ব্রতী থাকেন।

বান্দা যখন করতে থাকে খোদার ইবাদত,
বেহেস্ত মাঝে হয় তখনে তৈরী ইমারত।
আবার যখন বন্দেগীতে গাফিল হয়ে থাকে,
ফেরেস্তা কার্য তখন বন্ধ করে রাখে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন— 'আমি মে'রাজের রাত্রে বেহেশতে ফেরেশতাগণকে নানাবিধ ইমারত করিতে দেখিয়াছি। আমি তাহাদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা উত্তর করিল— 'আমরা খোদার নির্দেশে যাহাদের জন্য এই ইমারত নির্মাণ করিতেছি, তাহারা যখন আল্লাহর ইবাদত-নামাজ, রোজা, জিকের-আজকার, তসবীহ-তাহলীল ও স্মরণ ইত্যাদিতে মশগুল থাকে, তখনই আমরা উহাদের জন্য এইরূপ ইমারত নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত থাকি। আর তখন উহারা আল্লাগর ইবাদত হইতে গাফেল হইয়া পড়ে তখনই উহার কার্য স্থগিত রাখি।'

দুনিয়াটা কয়েদ খানা মমিন মানুষের,
ঠিক বিপরীত ইহা হল বেস্ত কাফিরের।

--০--

দীদারে ইলাহী ঃ আল্লাহর সন্দর্শন

দীদারে ইলাহী বা মহা মহিম আল্লাতাআলার পবিত্র বেহেশতে সন্দর্শণ বেহেশতীদের যাবতীয় নেয়ামত ও তাঁদের দানের চাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ ও আনন্দের বিষয়। বেহেশতে যে সব নাজ নেয়ামত রাখা হইয়াছে, তাহা দীদারে ইলাহীর সম্মুখে সম্পূর্ণ অসাড় -মূল্যহীন।

এই জন্য বুর্জগানে দ্বীন বলেন, দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যত প্রকারের উন্নতমানের খাদ্য সমাম্গ্রী রহিয়াছে, সেসব খাদ্য সামগ্রী ও ফল মুলের যাবতীয় মজা ও স্বাদ যদি একত্রিত করা হয়,

তবুও আল্লাহর দীদারের স্বাদের তুলনায় তাহা কোনই মূল্য রাখে না। অনুরূপ দুনিয়ায় যত সুগন্ধি দ্রব্য-আতর , গোলাপ,মেশক, আম্বর, কস্তুরী, সেন্ট ও ফুল ইত্যাদি আছে, সে সমুদয় সুগন্ধিকে যদিও একত্রিত করা যায়, তাহা হইলে খোদার দীদারের যে সুগন্ধি লাভ হইবে,তাহার কোটি ভাগের এক ভাগও হইবে না। আর দুনিয়ারে যাবতীয় ভোগ বিলাস ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এর্ব সমুদয় আনন্দ ও তৃপ্তিকে যদিও একত্রে সমাবেশ করাযায় তাহা হইলেও একমাত্র মুহূর্তকাল খোদা তাআ,লার দর্শনলাভে বেহেশতীদের যে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হইবে, তাহার কোটি ভাগও দীদার ইলাহীর কাছে কিছু নহে।

আল্লাহ তাআ'লার দীদার ও দর্শন লাভ বেহেশতবাসীগণ চারি পর্যায়ে হাছিল করিবে। প্রথম-বৎসরে একবার শুক্রবার;দ্বিতীয়-.সকালে বেলা একবার; তৃতীয় -বিকাল বেলা একবার; চতুর্থ-আর কে শ্রেণীর ভাগ্যবান বেহেশতী আছে, যাহার খাদেম ও গলমানের ন্যায় সর্বক্ষণ আল্লাহর দরবারে পড়িয়া থাকিবে ও দীদার ইলাহীর ইজ্জত হাছিল করিতে থাকিবে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিবস যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশত ও জাহান্নামীরা জাহান্নামে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন আল্লাহ পাক হজরত জিব্রাঈলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ হে জিব্রাঈল! আমার বেহেশতী বন্ধুগণকে 'মাক'আদে ছিদক' আর্থাৎ মহা সত্যের আসনে হাজির কর।' তখন হজরত জিবাঈল জান্নাতবাসীগণকে আহবান করিয়া জানাইবেন, 'ওহে সৌভাগ্যবানগণ, চুলুন, আপনাদের চির আকাঙ্খিত বন্ধুর দীদার পানে চলুন।' জিব্রাঈলের ডাকে তাঁহারা 'মাক'আদে ছিদকে' সমবেত হইবে। তখন আল্লাহতাআলা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, 'হে আমার প্রিয় দোস্তগণ! তোমা আমার নিকট কি পার্থনা কর?' তাহারা উত্তর করিবে, 'হে দয়াময়! পাক কালামে আপনি আমাদের সঙ্গ ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আপন দর্শন লাভ করইয়া আমাদের বেহেশতে আগমনকে স্বার্থক করিবেন।' তখন আল্লাহতাআ'লা ইরশাদ

করিবেন, 'ওহে বন্ধুগণ! যখনই আমার দীদার লাভ করিবে তৎক্ষণাৎ সবাই মিলিয়া সেজদায় পড়িয়া যাইবে।'

এই সেজদার অবস্থায়ই প্রথমতঃ মহামহিম প্রভুর চির আকাংখিত দীদারের সাহায্যে জান্নাতবাসীগণকে সম্মানিত করা হইবে। পরে খোদার হুকুমে যখন সেজদা হইতে মাথা উত্তোলন করিবে, তখন তাহাদের জন্য বিভিন্ন স্বাদ ও রং-বেরং এ খাদ্য সামগ্রী আসিয়া হাজির হইবে ও চুতস্পার্শ্বে মুক্তার মত উজ্জ্বল চেহারার অগণিত গেলমান বেষ্টন করিয়া থাকিবে। এই অবসরে বেহেশতীদের মধ্যে হইতে সম্ভবতঃ হজরত আলী উঠিয়া আরজ করিবেন- 'হে আমাদের মাওলা! পবিত্র কালামে পাকে আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন— যে, বেহেশতীদের আপনি নিজ হস্তে 'শরাবে তহুর' পান করাইবেন—

ওয়াদা দিয়াছে মোমেনে দয়াল গফুর,
নিজ হাতে করাবে পান শরাবে তহুর।

আল্লাহতাআ'লা প্রত্যুত্তরে বলিবেন, 'আমার বন্ধু ঠিকই বলিয়াছে।' তারপর আরশে মোআ'ল্লার পাদদেশ হইতে অসংখ্য পেয়ালা আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের মুখের সামনে হাজির হইবে ও তাহারা আনন্দে বিভোর হইয়া পান করিতে থাকিবে। অতঃপর আল্লাহতাআ'লা জান্নাতীদের বলিবেন, 'আমার সদনে আর কিসের আশংকা কর?

বেহেশতীগন জানিত, নবীবর হজরত দাউদের সুর ছিল ভুবন বিখ্যাত। তাহার সুললিত কণ্ঠে'জবুর' পাঠ শুনিয়া আকাশ বাতাস সত স্তম্ভিত হইত-দরিয়ার মাছ আসিত কিনারায়। তাই আল্লাহর সদনে তাহারা জানাইবে,-'আমরা দাউদ নবীর (আঃ) কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত শুনিতে চাই। তখন পাক পরওয়ারদেগার হজরত দাউদকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করিবার নির্দেশ দিবেন। তিনি সুমিষ্ট সুরে তেলাওয়াত শুরু করিবেন-ইন্নালমুত্তাকীনা ফী মাকামিন আমীনিন।

ঃযাহার আল্লাহতা'আলাকে ভয করিয়াছে,তাহারা নিরাপদ স্থানে বেহেশতের উদ্যানও নহরসমুহে অবশ্যই আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহারা

মহামূল্যবান মসৃণ রেশমী পোশাক পরিধান করিয়া সকলেই মুখোমুখি হইয়া বসিবে।

উক্ত আয়াত হজরত দাউদের কণ্ঠে এত সুমধুর স্বরে শ্রুত হইবে যে, উহা শুনিবামাত্র সকলে আনন্দে বিভোর হইয়া নিজ নিজ আসনে বসিয়া হেলিতে আরম্ভ করিবে। হাদীছের অন্য একটি সূত্রো জানা যায়, আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহারা দুইশত বৎসর পর্যন্ত উড়িতে থাকিবে।

আল্লাহতাআ'লা পুনঃ ইরশাদ ফরমাইবেন, 'তোমরা কি আমার কালাম আমার নিজ মুখে শুনিতে বাসনা রাখ।' সবাই তখন এক বাক্যে হাঁ বলিয়া উত্তর করিবে।' পরওয়ারেদেগারে আলম জলদ গম্ভীর অথচ সুললিত কণ্ঠে পাঠ আরম্ভ করিবেন-

আনার রাহমানুর রাহীম। আররাহমানু আল্লামালকুরআন।
আমি সে দয়ালু রহমান রহমি,
শিখাইছি তব কোরআন করীম।

আল্লাহ পাকের খোদ জাবানীতে তাঁহারই অমর বাণী শ্রবণ করিয়া বেহেশতীগণ আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িবে এবং সহস্র বৎসর যাবত আলমে মালকুতের ভিতর মত্ত ও বিভোর হইয়া থাকিবে।

আরেক পর্যায়ে দীদারঃ বেহেশতের মধ্যে আরেকটি স্থানের নাম হইবে 'খতিরাতুল কুদছ'। আল্লাহতাআ'লা আপন দীদার প্রদর্শনের জন্য জান্নাতবাসীগণকে তথায় নিমন্ত্রণ করিবেন। যথা সময়ে তাহারা তথায় হাজির হইবে এবং আল্লাহরা দীদার লাভ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। ইহাতে বেহেশতের যাবতীয় নাজ-নেয়ামত, হুর-গেলমানসমূহের কথা একেবারেই তাহারা ভুলিয়া যাইবে।

ইতমধ্যে বেহেশতীদের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার দরুন জান্নাতে অপেক্ষামান হুরগণ খোদার দরবারে ফরিয়াদ করিতে রহিবে, 'হে পরওয়ারদেগার! কতকাল যাবত আমরা স্বামীদের সাক্ষাৎ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। মেহেরবানী করিয়া আপনি তাহাদিগকে আমাদের সঙ্গে পুনরায় মিলাইয়া দিন।'

তাহাদের সবিনয় নিবেদন যখন খোদার দরবারে মঞ্জুরী লাভ করিবে, তখন হঠাৎ আলহতাআ'লা আপন নূরানী চেহারার সামনে পর্দা পতন করিবেন। দর্শনকারীদের চৈতন্য হইবে এবং তখন দীদারের স্বাদ হইতে বঞ্চিম হওয়ার দরুন হায় হায় করিতে আরম্ভ করিবে আর বেহেশতের মাটিতে গড়াগড়ি খাইয়া ছটফট করিবে। তাহারা সকলেই আল্লাহর দরবারে আরজ করিবে—

'ওহে দয়াময় প্রভূ! ক্ষণিকের তরে সাক্ষাত দান করিয়া আবার কেন লুকাইয়া গেলে? আবার দেখা দাও প্রভূ! প্রাণ ভরিয়া তোমার নূরানী জ্যোতির্ময় চেহারাকে আবার দেখিতে দাও মাওলা।

মহাপ্রভূ আল্লাহত্তাআ'লা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'হে আমার প্রিয় বন্দগণ? তোমরা কত কাল পর্যন্ত আমার দীদার লাভ করিয়াছ?' তাহারা একবাক্যে উত্তর করিবেম সামান্য এক দুই ঘন্টার অধিকতো তোমাকে দেখিতে পাই নাই। আল্লাহতাআ'লা তখন আপন বন্ধুগণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিবেন, 'আমরা ইজ্জত ও বুজুর্গীর কসম খাইয়া বলিতেছি, দীর্ঘ আট লক্ষ্য বৎসর যাবৎ তোমার আমার পবিত্র দীদারের স্বাদ হাছিল করিয়াছ। কবির ভাষায় শোনা যাক–

পূণ্যবানেরা পাইবে সুখের সরগ,
পাপীকুলে হবে ভর্তি ভীষণ নরক।
সরগ নরক নয়হে কামনা আমার,
শুধু পাইতে চাই প্রভু তব দীদার।

দীদারে ইলাহী ও বেহেশতের বাজারঃ হাদীছের তথ্য হইতে জানা যায়, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যে একদা ছাহাবী আবু হোরাইবার সাথে মদীনার কোন বাজারে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হজরত আবু হোরাইরা সাঈদ ছাহাবীবে দোয়া করিলেন— 'আল্লাহ যেন তোমার আমার সাক্ষাৎকার বেহেশতের বাজারে করান।' তখন হজরত সাঈদ বলিলেন, বেহেশতের মধ্যে কি আবার কোন বাজার হইবে? তিরিন উত্তর করিলেন, নবী (ছাঃ) আমাকে বলিয়াছেন, বেহেমতবাসীগণ আপন ন আমল

অনরুসারে তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত বাসস্থানসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং বসবাস করিতে থাকিবে আপন আপন স্থানে।

অতঃপর প্রতি শুক্রবার পরওয়ারদেগারের সাক্ষাতের নিমিত্ত তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। তাহারা বাহির হইয়া আসিবে, তখন খোদার আরশ তাহাদের সম্মুখে হাজির হইবে। আল্লাহতাআ'লা বেহেশতের একটি ইদ্যানে তাহাদের সঙ্গেসাক্ষাৎ দান করবেন। বান্দাদের জন্য তথায় নূরের মণিমুক্তা, ইয়াকুত, জমরুদ ও স্বর্ণ রৌপ্যের অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের উচচাসন সজ্জিত করা হইবে। অপেক্ষাকৃত যাহারা নিম্নস্তরের বেহেশতী হইবে, তাহাদের জন্য মেশক ও কাফুরের আসন সাজ্জত করা হইবে। আশ্চর্য, যাহারা শেষোক্ত আসনের অধিকারী হইবে, তাহারাও মিম্বারে উপবিষ্ট লোকদিগকে নিজেদের চেয়ে বেশী সন্মানিত মনে করিবেন না।

হজরত আবু হোরাইয়া বলিলেন, আমি হুজুরকে (ছঃ) প্রশ্ন করিলাম, 'আমরা কি আল্লাহতা'লাকে সেদিন স্বচক্ষে দর্শন করিব?' হুজুর উত্তর করিলেন, নিশ্চয় করিবে! তোমরা কি চতুর্দশীর পূর্ণিমা চন্দ্রকে দেখিতে কোন সন্দেহ পোষণ কর? আমরা জবাব দিলাম, 'নিশ্চয় না' অতঃপর হুজুর বলিলেন—

আপন প্রভুকে দেখার মাঝেও সেরূপ তোমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। উক্ত মাহফিলের প্রত্যেকের সঙ্গে আল্লাহ পাক প্রত্যক্ষভাবে আলাপ আলোচনা করিবেন ও আপন পরদা উঠাইয়া দিবেন।' বেহেশতবাসীগণ যখন উক্ত মজলিসে আল্লাহর দীদর রাভ করিয়া এ অস-াধারণ তৃপ্তি লাভ করিতে থাকিবে, হঠাৎ এক খন্ড মেঘ আসিয়া তাহাদের উপর এইরূপ খুশবুও সুগন্ধি দ্রব্য বর্ষণ করিতে থাকিবে, যাহা ইতিপূর্বে কখনও লাভ করে নাই।

তারপর আল্লাহতাআ'লা সবাইকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন— 'তোমাদের জন্য যে সমস্ত সন্মানিত বস্তুর ব্যবস্থা করিয়াছিঃ সেগুলি আপন পছন্দ মাফিক গ্রহণ করিতে অগ্রসর হও।' তখন আমরা উক্ত বাজারে আসিয়া হাজির হইাব এবং দেখিব যে,অগণিত ফেরেস্তা উহাকে বেষ্টন

করিয়া রহিয়াছে। আমরা তথায় এমন সব জিনিস দেখিতে পাইাব, যাহা ইতপূর্বে কোন চক্ষু দর্শন করে নাই। সেই মহামূল্যবান অফুরন্ত বস্ত্রসমূহ,অলঙ্কারাদী ও সুগন্ধি এবং রঙ্গিন প্রসাধনী দ্রব্যসমূহ ইচ্ছানুযায়ী আমাদিগকে দেওয়া হইবে। যাহা না বিক্রিগ করা হইবে, না খরিদ করা যাইবে। সকলেই আপন আপন পছন্দসই উপঢৌকনসমূহ বিবিগণ ও হুর-গণকে সাজাইবার জন্য বোঝাই করিয়া নিয়া যাইবে।

সেই বিখ্যাত বাজারে বেহেশতবাসীগণ আপন আপন বন্ধুদের সাথে মিলিত হইবে। 'যাহারা নীচ শ্রেণীর স্বর্গবাসী হইবে, তাহারা উচ্চশ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও আড়ম্বরপুর্ন জাঁকজমক দেখিয়া প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত বন্ধুর সহিত একটি কথা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ তাহার পোশাক-পরিচ্ছদও একই রূপ শান-শওকতপূর্ন হইয়া উঠিবে। ইহা এই জন্যই করা হইবে যে, বেহেশতের মধ্যে আল্লাহ পাক কোন বান্দাকেই মনঃক্ষুন্ন হইতে দিবেন না—চাহেনও না তিনি তাহা।

অতঃপর আমরা যখন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তণ কবির, তখন আমাদের বিবিগণও সাদরে সম্ভাষণ জানাইয়া মারহাবা বলিতে বলিতে আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসিবে আর বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা বিদায়কালীন রং-রূপ হইতে বহুগুণে রূপসজ্জা নিয়া ফিরিয়াছ।' আমরা উত্তর করিব, 'যেহেতু আমরা আজ আপন মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি, তাইতো এত অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী হইয়াছি।'

--০--

বেহেশত হাছিলের মূল উপাদান

এতক্ষণ বেহেশতের বিভিন্ন বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। রূপরেখা-সৌন্দর্য, বেহেশতে মোমেনদের জন্য সংগৃহীত খোদায়ী নেয়ামত এবং হুর-গেলমান, মোটকথা সবকিছুই ছোট খাটভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখন প্রশ উঠিতে পারে, সত্যিকারে এ চিরসুখের-আকর, অতুল সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন বেহেশতের অধিকারী হইবেন কাহারা-কাহারা এ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া চিরসুখী হইবেন?

এ প্রশ্নের উত্তর সোজা। আল্লাহতাআ'লা মহান করুণাময় ও দয়াশীল। তাঁহার বান্দাদের অর্থাৎ মোমেনদের জন্য তিনি বিগলিত প্রাণ। বান্দা যদি আল্লাহর খুশির উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান ও কর্ম পালন করিয়া যায়, তব তিনি তাহাদেরকে পরকালে সেই বেহেশতেই স্থান দিবেন। এ কথা বিশ্বাস রাখা এবং উহার উপর দৃঢ় থাকাও বান্দার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কিন্তু সাথে সাথে এ বিষয়ও স্মরণ রাখিতে হইবে-ভুলিলে চলিবে না যে, বান্দা আপন দৃষ্টিতে যতই ভাল কাজ করুন এবং মন্দ ও অন্যায়ের কাজ হইতে বিরত থাকুন, আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন কিছুই হইতে পারিবে না। অর্থাৎ আমল যতই সুন্দর করুন না কেন-এই আমলের দাবীতে কোন বান্দাই বেহেশতে যাইতে পারিবে না-কখনই পারিবে না। বেহেশত লাভ এবং সেখানের একজন নাগরিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভের জন্য আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানীই একমাত্র সম্বল ও উপাদান। আর ঐ উপাদানই হইল মূল। গৌণ উপাদান যে কিছু নাই, তাও নয়। তাহা না হইলে ভাল মন্দের কারণ হইবে কি করিয়া? কি করিয়াই বা প্রমাণ হইবে এ লোকই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা বা আল্লাহর হুকুমের আজ্ঞাবাহী, আর এ লোকটি অকৃতজ্ঞ ও আল্লাহর হুকুমের খেলাপকারী নষ্ট লোক।

এ জন্য তাহাকে বাহ্যিকও কিছু অনুষ্ঠান পালন করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, মনের অনুষ্ঠান; দ্বিতীয়, কর্মানুষ্ঠান। মনের অনুষ্ঠানঃ আল্লাহকে এক-অদ্বিতীয় লা শরীক মনে করা এবং সে সাথে সাথে নিজের কর্মে তা প্রকাশ করা। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তির আশ্রয় না লওয়া-কোন দেব-দেবীর অর্চনা না করা।

ইহাকে এক কথায় 'ঈমান বিল গাইব' বা অদৃশ্য জাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন বলে। আর তিনি যা বলিয়াছেন এবং যাকে যেরূপ ভাবিতে নির্দেশ দিয়াছেন, সেভাবে মানা ও বিশ্বাস করা। অর্থাৎ আল্লাহর আহকাম বা সংবিধান লইয়া যিনি মানব-কুলের কাছে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এবং তাঁহার নির্দেশ আল্লাহরই নির্দেশ মনে করিয়া সেমত নিজের জীবন গঠন করা।

এ গেল বিশ্বাসের মোটামুটি ধারণা। এরপর আসিবে কর্মানুষ্ঠান। আল্লাহ মানুষকে লাগামহীন ভাবে ছাড়িয়া দিতে রাজি নহেন। আল্লাহকে মানে, বিশ্বাস করে এবং স্বেমতে নিজের জীবন পরিচালনা করে, এ জন্য তিনি বান্দার প্রতি কিছু কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছেন। সেগুলি হইল-নামাজ, রোজা, মালদারের জন্য জাকাত দেওয়া এবং সামর্থ্যবানের জন্য জীবনে একবার হজব্রত পালন করা।

কর্মানুষ্ঠানের এ বিধানগুলিকে আল্লাহর পথে জিহাদ, মানে শ্রম-লব্ধ কর্ম বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। যদিও শত্রুর-সাথে মোকাবেলা করাও এক শ্রেণীর জিহাদ। কিন্তু প্রবৃত্তির সাথে 'স্নায়ুযুদ্ধ' বা জিহাদই জিহাদে আকবর বা মহা সংগ্রাম।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আলা তিজারাতিন তুনজীকুম মিন আজাবিন আলীম।

মোমেনদের উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহ তা'আলার সাথে ব্যবসায়ে যদি পরকালে লাভবান হইতে চাও, এবং কঠিন দোজখের আজাব হএত বাঁচিয়া থাকিয়া অপূর্ব সুখের আস্তানা বেহেশত বাগীচার চিরকল্যাণ কামনা কর, তবে শোন- তোমাদের পরি-ত্রাণের পথ বাতাইয়া দিতেছিঃ তোমরা প্রথমতঃ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং নিজের কু প্রবৃত্তির প্ররোচনা নির্মূল করার উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা চালাও, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন কর। এ কারণে তোমাদের জীবন ও সম্পদ যদিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবুও পিছপা হইও না। জ্ঞানীজনের ইশারাই যথেষ্ট। তাই তোমরা বুদ্ধিমানের মত বিবেক চালনা করিয়া কাজ করিও।'

খোদার সাথে কারবারে হতে চাও লাভবান,
জিহাদ কর খোদা রাসূলের পরে নিয়ে ঈমান।
আসল ব্যবসা ইহা জান হে মোমেন বেরাদার,
পরকালে যাইবে বেহেশতে-সুখের আকর।

আল্লাহ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করিয়া যদি বিজয়ী হইতে পার,- শয়তানকে পরাভূত করিতে পার, তবেই খোদা তোমাদের অপরাধ ও গোনাহ মার্জনা করিয়া দিবেন এবং অপূর্ব সৌন্দর্যের বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। এই যদি করিতে পারিলে, তবে এ হইতে বিরাট বিজয় আর কিছু নাই। ইহাই অপূর্ব সফলতা।'

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন-

'যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং সুন্দর ও নেক কর্ম করিয়াছে, তাহাদেরকেই আল্লাহ স্বর্গোদ্যান দান করিবেন। সেটাই হইবে তাহাদের চির বাসস্থান।'

কিভাবে শয়তানী অছওয়াছা তথা কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব মুক্ত হইবে এবং কেমন করিয়া আল্লাহর খুশী হাছিল করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন মহান আল্লাহ তাআ'লা নিজের কালাম শরীফে।

সূরা মুমেনুনে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

'আল্লাহর মোমেন বান্দাদের তাহারাই প্রকৃত অর্থে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে-দোজখ ও আল্লাহর গজব হইতে মুক্তি পাইয়া জান্নাতের অধিকারী হইয়াছে, যাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হৃদয়ে নামাজ আদায় করে, বাহুল্য কথা হইতে বিরত থাকেঃ স্বউপার্জিত সম্পদের সদ্ব্যবহার অর্থাৎ যথারীতি জাকাত আদায় করে, ক্রীতদাসী ও আপন স্ত্রীদের ব্যতীত অন্যত্র হইতে নিজের লজ্জাস্থানকে সাবধানে হেফাজত করে। আল্লাহর মনোনীত ধর্মীয় বিধান ব্যতীত অন্য পথে আদৌ চলে না।

এতদ্ব্যতীত সে সব লোক আমানতের মালকে নিজস্ব কিছু মনে না করিয়া তাহার সংরক্ষণ করে; ওয়াদা ভঙ্গ করে না-প্রকৃত পক্ষে নামাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে, উহারাই ফেরদাউস নামক বেহেশতের অধিকারী।

পেতে চাও যদি তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস,
চলিও খোদার মনোনীত দ্বীনে করিয়া হুশ।

—খতম শোধ—

পরিশিষ্টাংশ

মরণের আগে ও পরে

গোনাহের কার্যাবলী

আল্লাহ পাক তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানব জাতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে নশ্বর ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদিগকে (উম্মতে মোহাম্মাদিয়া) সকল উম্মত হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব সম্মানিত করিয়াছেন। আমাদের হেদায়েত .ও পথ-প্রদর্শন কল্পে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে (ছাঃ) আল্লাহর বানী কোরআনসহ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে কোরআনের বাণী হইতে ভাল কার্যের নির্দেশ এবং গোনাহের কার্যের নিষেধ করিয়াছেন। তাই আমরা যেন তাঁর আদেশ পালানও নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকিয়া কেয়ামতের দিবস ইলাহীর আদালতে সসম্মানে দণ্ডায়মান হইতে পারি, এই আমাদের কামনা।

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া নেক কার্য সমূহের আলোচনা এখানে হইল না। অতএব, সাধারণতঃ আমরা যে সকল গোনাহে লিপ্ত হইয়া পড়ি, তাহারই যৎকিঞ্চিত আলোচনা এখানে করা হইল। মো'মেন মোসলমান ভাই-বোনেরা যেন এইরূপ গোনাহর কার্য হইতে বিরত থাকিয়া তাহাদের ভবিষৎ জীবন উজ্জল ও শান্তিময় এবং জয়যুক্ত করিতে পারেন। বিশেষ করিয়া আমাদের এই বিরাট উপ-মহাদেশে বিশেষ একটি সমস্যার উদ্ভব হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদেরও একান্ত পালন করিতেই হইবে, ইহারাই যেন আমাদের ভবিষ্যাৎ উজ্জল তারকা। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম তাহা সমর্থন করে না বরং উহা পালনে আমাদের ভবিষৎ অন্ধকার ও আজাবের আশংকাও রহিয়াছে। কিয়ামতের দিবস স্বীয় কৃত কার্যের জবাবদিহি নিজেরই করিতে হইবে, তখন আর পূর্বপুরুষগণ জবাব দিতে আসিবে না। যার যার পাপের বোঝা তাহাকেই বহন করিতে হইবে।

যেসব কারণে দোজখী হওয়ার সম্ভাবনা

দোজখ আল্লাহ পাকের সৃষ্টির জঘন্য ও গজবের স্থান। ইহা আল্লাহর অভিশপ্ত লোকদের চিরদুঃখ ও লজ্জাকর বাসস্থান। যেসব কাজে আল্লাহর

অখুশী, অসন্তোষের কারণ রহিয়াছে, দোজখে প্রবিষ্ট হইবার উহাই একমাত্র উপকরণ। কোন কাজে আল্লাহ খুশী আর কোনটিতে নারাজ ও নাখোশ তাহা তিনি পবিত্র কোরআন ও রাসূলের হাদীছ মারফত তাঁহার বান্দাদের অবগত করাইয়াছেন। বান্দা তাহার বিপরীত কিছু করিলেই আল্লাহ তাহার উপর নারাজ ও অসন্তোষ হন।

যে সব কাজ বান্ধা তাহার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নির্দেশের বিপরীত করিলে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার মোটামুটি বিবরণ দেওয়া গেল।

শেরক :-শেরক একটি মহাপাপ, যাহা মানুষ দ্বারা সৃষ্টি হইলে তাহাকে অবশ্যই দোজখে যাইতে হইবে।

আল্লাহ পাক কোরআনে ইরশাদ করেন-

'ইন্নাশশিরকা লাজুমুন আজীম-অংশীবাদিতা জঘন্যতম গুনাহের কাজ।

শিরকে জলী বা প্রকাশ্য শিরক এবং শিরকে খফি বা অন্তর্নিহিত শিরক। শিরক এই দুই ভাগে বিভক্ত।

শিরকে জলী-আল্লাহতাআলার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা। অর্থাৎ জিন, ইনসান বা ফেরেশতা, আথবা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি বা যে কোন দেবদেবী, গাছপালা অথবা মর্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা খোদার প্রিয়তম কিংবা তাঁহার নৈকট্য লাভকারী মনে করিয়া উহাদের কাহারও পুজা-অর্চনা বা উপাসনা করা অথবা উহাদের নামে জীব- জন্তু, ছেলে মেয়েকে উৎসর্গ করা, তাহাদের নামে কোন জিনিসের মানত করাকে শিরকে জলী বা প্রকাশ্য শিরক বলা হয়।

যাহারা শিরকে জলী কার্যে লিপ্ত তাহারা নিশ্চিত ভাবে কাফের। মৃত্যুর পূর্বে তওবা করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হইলে তাহাদের কোন ক্ষমা নাই। অনন্তকালের জন্য তাহারা দোজখের সর্বোচ্চ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিতে। আল্লাহতাআ'লার পবিত্র বেহেশত তাহাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে।

শিরকে খফী অর্থাৎ গোপন ও অন্তর্নিহিত শিরক। উক্ত শিরক আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তি কাহাকেও এ জাতীয় কথা বলিয়া সম্বোধন করা, 'আগে আল্লাহ, পাছে তুমি; তোমার উপর এই কাজ সোপর্দ করিলাম কিংবা কোন পীর-মোর্শেদ, অলি, দরবেশ বা দরগা দায়েরার নামে কোন গরু, ছাগল কিংবা হাঁস মুরগী ইত্যাদি জানোয়ারকে ছাড়িয়া দেওয়া বা উৎসর্গ করা কিংবা উহাদের নামে কোন জিনিসের মানত করা।'

হাদীছের মর্মে বুঝা যায়-রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদতও শিরকে খফির মধ্যে শামিল। যেমন আল্লাহর রাসূল বলেন-যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামাজ, রোজা ও দান খয়রাত করে, সে ব্যক্তি মোশরেকদের অন্তর্ভূক্ত।

মাতা-পিতার নাফরমানী করা : হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেনঃ তিন প্রকারের লোকের জন্য আল্লাহ তাআ'লা বেহেশত হারাম করিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে এক প্রকারের লোক হইল মাতা-পিতার অবাধ্যচরণ করা-অবাধ্য' হওয়া। নবী করীম (ছাঃ) অন্যত্র বলিয়াছেনঃ কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক গুনাহ হইল আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা ও মাতাপিতার নাফরমানী করা'

নামাজ না পড়া বা নামাজ অবহেলা করা : কোরআন শরীফে বহু স্থানে বেনামাজীর জন্য ভীষণ আজাবের ভয় দেখানো হইয়াছে। আল্লাহ পাক পবিত্র কালাম পাকের মধ্যে নামাজের জন্য যতটুকু তাকিদ করিয়াছেন, অপর কোন ইবাদতের জন্য ততটুকু তাকিদ করেন নাই। কোরআন শরীফে বিরাশি স্থানে প্রত্যক্ষভাবে নামাজের নির্দেশ আসিয়াছে এবং পরোক্ষভাবে তাকিদ করা হইয়াছে বহু স্থানে। অথচ যে কাজের জন্য আল্লাহ পাক একবার মাত্র নির্দেশ দান করেন, উহাই বান্দার উপর ফরজ হইয়া যায়। যেমন-রোজা সম্বন্ধে কোরআন শরীফে একটি মাত্র আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, যদ্দারা কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের উপর উহা ফরজ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ নামাজ এমন একটি ইবাদত যাহার হাকীকত ও

গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে সমস্ত ইবাদতের মধ্যে একমাত্র নামাজই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

জাকাত আদায় না করা ঃ আল্লাহতাআ'লা পবিত্র কালামে পাকে বর্ণনা করিয়াছেন, 'যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করিয়াছে অথচ তাহার জাকাত আদায় করে নাই, তাহাদের পিঠ, কপাল ও পার্শ্বদেশে দাগ দেওয়া হইবে।'

হজরত আবু হোরাইরা হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের জাকাত আদায় করে না, বিচারের দিনে ঐ সব স্বর্ণ রৌপ্যের তক্তী দ্বারা তাহার কপাল ও পার্শ্বদেশে দাগ দেওয়া হইবে। অতঃপর যখন তক্তীগুলি ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তখন পুনরায় গরম করা হইবে এবং কেয়ামতের পঞ্চাশ হাজার বৎসর সমতুল্য দিনের সর্বক্ষণ এ আজাব চলিতে থাকিবে।

রোজাব্রত পালন না করাঃ রোজাব্রত পালন করা ইসলাম ধর্মের একটি বুনিয়াদি ফরজ। কোরআন পাকে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে, 'হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হইল, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরজ ছিল। নিশ্চয় তোমরা উহার সাহায্যে খোদাভীরুতা অর্জন করিবে।'

প্রকৃত পক্ষে রমজান মোবারকের রোজা আমাদের ইহলৌকিক ও পার-লৌকিক জীবনের একটি কল্যাণকর ইবাদত। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত ছিয়ামের কৃচ্ছ সাধনার দ্বারা আমাদের শারীরিক সুস্থতা ব্যতীত আত্মার শুদ্ধি লাভ হয়। দিনের বেলায় ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী, সম্ভোষ ও কামনা ত্যাগ করার দরুণ মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রেম-প্রীতি ভালবাসা পয়দা হয়। তদুপরি একমাস যাবত উপবাস ব্রত পালন করার দরুণ মানুষের অন্তরে গরীব দুঃখীদের দুঃখ দৈন্য ও ক্ষুধা তৃষ্ণাময় জীবনের প্রতি আসে এক মমত্ববোধ, দরদ ও সহানুভূতি।

হাদীছের উক্তিমতে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এই তিনটি বিষয়বস্তুর কোন কটি কেহ যদি বাদ দেয় কিংবা বাদ দেওয়াকে বৈধ বা হালালভাবে, তবে সে ব্যক্তি কাফেরের মধ্যে পরিগণিত

হইবে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির জীবন সম্পদ সম্পূর্ণ মূল্যহীন বা হারাম হইবে- (১) আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া। (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। (৩) রমজান মাসের রোজা রাখা

ফরজ হওয়া অস্তেও হজ্ব আদায় না করা ঃ হজরত আলী (কাঃ) হইতে রেওয়াত আছে, হুজুর আকরাম (ছাঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি হজ্জে গমনের ব্যয়ভার বহন করিতে সামর্থবান, তথাপি যদি সে হজ্জ পালন না করে, তবে সে ইহুদী হইয়া মরুক কিংবা খৃষ্টান অবস্থায় তাহার মৃত্যু আসুক, তাহাতে কোন কিছু আসে যায় না।

সুদ খোরী করা ঃ আল্লাহতাআ'লা পবিত্র কালামে মজীদে সুদ-খোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। হাদীছ শরীফে হজরত সামুরা বিনা জুন্দুব হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেনঃ মেরাজের রাত্রে দেখিয়াছি প্রবাহিত একটি রক্তের নদী। তাহার মধ্যে একব্যক্তি সাঁতরাইতেছে এবং হাবুডুবু খাইতেছে। লোকটি মাঝে মাঝে সাঁতরাইয়া তীরে আসিতেছিল, কিন্তু তীরে দণ্ডায়মান জনৈক ব্যক্তি তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে পুনরায় নদীর মধ্য দিকে তাড়াইয়া দিতেছিল। ক্রমাগত এ অবস্থা চলিতে দেখিয়া আমি জিব্রাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলামঃ এই ব্যক্তি কে? জিব্রাঈল (আঃ) উত্তর করিলেন, এই ব্যক্তি আপনার সুদখোর উম্মত।

এতীমের মাল ভক্ষণ করা ঃ কোরআন শরীফে আল্লাহতাআ'লা ফরমাইয়াছেন-'যাহারা জোর পূর্বক এতীমের মাল ভোগ করে, তাহারা যেন আপনার পেটে আগুনই ভর্তি করে।'

হজরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম বলিয়াছেনঃ মেরাজের রাত্রে আমি কতক লোককে প্রস্তর ভক্ষণ করিতে দেখিলাম। প্রস্তর খাওয়া মাত্র উহা তাহাদের গুহ্যদ্বার দিয়া নীচে পড়িয়া যাইতেছিল। আমি জিব্রাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা কাহারা? তিনি জবাব দিলেনঃ উহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা জোর পূর্বক এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছে-ভক্ষণ করিয়াছে তাহাদের সম্পদ।

জিনা বা ব্যভিচার করা ঃ হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (ছাঃ) ফরমাইয়ছেনঃ গুপ্তস্থান ও জিহ্বার গুনাহই মানুষকে সর্বাধিক দোজখের দিকে নিয়া যাইবে।

উল্লেখিত কবীরা গুনাহসমূহ ব্যতীতও কোরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত শত শত ছগীরা ও কবীরা গুনাহ রহিয়াছে, যেগুলির উপর আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট রহিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐগুলির মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলে কঠিন শাস্তি বা ভীষণ আজাবের কথা বলা আছে।

এখানে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কার্যাবলী বা গোনাহসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল।

(১) আল্লাহর সাথে অংশী স্বীকার করা অর্থাৎ আল্লাহর ন্যায় অন্য কাহাকেও শক্তিশালী ও জ্ঞানী মনে করা। ২। কষ্টে পতিত হইয়া কিংবা উদ্দেশ্য সাধনে জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও নজর মানত মানা। ৩। বিপদে পড়িয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও কাছে সাহায্য বা বিপদ উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করা। ৪। অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা। (৫) মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি যেমন মদ, গাজা, আফিম ইত্যাদি পানাহার করা বা অপরকে করান (৬) বিবাহ ব্যতীত শরীয়ত সমর্থিত ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের সাথে জেনা করা। (৭) নিজ স্ত্রীর সাথে কামতৃপ্তি প্রয়োগীয় স্থান ব্যতীত অন্যত্র উপগত হওয়া। (৮) অন্যের সতী সাধ্বী স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে জেনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (৯) অবিবাহিতা সতী যুবতীকে জেনার তোহমত দেওয়া। (১০) বিধর্মী শত্রুর দ্বিগুণ শক্তির মোকাবেলা হইতে পলায়ন করা। (১১) কাহাকেও যাদু বা সেহর করা এবং অপরের দ্বারা কারান। (১২) পিতৃহীন সন্তানের মাল দৌলত অন্যায়ভাবে হরণ ও ভক্ষণ করা (১৩) মাতাপিতাকে অনর্থক দুঃখ-কষ্ট দেওয়া। (১৪) মক্কা শরীফের হেরেমের মধ্যে নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত হওয়া। (১৫) সুদ গ্রহণ করা। (১৬) চুরি করা। (১৭) শূকরের মাংস ভক্ষণ করা। (১৮) অন্যায়ভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (১৯) বিনা কারণে সত্য গোপণ করা। (২০) শরীয়ত সমর্থিত ওজর ব্যতীত রমজান মাসের রোজা ভঙ্গ করা। (২১) ইচ্ছা করিয়া নামাজ তরক করা কিংবা নামাজের ওয়াক্ত

চলিয়া যাওয়ার পর নামাজ পড়া। (২২) জাকাত পরিমাণ মালের জাকাত না দেওয়া। (২৩) হজ্জ্ব ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করা। (২৪) মিথ্যা শপথ করা। (২৫) ঘনিষ্ট আত্মীয়ের আত্মীয়তা সম্পর্ক কর্তন করা। (২৬) ক্রয় বিক্রয়ের কালে ওজনে কম দেওয়া। (২৭) এক মোসলমান অন্য মোসলমানের সাথে অন্যাভাবে যুদ্ধ করা। (২৮) আল্লাহ, তাঁহার রাসূল, রাসূলের বংশধরগণ ও তাঁহার ছাহাবাগণকে হেয় জ্ঞান করা, ভর্ৎসনা করা, অভিশাপ দেওয়া ও অন্যায়কারী ভাবা। (২৯) ঘুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা। (৩০) অপনিন্দাকারীকে বিচারপতি নিযুক্ত করা। (৩১) শক্তি থাকা সত্ত্বেও সত্যের আহবান এবং মিথ্যার অবসান না ফরা। (৩২) বিনা প্রয়োজনে শরীয়ত অনুমোদিত মিথ্যা (সময় সাপেক্ষে যে মিথ্যা বলা জায়েজ আছে) বলা। (৩৩) শক্তি থাকা সত্তেও প্রতিশ্রুতি পালন না করা। (৩৪)পবিত্র কোরআন মজীদ হেফজ করিয়া পুনঃ ভুলিয়া যাওয়া। (৩৫) জীবন্ত প্রাণীকে অগ্নিতে পোড়াইয়া হত্যা করা। (৩৬) স্ত্রী নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং স্বামী স্ত্রীর উপরে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা। (৩৭) স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা। (৩৮) বিশেষজ্ঞ হাক্কানী আলেমকে প্রবঞ্চনামূলক মিথ্যাবাদী প্রমাণ কর। হাক্কানী আলেম উহাকে বলে-যে ব্যক্তি এলমে দীন শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী নিজে আমল করে ও অন্যকে আমল করিতে উৎসাহ দেয়। আর ঐ ব্যক্তি প্রকৃত আলেম নহে, যে ব্যক্তি গাদায় গাদায় কেতাব পড়ে-কিন্তু অন্যকে শিক্ষা দেয় না এবং তদনুযায়ী নিজেও আমল করে না। এক কথায়, দীন ইসলামের খেদমত তাহার দ্বারা হয় না। (৩৯) আল্লাহ দান হইতে নিরাশ হওয়া এবং তাহার আজাবকে ভয় না করা। (৪০) জুয়া খেলা। (৪১) আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে গো-মহিষ জবেহ করা। (৪২) আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন অথবা তাহার সম্মানকে পুণ্য মনে করিয়া তাহার নামে পশু বধ করা। (৪৩) নিজেকে সর্বোচ্চ জ্ঞানী ভাবিয়া গৌরবান্বিত হওয়া এবং মনে মনে নিজ আত্মার উপর প্রশংসা করা! (৪৪) ধোকাবাজী ও শঠতামী করা। (৪৫) অন্যের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা। (৪৬) মারামারি, লাঠালাঠি করা। (৪৭) কাফের, ফাসেক ও অন্যায়কারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা (৪৮)

অন্যের প্রতি হাসাদ (শত্রুতা), বোগজ (দুশমনী) ও কীনা (হিংসা) রাখা। (৪৯) শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত হুকুম; যেমন–নামাজ, রোজা হজ্ব ও জাকাত ইত্যাদি পালনের প্রতি বিরক্ত ভাব রাখা এবং ঐ সকল আদেশ পালন না করে। (৫০) হালাল বস্তুকে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল জ্ঞান করা। (৫১) ধর্মের কার্যে বাধা চক্রান্ত করা। (৫২) অপরের গচ্ছিত মাল–দৌলত অপহরণ করা। (৫৩) মহারেমের (যাহাদিগকে বিবাহ করা বৈধ নহে) তাহাদের সাথে অবৈধভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। (৫৬) কাফের, ফাসেক ও বে–দ্বীনগণ কর্তৃক ভয়ের কারণ না থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও তোষামদ করা। (৫৭) মাসলা–মাসায়েলের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ফতুয়া দেওয়া। (৫৮) অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও চিকিৎসা করা। (৫৯) নিজ ইচ্ছানুয়ায়ী কোরআন শরীফের তফসীর–ব্যাখ্যা করা। (৬০) সম্মানি লোকের সম্মান হানি করা। (৬১) কাহারও উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে মিথ্যা প্রচার ও দোষ বর্ণনা করা। (৬২) মো'মেন মোসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা রাখা। (৬৩) আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কাউর উপর শপথ করা। (৬৪) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার মজলিসে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত শ্রবণ ব্যতীত অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা। (৬৫) অন্যের অপনিন্দা ও অপবাদ করা এবং শ্রবণ করা। (৬৬) জ্যোতিষের বর্তমান, ভবিষ্যৎ কথার পর বিশ্বাস স্থাপন করা। (৬৭) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখা (৬৮) নবীগণ, আল্লাহর কেতাব, বেহেশত, দোজখ, মিজান, পোলসেরাত, কবর আজাব এবং যে সকল বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলগণ নির্দেশ দিয়াছেন ও কেয়ামত বিষয়ক অবস্থার উপর অবিশ্বাস করা। (৬৯) হাদীছ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ বাণী; ইজমা কেয়াস ইত্যাদি অমান্য করা। (৭০) দাড়ি কামান ও গোফ লম্বা রাখা (৭১) স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা (৭২) পুরুষের পক্ষে স্বর্ণ ও রৌপের অলঙ্কার এবং রেশমী কাপড় পরিধান করা। (৭৩) অনুরূপে, পুরুষের পক্ষে হাতে পায়ে মেহেন্দী এবং সৌন্দর্যের নিমিত্ত দন্তের মাড়ীতে কাল রং লাগান (৭৪) ঢোল, বাদ্য, বেহালা ইত্যাদি বাজান এবং ইচ্ছাকৃত শ্রবণ করা। (৭৫) আকৃষ্ট মনে যুবতীর নাচ

দেখা এবং তাহাদিগকে টাকা পয়সা দ্বারা সাহায্য করা। (৭৬) যুবতীর নাচের ভঙ্গির প্রশংসা করা। (৭৭) শরীয়ত অসমর্থিত খেলা–ধুলা; যেমন পাশা, জুয়া ইত্যাদি খেলা–করা। (৭৮) হারাম কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা! (৭৯) মিথ্যা কথার উপরে আল্লাহকে সাক্ষী রাখা। (৮০) ইসলাম ধর্মের উপর অন্য ধর্মের প্রাধান্য দেওয়া (৮১) বেদ্বীন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হইয়া কাজ করা। (৮২) কাফেরদের পূজা পর্বের বস্তু গ্রহণ ও ভক্ষণ করা। (৮৩) পীর, পয়গম্বর, ধর্মের ইমাম, শহীদগণের নামে মাথার ঝোট ও চুল বড় রাখা। (৮৪) দাস দাসীকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা এবং তাদের দ্বারা সাধ্যাতীত কাজ করান। (৮৫) এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিপদ–আপদে উদ্ধার না করা। (৮৬) এক অন্যকে অপ্রীতিকর নামে সম্বোধন করা। (৮৭) সর্বদা মনকে খারাপ ও গুনাহের কার্যে লিপ্ত রাখা। (৮৮) দিবা রাত্র ভাল খাওয়া–পরার চিন্তায় নিমগ্ন থাকা। (৮৯) শক্তি থাকা সত্ত্বেও মাতাপিতা ও সম্মানিতজনের সম্মান প্রদর্শন ও খেদমত না করা। (৯০) ওস্তাদ, পীর–বুজর্গ এবং বড়দের সাথে বেয়াদবী করা। (৯১) চক্রান্ত পূর্বক নিজেকে অসাধ্য প্রমাণ করিয়া শরীয়তের আদেশ, যথা– নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত ইত্যাদি হইতে বিরত থাকা। (৯২) আল্লাহর দানকৃত মাল–দৌলত হইতে দান–ছদকা, জাকাত আদায় করিতে কৃপণতা করা। (৯৩) ঋতু ও নেফাসকালীন স্ত্রীর সহিত সহবাস করা। (৯৪) নিজ স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সম্মুখে গমনের সুযোগ দেওয়া। (৯৫) স্ত্রীর অনিচ্ছামতে শরীয়ত বিরোধী কাজ করান। (৯৬) অকারণে স্বীয় স্ত্রীকে বেপর্দায় এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করার সুযোগ দেওয়া। (৯৭) শক্তি থাকা সত্ত্বেও সন্তান সন্ততি স্ত্রী পুত্র পরিজনকে পানাহারে কষ্ট ও অনাহারে রাখা। (৯৮) অন্যের স্ত্রীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি করা। (৯৯) একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা না করা। (১০০) স্ত্রী–পুত্রের সন্তুষ্টির জন্য খোদা ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা। (১০১) স্ত্রী নিজের স্বামীর অবাধ্য হওয়া। (১০২) স্বামীর ডাকে স্ত্রীর নিমিষে হাজির না হওয়া। (১০৩) স্ত্রী স্বামীর দেওয়া পোশাক, পরিচ্ছদ ও পানাহারে সর্বদা অকৃতজ্ঞ থাকা (১০৪) স্ত্রী তাহার স্বামীর আদেশ ব্যতীত মাতা–পিতার বাড়ী ছাড়া অন্যের বাড়ী

গমণ করা। (১০৫) অনুরূপ স্ত্রী স্বামীর আদেশ ব্যতীত অন্য পুরুষের সম্মুখীন হওয়া। (১০৬) স্ত্রী স্বামীর শক্তির বাহিরে খাওয়া পড়ার তাড়া করা। (১০৭) কথায় কথায় স্ত্রী তাহার স্বামীকে কষ্ট দেওয়া। (১০৮) স্ত্রী স্বামীর সংসারের প্রতি লক্ষ্য ও তাহার মালের রক্ষণাবেক্ষণ না করা। (১০৯) স্ত্রীলোকের মাথার চুল কামান। (১১০) স্ত্রীলোক পুরুষের আকৃতি এবং পুরুষ স্ত্রীলোকের ধারণ করা। (১১১) শরীয়তের বিধান ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে কবর জেয়ারত করা। (১১২) অন্যের ঘরে বিনা আদেশে প্রবেশ করা। (১১৩) ওয়াজ নছীহতকারীর ওয়াজ নছীহত না করা। (১১৪) লোক দেখান ইবাদত-বন্দেগী করা এবং নিজের ইবাদত বন্দেগী ও পরহেজ-গারীর উপর মনে মনে প্রশংসিত হওয়া। (১১৫) মূল্য বৃদ্ধির জন্য খাদ্য শষ্য গুদামজাত রাখা এবং কালবাজরী করা। (১১৬) কবর জিয়ারতকালে কবরে সেজদা এবং কবরের চতুষ্পার্শে ঘুরিয়া তাওয়াফ করা। (১১৭) জীব-জন্তুর ফটো তোলা এবং সৌন্দর্যের জন্য ঘরে টানাইয়া রাখা। (১১৮) অসদুপায়ে টাকা উপার্জন করিয়া তদ্দারা মসজিদ, ঈদগাহ ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া ছওয়াবের আশা রাখা। (১১৯) ঈদগাহ মসজিদ ইত্যাদির নামে পশু বধ করা। (১২০) যে স্থানে মানুষের কবর নাই সেখানে কবর জ্ঞানে সালাম ও জিয়ারত করা। (১২১) মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া কাঁদা, জামা-কাপড় ফফাড়িয়া ফেলা এবং বুকে আঘাত করা। (১২২) বিধার্মীগণের বিশ্বাস মতে কথা বলা; যেমন যাত্রা পথে খালি কলস দেখিলে যাত্রা ভঙ্গ, অন্য স্থানে স্থানান্তুরিত হইবার পূর্বে উক্ত স্থানে কলসী ভরিয়া পানি রাখিয়া যাওয়া, নূতন বধূ ঘরে উঠাইবার কালে কাদা ছড়ান ইত্যাদি। (১২৩) পুরুষের পক্ষে পরিধানের কাপড় ইচ্ছা করিয়া পায়ের গিয়ার নীচে ঝুলান। (১২৪) নিজের লজ্জাস্থান অন্যকে দেখান এবং অন্যের লজ্জাস্থান নিজে দেখা। (১২৫) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা। (১২৬) বিনা অজুতে কোরআন শরীফ স্পর্শ করা, নামাজ পড়া, কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা। (১২৭) শরীর ক্ষত করতঃ দাগ লাগান এবং অন্যকে দাগ দেওয়া। (১২৮) স্ত্রীলোকের এমন পাতল কাপড় পরিধান করা যাহাতে অন্যে শরীর দেখিতে পায়। (১২৯) মোক্তাদিগণের ইমামের পূর্বে

নামাজের ক্রিয়া আদায় করা। (১৩০) মদ, শরাব ইত্যাদির ব্যবসা করা। (১৩১) স্বাধীন স্ত্রী বা পুরুষকে খরিদ করিয়া ক্রীতদাস বানান। (১৩২) জুমুআর দিবস ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যে লিপ্ত থাকিয়া নামাজ তরক করা। (১৩৩) জুমুআ' এবং জানাজাতে হাজির হইতে গাফলতি করা। (১৩৪) আল্লাহর হুকুম ও শরীয়তের নির্দেশিত বিচার হইতে রেহাই দেওয়া এবং সোপারেশ করা। (১৩৫) জানিয়া শুনিয়া কোরআন শরীফ ভুল পড়া। (১৩৬) সালামের উত্তর না দেওয়া (১৩৭) ইচ্ছাকৃত বিষ পান কিংবা নদীতে ঝাপ দেওয়া অথবা আত্মহত্যা করা। (১৩৮) পাড়া-প্রতিবেশীকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া। (১৩৯) কাফের ও বধর্মীগণের পোষাক পরিচ্ছদের অনুকরণ করা। (১৪০) শরীয়তের কার্যে হাসিঠাট্টা করা। (১৪১) নিজ বংশ হইতে বাহির হইয়া অন্য বংশের পরিচয় দেওয়া। (১৪২) জনসাধারণের চলার রাস্তা বন্ধ করা। (১৪৩) শরীয়ত সমর্থিত কার্যে সংস্থান থাকিতে টাকা-পয়সা দ্বারা সাহায্য না করা। (১৪৪) কাফেরের ভয় ব্যতীত মোসলমান বলিয়া পরিচয় না দেওয়া। (১৪৫) টাকা-পয়সার অপব্যয় করা। (১৪৬) দাসদাসীকে স্নেহ ও ভালবাসা না দেখান। (১৪৭) খাদ্যদ্রব্য যেমন -নিমক, তৈল, চিনি ইত্যাদিতে এমন ভেজাল দেওয়া যে, যদি খরিদ্দার জানে-তবে নির্ধারিত দামে উহা খরিদ করিতে চাহেনা এইরূপ ভেজাল দেওয়া। (১৪৮) এক মোসলমান অন্য মোসলমানের অপরাধ বা দোষ অন্বেষণ করা। তবে সংশোধনের নিয়তে ফাসেক এবং গোনাহগারের অন্যায় তালাশ করা বৈধ। (১৪৯) এক মোসলমান অন্য মোসলমানকে দোজখী বলা-ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত আরও গোনাহের কার্য আছে, তাহা ভাল আলেমের কাছে জানিয়া লইতে হইবে।

--০--

প্রসংগ কথা

প্রতিটি মানুষ তার ফিতরাত বা তার পূর্ব-স্বীকৃত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পরবর্তী সময় তার পিতা-মাতা, সমাজ ও ধর্মহীন পরিবেশ তাকে অধর্ম ও খোদার বিধানের বিপরীত লইয়া যায়-ভ্রান্ত এহুদী ও খৃষ্টানের পরিণত করে।-আল-হাদীছ

নবী করিমের (ছাঃ) এ বাণীর মর্মকথা হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, হুজুর তাঁর বাণীর মাধ্যমে এ কথাই মানুষকে অবহিত করিতে চাহিয়াছেন যে, আরওয়াহ বা রূহ ও মানবাত্মা সৃষ্টি করিবার পর মহান আল্লাহ সকল আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন-'আমি কি তোমাদের রব্ব ও প্রভু প্রতিপালক নহি?' এ জিজ্ঞাসার জবাবে সকল মানবাত্মাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল-হাঁ, আপনিই আমাদের রব্ব ও প্রতিপালক।

ফলে মানুষ মাত্রই জন্মগ্রহণকালীন এই পূর্ব-স্বীকৃত বিশ্বাস বা ঈমান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু, পরবর্তীকালে দূষণ-পরিবেশের সাথে মিশ্রিত ও প্রভাবিত হইয়া অধর্ম ও খোদার বিরোধী বিধানের দিকে ধাবিত হইয়া পড়ে।

এ গর্হিত ও আল্লাহর বিধান পরিপন্থী কাজ হইতে মানুষকে সরল-সঠিক পথ তথা আল্লাহর সত্য-বিধানের প্রতি মানুষকে ফিরাইয়া আনার জন্য যুগে যুগে মানুষের শিক্ষাগুরু হিসাবে মানুষেরই মধ্য হইতে মানুষ নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁরা আলাহর বাণী বহন করিয়া আনেন এবং সে মতে মানুষকে দীক্ষা দিয়া থাকেন।

এ উদ্দেশ্যে সম্মুখে রাখিয়াই আল্লাহ পাক হজরত আদম নবী হইতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নবীগণের নেতা হজরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত মতান্তরে দু'লাখ চব্বিশ হাজার কিংবা এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল দুনিয়ার মানুষের কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁরা দুনিয়ায় আগমন করিয়া মানুষকে ধর্মকর্ম শিক্ষা দিয়াছেন-মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করিয়াছেন।

শেষ জমানায় আমাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরণ করিয়াছেন আখেরী বা সর্বশেষে নবী হজরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূলের আবির্ভাব কখনো ঘটিবে না, তাঁর দেওয়া ও প্রচারিত সত্য-সনাতন ধর্ম তথা ইসলামই প্রবর্তিত থাকিবে কেয়ামত পর্যন্ত।

এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন-

'রাসূল যা তোমাদিগে শিক্ষা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা হইতে বিরত থাকার উপদেশ দেয়, তা হইতে দূরে থাক-বর্জন কর।'-আল কুরআন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এ বাণী হইতে আমাদিগে জানাইয়া দিতেছেন-তোমাদের ধর্ম ও দীনের একমাত্র শিক্ষাগুরু মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি তোমাদিগে যে শিক্ষা দেন সে শিক্ষাই তোমাদের পরকাল মুক্তির জন্য যথেষ্ট এবং একমাত্র সুখ ও শান্তির আগার বিহেশত লাভের একমাত্র উছিলা ও উপকরণ। এর বিপরীত কিছু হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না-অনন্ত দুঃখের জঘন্য স্থান দোজখ হইবে তোমাদের চির আবাসস্থল।

আর এ বাণী সমুহের সর্ব প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাণী হইল-পবিত্র কলেমা-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'-আল্লাহ ছাড়া ইবাদত ও আনুগত্যের দ্বিতীয় কেহ নাই, আর আল্লাহর বাণী বাহক তথা রাসূল হইলেন মুহাম্মাদ (ছঃ)।

এ কলেমাটিই হইল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের একমাত্র বাণী। অর্থাৎ আল্লাহই সব কিছুর উপরে, আল্লাহ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নাই, শক্তি নাই, ভাল-মন্দের সমাধান ক্ষেত্রে তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই। ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য তাঁর জন্যই সীমাদ্ধ। অতএব, মাখলুকের বা সৃষ্টির ধর্ণা কোন অবস্থায়ই ধরা চলিবে না-। এ শ্রেণীর মনোভাব সৃষ্টি হওয়া অধর্ম এবং কর্ম করা শিরক বা অংশীবাদিতা ও একত্ববাদের বরখেলাপ চিন্তাধারা। আর এ শিরক সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন-সকল শ্রেণীর পাপ ও গর্হিত বা আল্লাহ বিরোধী কাজের মধ্যে

শিরক কর্মই শ্রেষ্ঠ অপরাধ। সকল শ্রেণীর পাপই তিনি ইচ্ছা করিলে মোচন করিয়া দিতে পারেন কিন্তু শিরকজনিত পাপ তিনি কোন অবস্থায় ক্ষমা করিবেন না, এজন্য দোজখ তার একমাত্র আবাস স্থল।

শিক্ষক, গুরু, উপদেশদাতার মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। এজন্য তাঁকে বহু গুণে ভূষিত হইতে হইবে। তার মধ্যে অন্যতম হইল চরিত্রগুণ। যে শিক্ষকের মধ্যে পূর্ণাংগ চরিত্রগুণ অনুপস্থিত, সে প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারেন না। ধর্মগুরুর ব্যাপার তো আরো উর্ধে। কারণ ধর্ম শিক্ষকের উপরে যদি ছাত্রদের তথা উম্মতের পূর্ণাংগ আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে তার উপদেশ বড় একটা কাজে না আসারই কথা। এজন্য ধর্মগুরু তথা রাসূলকে সর্ব প্রথম হইতে হইবে সত্যবাদি বলিয়া সর্বজন স্বীকৃত, থাকিতে হইবে তাঁর মধ্যে চরিত্রের অপূর্ব মাধুর্য।

আল্লাহ পাক যতজন নবী-রাসূল মানবকুলে তাঁর বাণী শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন পূর্বাহ্নেই তিনি তাঁদিগে তাঁদিগে শিক্ষকের যাবতীয় গুণাবলীতে ভূষিত করিয়া দিয়াছেন।

এ সম্পর্কে হযরত রাসূলে পাককে (ছাঃ) উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

'তোমাদের শিক্ষার জন্য' আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রহিয়াছে উত্তম চরিত্রগুণ। তাঁর আদর্শ ও চরিত্রগুণ গ্রহণ করিতে পারিলেই তোমাদের মুক্তি অবধারিত।

॥ পরিশিষ্টাংশ শেষ ॥